এই প্রথম আমি কলকাতা, আমার চেনা জায়গা ছেড়ে এতদূর এসেছি। না এসে কোন উপায় ছিল না। পথে আসতে আসতে কত কি ছবি একটার পর একটা চোখে পড়েছে। একের পর এক বিস্ময় আর বিস্ময় জমা হয়েছে। যা দেখছি তাতেই অবাক হচ্ছি। জীবনে এই প্রথম একসঙ্গে এত গাছপালা মাঠ প্রান্তর ক্ষেত-খামার দেখলাম। পথের দু'পাশে কোথাও কোথাও মাইলের পর মাইল ক্ষেত আর ক্ষেত। সেখানে কাজ করছে চাষী, চাষী-বউ। কচি জোয়ান বুড়ো সবাই যেন ছুটে এসেছে মাটির টানে। কোথাও মাটি তৈরী করার কাজ হচ্ছে। কোথাও বা ছপছপ শব্দ করে ধানের চারা পুঁতছে। কোথাও জমির পাশে ঘাস খাচ্ছে গরু মোষ ছাগল। পথের পাশে গাছের ছায়ায় রাখাল ছেলেদের জটলা। দৃশ্য বদলায়। আবার লোকালয়। ছোটখাট গঞ্জ। চায়ের দোকানে লোকের ভিড়। কথা কাটাকাটি। লোকজনের চিৎকার, চেঁচামেচি। দোকান পাট। রেডিওতে বিবিধ ভারতীর হিন্দী গান। ছায়া-ছবির মতন একটার পর একটা ছবি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। আবার মাঠ প্রান্তর। গাছ, তরুলতা ঝোপ, বাঁশঝাড়,। ডুমুর গাছে কাক। ডুমুর ফল ঠোকরায়। শালিখ, দোয়েলের শিস। জমির ধারে ধারে বক হেঁটে যায়। কেউ কেউ মাছ ধরে। একটার পর একটা দৃশ্য সরিয়ে সরিয়ে যেন আমি চলেছি। পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। আমারও কোন রকম ক্লান্তি নেই। ভাল লাগছে। মাঠ থেকে মাঝে মাঝে হাওয়া ছুটে এসে গায়ে লাগছে। ধুলো মাটির গন্ধ। আগে এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। এভাবেই কখনো ছায়া-ঘেরা গ্রাম, হাট, হাটুরে, গাঁয়ের মানুষজন দেখা যাচ্ছে। কখনো বা মাঠের বুকে হঠাৎ করে ঝম ঝম শব্দে বৃষ্টি নামা। এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে, এদের আগে কখনো

দেখি নি। এই প্রথম আমার মনে হয়েছে, আমার জানা, দেখা জগতটা কত তুচ্ছ, সামান্য! হায় রে, আমার দেশ, দেশের মানুষ কাউকে আমি ভাল করে জানি না। আমার জগৎ কত ছোট, কত সংকীর্ণ!

মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করেছি, কলকাতাকেই কি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি আমি? ঠিক ঠিক মতন চিনতে পেরেছি? পারি নি তো! আজো কত জায়গা আমার কাছে অজানা থেকে গেছে। সেসব জায়গা যে কোথায়, জানি না। কখনো যাই নি আমি। আজো আমার মিউজিয়াম দেখা হল না। শুনেছি ওখানে অতীত নাকি থরে থরে সাজানো আছে। সভ্যতার কত কী রহস্য ওখানে বন্দী! আজো চিড়িয়াখানা দেখি নি। ওখানে কত রকমের পশু পাখির মেলা! কত ধরনের জন্তু জানোয়ারকে একটা জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে। এমনি আরো কত কি! কলকাতার ইতিহাসই কি সোজা ইতিহাস? এর রহস্য কি কিছু কম! কতটুকু আর জেনেছি? কত রাস্তার নাম এখনও জানি না। কত লোক আমার অচেনা। এত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে প্রত্যহ যাওয়া আসা, তবু লোকগুলোকে আমি চিনি না। বুঝি না। আমার কাছে অনেক কিছু দুর্বোধ্য মনে হয়। এদের সঙ্গে আমার তো কোন সম্পর্ক নেই। মুহূর্তের জন্যেও আত্মীয়তা বোধ করি না। সবচেয়ে আশ্চর্য, আমি আমার পাশের বাড়ির লোককে চিনি না। তারা কি করে, কিভাবে তাদের দিন চলে, কিছুই আমার জানার দরকার পড়ে না। এভাবে তো ভাবিও না কখনো। আবার আমাদের জন্যেও কারো কোন দুর্ভাবনা নেই। তবু আমারা পাশাপাশিই আছি। হয়ত এভাবেই আমরা থাকব। সহজে কেউ আমরা আমাদের মনের দরজা খুলব না। সেখানে কাউকে আমন্ত্রণ জানাব না। কোন মমতা, কোন ভালবাসা নয়।

আমরা বরাবরই উত্তর কলকাতার বাসিন্দে! ঘিঞ্জি-প্রায় এক

দেখি নি। এই প্রথম আমার মনে হয়েছে, আমার জানা, দেখা জগতটা কত তুচ্ছ, সামান্য! হায় রে, আমার দেশ, দেশের মানুষ কাউকে আমি ভাল করে জানি না। আমার জগৎ কত ছোট, কত সংকীর্ণ!

মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করেছি, কলকাতাকেই কি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি আমি? ঠিক ঠিক মতন চিনতে পেরেছি? পারি নি তো! আজো কত জায়গা আমার কাছে অজানা থেকে গেছে। সেসব জায়গা যে কোথায়, জানি না। কখনো যাই নি আমি। আজো আমার মিউজিয়াম দেখা হল না। শুনেছি ওখানে অতীত নাকি থরে থরে সাজানো আছে। সভ্যতার কত কী রহস্য ওখানে বন্দী! আজো চিড়িয়াখানা দেখি নি। ওখানে কত রকমের পশু পাখির মেলা! কত ধরনের জন্তু জানোয়ারকে একটা জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে। এমনি আরো কত কি! কলকাতার ইতিহাসই কি সোজা ইতিহাস? এর রহস্য কি কিছু কম! কতটুকু আর জেনেছি? কত রাস্তার নাম এখনও জানি না। কত লোক আমার অচেনা। এত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে প্রত্যহ যাওয়া আসা, তবু লোকগুলোকে আমি চিনি না। বুঝি না। আমার কাছে অনেক কিছু দুর্বোধ্য মনে হয়। এদের সঙ্গে আমার তো কোন সম্পর্ক নেই। মুহূর্তের জন্যেও আত্মীয়তা বোধ করি না। সবচেয়ে আশ্চর্য, আমি আমার পাশের বাড়ির লোককে চিনি না। তারা কি করে, কিভাবে তাদের দিন চলে, কিছুই আমার জানার দরকার পড়ে না। এভাবে তো ভাবিও না কখনো। আবার আমাদের জন্যেও কারো কোন দুর্ভাবনা নেই। তবু আমারা পাশাপাশিই আছি। হয়ত এভাবেই আমরা থাকব। সহজে কেউ আমরা আমাদের মনের দরজা খুলব না। সেখানে কাউকে আমন্ত্রণ জানাব না। কোন মমতা, কোন ভালবাসা নয়।

আমরা বরাবরই উত্তর কলকাতার বাসিন্দে! ঘিঞ্জি-প্রায় এক

গলির মধ্যে দুখানা ঘরের ভাড়াটে। ঘরে সকালের দিকে আলো ঢোকে না। বেলা পড়ে এলে পশ্চিমের জানালা দিয়ে কৃপনের মতন খানিকটা আলো এসে ঘরে পড়ে। কিছুক্ষণ থেকেই আবার পালিয়ে যায়। ভ্যাপসা এক গন্ধ। থাকতে থাকতে এখন সয়ে গেছে।

আমার বাবা একটা প্রাইভেট ফার্মে কেরাণীর কাজ করে। আমরা যখন ছোট এবং সংখ্যায় কম ছিলাম, তখন ওই আয়ে চলে যেত। এখন দিনকাল অন্যরকম হয়ে গেছে। লোক সংখ্যা বেড়েছে। সহজে বাড়ি পাওয়া যায় না। জিনিসপত্তরের দাম আগুন। আমরাও বড় হয়েছি। এবং আমাদের ভাইবোনের সংখ্যাও ইতিমধ্যে বেড়েছে। সুতরাং, বাবার এই আয়ে সংসার আর চলেই না। এ-নিয়ে বাড়িতে রোজ রোজ অশান্তি। খিটিমিটি। বাবা এবং মার মধ্যে ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ। এটা যেন এখন নিত্য দিনের ঘটনা। মাঝে মাঝে এর অনিবার্য ফলাফল আমাদেরও বিব্রত করে। ইদানীং যুদ্ধের আয়োজন আমাকে নিয়েই যেন বেশী। অবশ্য তার কারণও আছে। কেন না আমিই ভাইদের মধ্যে বড়। এবং আমিই এপর্যন্ত এম. এ. পরীক্ষার দোরু গোড়ায় এসে ঠেকেছি। সুতরাং, আমারই কর্তব্য এবার একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে সংসারের বেসুরো যন্ত্রটাকে ঠিকঠাক করে খানিকটা সুরে নিয়ে আসা।

আমরা তিন ভাই। আমি এবং আমার পরে দুজন। বাবুল আর টুটুল। তাদের একজন স্কুলে, অন্যজন কিছুই করে না। বাবুল পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে। স্কুল-ফাইনাল দিয়েছিল। ফেল করেছে, সুতরাং আর পড়ব না। তার চেয়ে পাড়ায় মারপিট, রকে বসে আড্ডা, লুকিয়ে চুরিয়ে হিন্দী বইয়ের লাইন দেওয়া, ওর কাছে অনেক সুখের। একটু রগচটা বদরাগী। চেহারাটাও ষণ্ডামার্কা। শরীর স্বাস্থ্য পেটানো। মারপিট, হুজ্জতি লেগেই আছে। সেদিন কোথায় মাথা ফাটিয়ে এল। তার জের চলল কিছুদিন। ওর চেলা চামুণ্ডাও জুটে গেছে। মোদ্দা কথা, ও ইতিমধ্যেই ছোটখাট একজন মস্তান

হয়ে উঠেছে। পাড়ার লোকজন ওকেই চেনে বেশী করে। ওরই খাতির-টাতির বেশী। এই গেল ভাইদের কথা। বোনদের মধ্যে আমার বড় এক দিদি, আর সবাই আমার ছোট। মিলু, লতু। দিদির বিয়ে হয়েছে। বিয়ে দিতে গিয়ে বাবাকে নাকি অনেক দেনা করতে হয়েছিল। এখনও সব শোধ হয় নি। এটাও সংসারের অনেক মালিন্য বাড়িয়েছে। এর মধ্যেও মিলু পড়াটা চালিয়ে গেছে। ও এখন বি. এ. সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে। লতু আগামীবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসবে।

ওসব শিবের গীত এখন থাক। যা বলছিলাম, আমার চেনা-জানা চলা-ফেরার গণ্ডি সেই শৈশব, কৈশোর থেকেই ছোট। সীমিত। বাসা থেকে ক'পা হাঁটলেই আমার স্কুল। এটাই সবচেয়ে কাছে। একা একা দূরে যাওয়া মার পছন্দ ছিল না। ট্রামবাস, ভয় ভাবনা, কখন কি ঘটে যায়। পাশেই দেশবন্ধু পার্ক। খেলাধুলো বলতে ওখানেই। ছেলেবেলা থেকেই যেখানে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি। সব সময়েই এক নিষেধের বেড়া। ওর বাইরে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না আমার। কলকাতা সহর, কখন কি হয়ে যেতে পারে। এখানে ছেলে ধরার দল ঘুরে বেড়ায়। যখন তখন একটু অসাবধান হলেই তুলে নিয়ে যায়। কোথায় যে নিয়ে যাবে ওরা, কেউ জানবে না। আমার বুকের মধ্যে প্রায় সময়ই কেন যেন এক ভয় গুর গুর করত। কত সময় ভেবেছি, এরা কোথায় নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে ওদের কি লাভ হয়! মা ভয় দেখায়, দূরে, অনেক দূরে ওরা নিয়ে যায়। ওরা একবার নিয়ে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না। বাবা বলে, সেখানে ওরা কাউকে অন্ধ করে দেয়, কাউকে পঙ্গু করে, কাউকে ল্যাংড়া, কারো হাত কেটে নেয়! কারো শরীর আগুনে ঝলসে দিয়ে দগদগে ঘা করে দেয়। ওরা ব্যবসা করে। কী জঘন্য ব্যবসা! লোকগুলোর কি শরীরে একটুও দয়ামায়া নেই! ওরা কারা? ওদের কি দেখা যায় না? ওরাও

তো আমাদের মতনই মানুষ। কিন্তু কী শয়তান, কী জল্লাদ! এরকম কোন অন্ধ আতুর দেখলেই আমার মায়া হত। এরা সব কথা বলে দেয় না কেন? ভাবতে ভাবতে আমার ভয় হত। গায়ে কাঁটা দিত। হায়! এরকম ব্যবসাও এ জগৎ সংসারে আছে! ওরা এদের দিয়ে ভিক্ষে করায়। এরা শুধু খেটেই মরে। পেটও ভরে না। অভাবও যায় না। ওরা পঙ্গু, অসহায় অক্ষম। আমি খুব একটা দূরে যেতাম না। দূরে যেতে ভয় হত। রাস্তায় বাস চলছে, ট্রাক চলছে, রিক্সা ঠেলাগাড়ি ট্রাম, লোকের ঠাসাঠাসি। কখনো কখনো হা হা করতে করতে লরী, ডবলডেকার ছুটে আসে। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। যখন তখন, একটু অসাবধান হলেই তার তলায় পড়ে পিষে যেতে পারি। আর আমাকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। তাই ছেলেবেলা থেকেই গুণে গুণে, ভেবে ভেবে আমাকে পা ফেলতে হয়েছে। এই জন্যেই আমি কখনো দুর্দান্ত, দুরন্ত হতে পারি নি। বড় হওয়ার পরও, দৌড় ওই মণি কলেজ পর্যন্ত। তারপর ইউনিভার্সিটি। আড্ডা, পাড়ার খোকনের চায়ের দোকান। বড় জোর, কখনো সখনো এর চেয়ে সামান্য কুলীন আশপাশের কোন রেঁস্তোরা। সিনেমা-টিনেমা দেখাও এই এলাকার চেনা হল-গুলিতেই! বন্ধুর সংখ্যাও কোন কালেই বেশী নয়।

মনে আছে, একবার শুধু ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে মাহেশের রথ দেখতে গিয়েছিলাম। আর একবার মাত্র মধ্যমগ্রাম। সেখানে আমার মাসীর বাড়ি। ঘোরাঘুরির দৌড় আমার ওই পর্যন্ত। এর বাইরে আর কখনোই খুব একটা বেরোই নি। বড় হওয়ার পর মাঝে-মধ্যে এসপ্লানেডে গেছি। কখনো সিনেমা, কখনো বা ফুটবল, ক্রিকেট খেলা দেখতে। এসপ্লানেডের ওপাশে অর্থাৎ দক্ষিণে আমার কালে ভদ্রে যাওয়া। ওদিকে গেলে আমার কেমন অস্বস্তি হয়। কেন যে এমন হয় তার কারণ জানি না। তবে দেখেছি এরকম একটা অনুভূতি আমার আছে। হয়ত ওদিকে গিয়ে নিজেকে

মেলাতে পারি না। কটুএ বেমানান, ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। যাই হোক, আমার অভিজ্ঞতার জগতটা খুবই ছোট।

শুনেছি, আমাদের আদি নিবাস নাকি একদিন পূর্ববঙ্গে ছিল। বাবা ছেলেবেলা থেকেই জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় চলে এসেছিল তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের সঙ্গে। মাঝে-মধ্যে দেশের ভিটেয় গেছে। আমরা বরাবরই এখানে।

স্কুল-ফাইনাল পাসের পর থেকেই আমি চাকরির চেষ্টা করেছি। পাই নি। এভাবে চুপচাপ বসে থাকারও কোন মানে হয় না। শেষ পর্যন্ত লেট-ফী দিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছি। তাও নাইট কলেজ। এই আশায় যে কখনো একটা চাকরি জুটে যেতে পারে। এমনি করেই আই. এ., বি. এ., পাস করেছি। আমার পড়াশোনার ব্যাপারে বাড়িতে কোনরকম আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। সুতরাং, চাকরি হলেই যে-কোন সময় আমি পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে দেবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম।

ইতিমধ্যে অনেকগুলো জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছি। পরীক্ষা দিয়েছি। যেমন পি. এণ্ড. টি., রেলের চাকরি। কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের সার্টিফিকেটও আমার কাছে আছে। ঘোরাঘুরি, একে ওকে ধরা, তাও কম হয় নি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হাওয়ার নয়। আশ্চর্য! আমি ভদ্রগোছের কোন একটা চাকরিও জোগাড় করতে পারি নি। পড়াশুনোয়ও তেমন মন বসাতে পারি না। কোন রকম উত্তাপ, উৎসাহ নেই যেন। আমার চেহারার মধ্যেও একটা বুড়োটে ছায়া পড়েছে। মনের মধ্যে সারাক্ষণ নানা চিন্তার নানা স্রোত। আমারও কেন যেন মনে হচ্ছিল, এসব পড়াশোনার কোন মানেই হয় না। হয়ত এমনও হতে পারে, এগুলো কোন কাজেই লাগবে না। কত লোকের কাছে যে মাথা খুঁড়েছি। কেউ কেউ আশ্বাস দিয়েছে। বিশ্বাস করেছি। কিন্তু শেষ-মেষ তারা কথা রাখতে পারে নি। আমার রাগ হয়েছে। কিন্তু লাভ নেই কোন। কি মূল্য আছে

এর। বেঁচে থাকার সে কি প্রানান্তকর প্রতিযোগিতা! আমি ক্রমশই বুঝতে পারছিলাম, বাস্তব আরো কত নির্মম, কত শক্ত। আমার উত্তম উৎসাহ দিন দিনই যেন কমে আসছিল। আমার মনে কোন আনন্দ ফুর্তি ছিল না। আমার দুঃখটা কেউ বুঝত না। বুঝতে চাইত না। এ সংসারে কে কার কথা ভাবে! বাঁচবার জন্যে সবাই কোন না কোন একটা অবলম্বন খুঁজছে। আমার সামনে তো সেরকম কোন আশ্বাস ছিল না! আমি তো ধরবার মতন কিছুই পাচ্ছি না। এই বোধটা আমাকে আরো দুর্বল, আরো নিঃসঙ্গ, অসহায় করে তুলত। ঘরের ভেতরে তখন অশান্তি ঘন ঘন। থামতেই চায় না। আমার ভাল লাগছিল না। এ রকম অবস্থায় বোধহয় কারোই ভাল লাগে না। লাগার কথাও নয়। আমিও বুঝতে পারছিলাম, আমার কিছু একটা করাদরকার। দরকার বললেই কি সব হয়ে যায়? হয় না। আমিও তো চেষ্টা করছি, না পেলে কি করব! আমি কি চুরি ডাকাতি করব? আর সে-রকম সাহসই কি আমার আছে! কোথাও মারপিট দেখলে আমি পালিয়ে আসি। খুন-খারাবির কথা শুনলে আমার মাথা ঝিম ঝিম করে, বুক ঢিপ ঢিপ করে। হাত পা অবশ অবশ লাগে।

একবার বাবুল কোত্থেকে যেন মারপিট করে মাথা ফাটিয়ে এসেছে। কপাল গাল বেয়ে দর-দর করে রক্ত পড়ছে। জামা-টামা ভিজে যাচ্ছে। মা চিৎকার করছে। মিলু লতুর কি কান্নাকাটি! বাবুল কিন্তু নির্বিকার। ও একহাতে চেপে ধরেছে মাথাটা। ওই দেখেই আমি অজ্ঞান। আমার মাথায় জল-টল ঢালতেই নাকি তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সবাই। সেই অবস্থায় বাবুল ডাক্তারখানায় হেঁটে হেঁটে গেছে। আমার চেয়ে ওর ঢের ঢের সাহস। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ও ঠিক লাইনেই গেছে। ওকে পুলিশ-টুলিশ তাড়া করে মাঝে মাঝে। তবে খাতির-টাতিরও আছে। ওকে দেখলে মনেই হয় না ওর কোন দুঃখ-টুঃখ আছে। ওকে কিছু বলার সাহসও করো নেই।

আজকাল পাড়ার অনেক বড় বড় নেতা-টেতাও ওকে খাতির করে। ও কোন বিপদে পড়লেও বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসার লোকজন ওর আছে। কারণ, ওকে নাকি অনেকেরই দরকার। কাজে লাগে। কাজটা যে কি ঈশ্বর জানেন! এরকম ডাকাবুকো ছেলে-টেলে ওদের নাকি হামেশাই প্রয়োজন হয়। বাবুলটা বরাবরই ডানপিটে গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের। ওসব নিষেধ-টিষেধ ওর কাছে অচল। কোন কিছুই কানে তুলত না। দুর্দান্ত ধরনের ছেলে। রাগী। রেগে গেলে ও যে কি করবে, নিজেই জানে না। জেদীও। যতই মার-ধর কিছুতেই হার নেই। যখন তখন যে কোন লোককে দুম দাম মেরে বসতে পারে। পরে কি হবে সে-সব ভাবনা ওর নেই। বুকে যেন ওর কোন ভয়-টয় নেই। ফলে, এখন বুঝতে পারি, ওর এতে লাভই হয়েছে। আমার মতন সামান্য একটা চাকরির জন্যে কোন সময়ই ওকে হা-হুতাশ করতে হবে না। যেকোন ভাবে নিজেকে একবার ষণ্ডাগুণ্ডা হিসেবে লোকের কাছে চেনাতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই। টাকা তখন নিজে থেকেই পায়ে হেঁটে আসবে। আমার বিশ্বাস ও তা পারবে। এবং পারছেও। ইতিমধ্যেই ও অনেকখানি পরিচিত হয়ে উঠেছে। বাকি পথটুকু পৌঁছতে ওর আর দেরি হবে না।

অথচ আমার মতন দুর্বল ভীরু একটা ছেলের জন্যে কারো মাথা ব্যথা নেই। আমি বাঁচলাম কি মরলাম সে জন্যে কারো ভাবনা বা কষ্ট নেই। কেন নেই, কেন এমনটা হল? ভেবে ভেবেও আমি কোন উত্তর পাই না। কি নির্মম এই পৃথিবী! কি নিষ্ঠুর এই লোকজন! এখানে কারো কথা কেউ ভাবে না। কারো জন্যে কেউ দুঃখ বোধ করে না। ভালবাসার কি এতই ঘাটতি? যে যার নিজেকে নিয়ে মেতে আছে। অন্যের জন্যে সময় নষ্ট করা বোকামো।

চাকরি দেওয়ার ছল করে অনেকেই আমাকে দিনের পর দিন ঘুরিয়েছে। আমি তিতিবিরক্ত। মনে মনে তখন বেশ অধৈর্য, অস্থির।

আমার কিছুই ভাল লাগে না। সব কিছুর ওপর থেকেই যেন আমার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ কেমন দুনিয়া! কেউ কারো দিকে তাকাবে না। কারো দুঃখ কেউ বুঝবে না। কোন দয়া নেই। মমতা নেই। মুখে বড় বড় কথা। আমি বেঁচে থাকার মতন সামান্য একটা চাকরিও কেন পাব না? কি আমার অপরাধ? আমার কি বাঁচার কোন অধিকারই এখানে নেই! এ ভাবে কেন আমাকে বার বার ঠকতে হচ্ছে? এর ওপর সভ্যতা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ইত্যাদি গালভরা কথা শুনলে ইদানীং আমার রাগ হয়। এগুলো কি নিছকই কথার কথা? আমার কেন যেন মানুষের ওপর ক্রমে ক্রমে ঘৃণা জন্মাচ্ছিল। দিন দিন মানুষের একি চেহারা হয়েছে! শুধু ছুটছে তো ছুটছেই। দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যে মনের দুটো কথা বলবে বা শুনবে, তার কোন সময় নেই। মমতা সহানুভূতি, এগুলোও ভোঁতা হয়ে গেছে। এখানে এখন কে কাকে ঠেলে বড় হবে তারই অন্ধ, অসুস্থ প্রতিযোগিতা। কে কাকে কিভাবে অপমান করবে, তারই চেষ্টা। কাকে কিভাবে ঠকাবে, তারই হীন কানাকানি। এটুকু বয়েসেই মানুষের নীচতা স্বার্থপরতার কিছু কিছু পরিচয় আমি পেয়েছি। পাস করার পর থেকেই আমি নানান ধরনের লোকের বাড়িতে টিউসনি করেছি। ভাল-মন্দ সব রকমের অভিজ্ঞতাই আমার আছে।

যাই হোক, মনের যখন এ-রকম অবস্থা, তখন অবনী, আমার সহপাঠী, একদিন বলল, 'কি রে, মাস্টারি করবি?'

আজকাল আর এসব কথা শুনলে তেমন উৎসাহ বোধ করি না। সোজাসুজি বললাম, 'করব।'

'কাল তাহলে ভোরে উঠেই এই ঠিকানায় চলে যাবি।' বলে অবনী এক টুকরো কাগজ আমার হাতে দিল।

আমি কিছু বলার আগেই অবনী ফের বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে, এটা তোর হয়ে যাবে।'

আমি ম্লান হেসে বললাম, 'দেখা যাক।'

অবনী বলল, 'মনে করে সার্টিফিকেটগুলো কিন্তু সঙ্গে নিস।

এগুলো একবার হেডমাস্টামশায় উল্টেপাল্টে দেখবেন, আর দু-একটা কথা হয়ত জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবেন।' খুব সহজেই কথাগুলো বলে গেল অবনী।

'তুই যত সহজে বলছিস, ব্যাপারটা অত সহজ নয়।'

'আমার তো সহজই মনে হয়েছে, আসলে ওখানে নাকি লোক পাওয়া যায় না। সব সময়ই কম লোকে কাজ করতে হয়।'

'সে কি রে!'

'হ্যাঁ রে, তাই তো বললেন হেডমাস্টামশায়।'

'ঠিক আছে, আমি কালই দেখা করছি।' অন্ধকার আর হতাশার মধ্যে আমি আবার যেন এক টুকরো আলোর ফুলকি ফুটতে দেখলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই চা-টা খেয়ে আমি ঠিকানা মতন দেখা করতে চলে গেলাম। প্রয়োজনীয় সবই সঙ্গে নিয়েছি। অনেক খুঁজে খুঁজে এক সময় বাড়ি বের করলাম। একটি ছেলে এসে দরজা খুলে দিল। বসতে বলে ভেতরে চলে গেল ছেলেটি। আমি বসে আছি। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে। একটা আশা যেন হাতছানি দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হবে তো? আমার ভয় ভয় করছে। কি জিজ্ঞেস করবে? আমি মনে মনে শক্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম। রুমাল দিয়ে মুখটা ভাল করে মুছে নিলাম। কই, কেউ তো আসছে না। ছেলেটা ঠিকমতন খবর দিয়েছে তো? আমি চেয়ে আছি। কারো পাত্তা নেই। ছেলেটিও আর আসে না। আমার প্রথমে যে উৎসাহ ছিল, আবার যেন তা মিলিয়ে আসছে। তবে কি এবারও ঠকতে হবে! এসব সাত পাঁচ ভাবছি, এমন সময় মাঝারী বয়েসের একজন লোক ঘরে এলেন। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন, কি ব্যাপার?'

আমি বললাম, 'আমার এক বন্ধুর মুখে খবর পেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনাদের স্কুলে নাকি লোকের দরকার?'

'দরকার মানে খুবই দরকার। তা আপনার অনার্স আছে তো?

'আছে।'

'কোন্ সাবজেক্টে?'

'বাংলায়।'

'দেখি সার্টিফিকেটগুলো।'

আমি সবগুলোই একে একে দেখালাম। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখলেন। দেখতে দেখতে বললেন, 'আমার আরো দুজন লোকের দরকার। ইতিহাস এবং দর্শনশাস্ত্রে অনার্স থাকা চাই।'

আমি চুপ করে থাকলাম।

তিনি সব দেখে-টেখে কাগজপত্তরগুলো আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে ঈষৎ হাসলেন। হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, গাঁয়ে যেতে কোন আপত্তি নেই তো?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না না, আপত্তি থাকবে কেন।' বুঝতে পারছিলাম আমার বুকের ভেতরটা যেন কি রকম করছে। দমকা হাওয়ার মতন একমুঠো খুশি এসে বুকের মধ্যে ঘন ঘন ধাক্কা মারছে। তবে কি আমার চাকরি হয়ে গেল? আমি যে ভাবতে পারছি না! অত সহজে কারো চাকরি হয়? কি আশ্চর্য! আমি যেন মুহূর্তের জন্যে কেমন বিহ্বল, সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

হেডমাস্টামশায় ফের বললেন, 'তাহলে একটা অ্যাপ্লিকেশন এখুনি আমার হাতে দিয়ে দিন।'

আমি আগে থাকতেই অ্যাপ্লিকেশনটা লিখে এনেছিলাম, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি করে পকেট থেকে সেটা বের করে ওঁর হাতে দিলাম। তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার পকেটে রেখে দিলেন।

আমি চুপ করে আছি।

তিনি বললেন, 'আমাদের এইডেড স্কুল, স্কেল অনুযায়ীই টাকা পাবেন। কিন্তু টাকাটা মাসে মাসে দিতে পারব না।'

আমি ওঁর চোখে চোখে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকালাম।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আগেই কিন্তু বলে রাখলাম। জানেনই তো গভর্নমেণ্টের ঘর থেকে ঠিক মতন টাকা না এলে মাস মাস শিক্ষক মশায়দের টাকা দেওয়া মুশকিল। গাঁয়ের মানুষও অধিকাংশই গরীব। তারা ঘরে ফসল উঠলে হয়ত একেবারে বার মাসের মাইনে দিয়ে দেবে। অসুবিধে এটুকুই।'

আমি বললাম, 'ওরা টাকা না দিলে আপনি আর কোত্থেকে দেবেন।'

বুঝলাম আমার কথায় হেডমাস্টামশায় খুশি হয়েছেন। অল্প হেসে বললেন, 'এটাই তো বুঝতে চায় না অনেকে।'

আমি উৎসাহিত বোধ করছিলাম, বললাম, 'এতে না বোঝার কি আছে।'

তিনি আমাকে পছন্দ করেছেন। বললেন, 'আপনি তাহলে কালকেই চলে যান। আমি সেক্রেটারীকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। চিঠিখানা দেখালেই তিনি সব ব্যবস্থা করবেন!'

হেডমাস্টামশায়কে আমার কেন যেন এই মুহূর্তে খুব সহৃদয়, দয়ালু মনে হল। এমন মানুষও আছে! আমার সামনেই তিনি চিঠি লিখতে বসে গেলেন। তিনি আজ আমাকে বাঁচালেন। তাঁর এই ঋণ কি কখনো শোধ করতে পারব! কৃতজ্ঞতায় আবেগে বুকের ভেতরটা আমার ভরে উঠেছে। ওঁর মুখের একটা কথাতেই আমার চাকরি হয়ে গেল! আমার বুকের ভেতরটা কেমন নরম হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠে গিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলাম। তিনি যেন এতে আরও খুশি হলেন। আমি গভীর আবেগে, গাঢ় কণ্ঠে বললাম, 'স্যার, আজ আপনি আমার যে কি উপকার করলেন, সে শুধু আমিই জানি।'

তিনি ততক্ষণে চিঠি লেখা শেষ করেছেন। ভাঁজ করে খামে ভরতে ভরতে বললেন, 'কোন অসুবিধা হবে না আপনার। আমিও তো অনেকদিন ওখানে আছি।' খামটা আমার হাতে দিলেন।

কিভাবে যেতে হবে একসময় তিনি তারও নির্দেশ দিলেন আমায়! বাসে বা ট্রেনে করে প্রথমে ডায়মণ্ডহারবার। তারপর উননব্বই নম্বর বাসে করে কাকদ্বীপ। সেখানে পৌঁছে খানিকটা হেঁটে গিয়ে বাজার। বাজারে সেক্রেটারীর ওষুধের দোকান। গুণধর ডিঙ্গাল। নাম বললেই লোকে দেখিয়ে দেবে।

আমি একটা কাগজে সব লিখে নিলাম।

রাস্তায় নেমে আমার সব কিছুই যেন আবার নতুন লাগছে। মনের মধ্যে এতদিন ধরে যে মেঘ জমেছিল এখন যেন ধীরে ধীরে তা উড়ে যাচ্ছে। বেশ ভাল লাগছিল। আবার যেন ঝকঝকে দেখাচ্ছে। আমার এখন সবাইকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। কারো বিরুদ্ধে আমার আর কোন নালিশ নেই। অবনীর এ উপকারের কথা আমি ভুলব না। এবার বাবা-মার মুখেও খানিকটা হাসি ফুটবে।

বাসায় ফিরে খেতে বসে মাকেই প্রথমে খবরটা দিয়েছি। মা তো ভীষণ খুশি, খুশি সবাই। কিন্তু মার মুখটা দেখলাম এরই মধ্যে কেমন একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এতদূর একা একা যাওয়া মার ঠিক মনঃপূত হল না। আমার মনে হল, আমার জন্যে মা যেন এখন থেকেই কেমন এক উদ্বেগ বোধ করতে শুরু করেছে। সত্যিই এতদূরে আগে আর কখনো আমি যাই নি।

মা কেমন দুঃখীর গলায় বলল, 'ওদিকে সাপ-টাপ আছে না?'

বাবা, মার কথা শুনে হেসে উঠেছে। হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি এমন এক একটা কথা বল না, পাড়াগাঁয়ে সাপ থাকবে না তো সাপ থাকবে সহরে!'

মার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মনে হল, যেন বেফাঁস কোন কথা বলে ফেলেছে। একটু রাগের গলায় বলল, 'এতে এত হাসির কি হল তোমার? সহরেও সাপের অভাব নেই! এখানেও ঢের ঢের কাল কেউটে আছে।' বলে উঠে গেল।

বাবা এবার শান্ত স্বরে আমাকে সাহস দেওয়ার মতন করে বলল, '‘ও কিছুই না। পুরুষ মানুষের এত ভয় করলে চলে? চলে না। লোকে চাকরি করতে আরো কত দূর দূরান্তরে যায়। এ তো ভালই রে। ছুটিছাটায় আসতে পারবি। তবে চাকরিটা কিনা স্কুল-মাস্টারি এই যা!’

আমি বলেছি, ‘এতে আমার কোন দুঃখ নেই।’

বাবা একটু বেজার মনে বলল, ‘আছে রে আছে, তবে এখন বুঝবি না, পরে। ছুনিয়াটা অত সোজা সরল নয় রে।’

আমি আজ আর এসব কথার জবাব দিলাম না। যাই হোক, হয়েছে তো একটা! ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। এই নিয়েই আপাতত আমি তৃপ্ত। শুধু একটা জায়গায় সামান্য খটকা। পড়াশুনোটা এবার ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। আমার আর এম. এ, পরীক্ষা দেওয়া হবে না।’

ইতিমধ্যে যেসব বাড়িতে টিউসনি করি, তার কয়েকটা জায়গায় খবর দিয়ে দিয়েছি অন্য কোন টিউটর দেখে নিতে। এক বাড়িতে অনেকগুলো টাকা বাকি। সেখানে সামান্য ক’টাকা পেয়েছি। বুঝেছি, এ টাকাটাও গেল। এ অভিজ্ঞতা অবশ্য আমার নতুন নয়।

এছাঁড়া আর কোথাও যেতে পারি নি। আসলে সময় ছিল না আমার। একদিনের মধ্যেই আমাকে তৈরী হয়ে নিতে হল। তাছাড়া এমনিতেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এরমধ্যে আমাকে আরো কতগুলো টুকিটাকি কাজ সারতে হয়েছে। আমার জামা কাপড়-গুলো অবশ্য মিলু ধুয়ে-টুয়ে দিয়েছে। আমি একটা গামছা কিনেছি। চটিটা ছিঁড়ে গেছে। এ নিয়ে দূরে যাওয়া যায় না। সস্তা দামের ফুটপাথ থেকে এক জোড়া চটি কিনলাম। কাগজ-পত্তরগুলো গুছিয়ে এক জায়গায় রাখলাম। কি কি সঙ্গে নিতে হবে, সব এক এক করে গুণে ঠিক করে নিয়েছি।

রাত্রে আর ঘুম হয় না। হালকা টুকরো মেঘের মত কত কি ভাবনা উঁকি দিয়ে চলে যায়। মনে মনে ভাবি, চিনে চিনে ঠিক মতন যেতে পারব তো? এভাবে তো একা একা আর কখনোই বাইরে যাই নি! কিরকম জায়গা হবে কে জানে! এখানকার পরিচিত জায়গা ছেড়ে যেতে যেন আমার কষ্ট হচ্ছিল। আমি তো ওখানের কিছুই জানি না। কাউকেই চিনি না। আমাকেও কেউ চেনে না। আমি একা একা ওখানে সবাইকে ছেড়ে-ছুড়ে থাকতে পারব? অথচ উপায়ও তো নেই।

অবনীকেও শেষ পর্যন্ত কি হল জানানো গেল না। ক'দিন দেখা না হলেই ও বুঝতে পারবে। ওর কথাই ঠিক, কাজটা হয়ে গেল। ওর বন্ধুত্ব ভোলা যাবে না।

স্বাতীও কিছু জানল না। খবরটা ওকে জানাতে পারি নি বলে আমার আফসোস হচ্ছিল। ওকে না বলার জন্যে ও আমার ওপর নির্ঘাৎ অভিমান করবে। ওর প্রতি আমার, সত্যি কথা বলতে কি বেশ দুর্বলতা। কিন্তু আমার এই দুর্বলতা চট করে ওকে বুঝতে দিতাম না। নিজেকে যতটা গুটিয়ে রাখা সম্ভব, রাখতাম। ও আমার সাংসারিক দীনতার কথা তো জানে না! ওর কাছে সব জানাতেও আমার কুণ্ঠা হত। ও আমার জন্যে ভাবে। বুঝতে পারি, আমাকে ও ভালবাসে। আমি ওকে পছন্দ করি। ও-ও এই উত্তর কলকাতারই মেয়ে। বাগবাজারে থাকে। ওর বাবা ভাল কাজ করে। নিজেদের বাড়ি, সচ্ছল অবস্থা। ওদের বাড়িতে আমি কয়েকবার গেছি। ও-ই আমাকে নিয়ে গেছে। এসব দেখে-টেখে আমার সঙ্কোচ যেন আরো বেড়ে যেত। আমার কষ্ট আরো বাড়ত। ওর ঠিকানাটা আমার কাছে আছে। ওখানে গিয়ে ওকে চিঠি লিখলেই হবে। স্বাতী আর আমি এখানে অনেকগুলো সিনেমা দেখেছি। ও-ই বেশীর ভাগ সময় টিকিট কেটে রাখত।

এসব এলোমেলো ভাবনার ভেতর দিয়ে একসময় আমার চোখে

ঘুম নেমে এসেছিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে-রাতে আমি অনেক স্বপ্ন দেখেছি। অথচ জেগে উঠে একটাও মনে করতে পারলাম না। আমি উৎসাহ ভরে মুখ-হাত ধুয়ে নিলাম। খালি মুখে বেরোতে নেই। মা আমার জন্যে ওই সাত সকালেই দুটো ভাত ফুটিয়েছে। খেয়ে দেয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। আকাশের চেহারাটা তেমন ঝকঝকে ছিল না। একটু ঘোলাটে ঘোলাটে। এলোমেলো বাতাস ছিল। কিন্তু এখানে ঠিক অতটা বোঝা গেল না। খুব ভোরের দিকে নাকি বৃষ্টিও হয়েছে। আমি বেরোবার আগে আর একবার দেখে নিলাম সব। চিঠিটা নিতে ভুল হয় নি আমার। মাকে প্রণাম করতে গিয়ে আমারও বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠেছে। মা চোখে আঁচল চেপে ধরেছে। মা বিপদ ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন এবং আরো দেব-দেবীর নাম করতে করতে কেঁদে ফেলেছে। আমারও চোখ ছল ছল করে উঠেছে। মনে মনে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, এতো দূরে যাচ্ছি না। ক'দিন পরেই আবার আমি ফিরে আসব, তবু যেন মন মানে না। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

বাবুলটা আমাকে অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়ে গেছে। ও বেশী কথা বলে নি। আমি চলে আসার মুখে একসময় বলেছি, 'একটু বুদ্ধি খরচ করে চলবি, বুঝলি ?'

পথে আসতে আসতে আমার অনেক কিছু মনে পড়ছিল। ঘরের কথাও ভুলতে পারছিলাম না। অভিমানে বারবার বুকটা ভারী হয়ে উঠছিল। আমি যে এত করে ভাবছি, আমার কথা মা ছাড়া কে আর ভাবছে ? এত বড় কলকাতা সহরে আমার জায়গা হল না। আমি ওখানে থাকলাম কি না থাকলাম, কারো কিছু আসে যায় না তো। এত হইচইয়ের মধ্যে কি আমার কথা কারো মনে পড়বে ? একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আমি আবার যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। এক সময় চোখের পাতা ভেজা ভেজা লাগে। রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি করে মুখ মুছে নিই।

দুই

কাকদ্বীপে এসে যখন পৌঁছলাম বেলা তখন একটা বেজে দশ মিনিট। আমার খুব খিদে পেয়েছে। পেটের ভেতরটা যেন জ্বলছে। ভাগ্যিস, সকালে দুটো ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়ে ছিলাম। মার করুণ ম্লান মুখটা আবার আমার মনে পড়ে গেল। দূর কিছু কম নয়। সেই কোন সকালে বেরিয়েছি, এখনও তার শেষ নেই। বাসের ঝাঁকুনিতে আমার গা-হাত-পা ব্যথা করছিল। কোমর ধরে গিয়েছিল! পথে কত লোকজন বাসে উঠল, নামল। অথচ এদের কাউকেই আমি আগে দেখি নি। এরাও মাঝে মাঝে আমার দিকে কৌতূহলের চোখে তাকিয়েছে। কেউ কেউ আবার জিজ্ঞেস করেছে, আমি কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব, কেন যাব ইত্যাদি টুকরো-টাকরা সব কথা। আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছি।

কলকাতা ছাড়বার পরেই বুঝেছি, দিনের গতিক সুবিধের নয়। আকাশে কালো জমাট মেঘ। বাতাস দুরন্ত। এলোমেলো। পথেই তিন চারবার জোরে বৃষ্টি হয়েছে। জানালা দিয়ে জলের ছাঁট এসেছে। কাদা পায়ে লোকজন ওঠানামা করেছে। আমার জামা কাপড়েও তার সামান্য দাগ পড়েছে। কাকদ্বীপ পৌঁছবার আগেই বৃষ্টিটা ধরেছে। মেঘ খানিকটা পাতলা হয়েছে। ঝিকমিক করে সূর্যি-ঠাকুর উঁকি মেরেছেন। ওইটুকুই। আবার পরক্ষণই মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে সব। আকাশে আবার ধূসর মেঘ ঘুরছে। হু হু করে বাতাসের ছুটোছুটি। যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

বাস থেকে নেমে আমি চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। আর একটু পরেই, আমার মনে হল, মাঠের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি নামবে। তারই তোড়জোড়। আকাশ এরই মধ্যে দেখতে দেখতে

আরো কুচকুচে কালো হয়েছে। সে এক দেখার মতন ছবি। দিগন্ত জোড়া মাঠ আর মাঠ। তখনো ধান পোঁতা চলছে। বাতাসের দুরন্তপনা যেন আরো বেড়েছে। পাখিরা খেলা করছে। আকাশে চিল উড়ছে। বক জলার পাশে পাশে শিকারের লোভে সাবধানে পা ফেলছে। কাঁদাখোঁচা লেজ নাচিয়ে নাচিয়ে দানা খুঁটছে। মেঘে মেঘে ঠাস বুনন। একটা নরম স্যাঁতস্যাঁতে ছায়া মাথার ওপর ঝুলে আছে। ঘরে থাকতে এসব ছবি তো এমন করে কখনো চোখে পড়ে নি! আমি অল্পক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখলাম।

বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছেই একটা টিউবওয়েল! সেখানে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ধুয়ে নিলাম। খানিকটা জলও খেয়ে নিয়েছি। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। দমকা বাতাস এসে আমার গায়ে মুখে আছড়ে পড়ছে। জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে। আমি পকেট থেকে টুকরো কাগজটা বের করে একবার দেখে নিলাম। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। রাস্তা ভুল হওয়ার কিছু ছিল না। সোজা হেঁটে গিয়ে ডান দিকে ঘুরলেই নাকি বাজার। লোকজনের ভিড়, যাওয়া-আসা, কথাবার্তা, ব্যস্ততা এবং দোকান পাট দেখে আমিও তাই আন্দাজ করেছি। আঁষটে একটা গন্ধ এসে নাকে লাগছে।

মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একটা চায়ের দোকান দেখে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। চা খেয়ে নিলে মন্দ হয় না! অনেকেই সেখানে চা খাচ্ছিল। আমিও ঢুকে পড়লাম। আগে জল বিস্কুট খেয়ে নিলাম। চা খেতে খেতে এখানেই একজনকে সেক্রেটারীর নাম জিজ্ঞেস করলাম। ওরা অনেকেই আমাকে সাহায্য করতে চাইল। দেখলাম অনেকেই গুণধরবাবুকে চেনে। ডাক্তারবাবু হিসেবেই উনি এখানে বেশী পরিচিত। আমার পরিচয়ও জিজ্ঞেস করল ওরা। চা খাওয়া শেষ হলে ওদের একজন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল। ডানপাশে থানা। আরো খানিকটা ওই প্যাঁচ-প্যাঁচে কাদায় হাঁটলাম। একসময়

একটা ওষুধের দোকানের সামনে এসে আমাকে পৌঁছে দিয়ে লোকটি বাজারের ভেতরে ঢুকে গেল। আমি ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম। দোকানে বেশ ভিড় ছিল। মাঝ-বয়েসী একজন লোক খালি গায়ে ওদের সঙ্গে কথা বলছে। একজন ওষুধ দিচ্ছে আর ওই লোকটি গুনে গুনে দাম নিচ্ছে। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত কাপড় তোলা। গায়ে অজস্র লোম। রঙ কালো।

আমার বুঝতে অসুবিধে হল না উনিই সেক্রেটারী। গুণধর ডিঙ্গাল। 'ডিঙ্গাল' পদবী এর আগে আমি কখনো শুনি নি। তাই প্রথমটায় একটু অবাক হয়েছিলাম। পরে মনে হয়েছে এত অবাক হওয়ার মতন কিছুই নেই। আমি আর কতটুকু জানি! এই বিশাল দেশের অনেক কিছুই তো আমার অজানা রয়ে গেল। কতরকম মানুষ, কতরকম তার পদবী। আমি হাত তুলে নমস্কার জানালাম।

উনি আমার দিকে তাকালেন। আমার বেশভুষা এক পলক দেখে নিলেন। হাত তুলে প্রতি নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি?'

'আমি কলকাতা থেকে আসছি।'

'ও, মাস্টামশায় পাঠিয়েছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।' আমি একটা খাম ওঁর হাতে দিলাম।

খামটা সঙ্গে সঙ্গে উনি ছিঁড়ে ফেললেন। চিঠিটা দ্রুত একবার পড়ে গেলেন। পড়তে পড়তেই তিনি কথা বলছিলেন। এক ফাঁকে আমাকে শুধোলেন, 'উনি কবে আসছেন?'

'বলেছেন তো দু একদিনের মধ্যেই আসবেন।'

'ঠিক আছে, আপনি এসে গেছেন ভালই হয়েছে। বুঝলেন, আমাদের স্কুলটা খুবই ভাল। তবে একটু দূর, এই যা। আপনি বসুন, চা খান।' উনি তাড়াতাড়ি করে কথাগুলো বলে গেলেন। আবার ওষুধ কেনা-বেচার দিকে নজর দিলেন। চায়ের অর্ডার দিলেন।

আমি বসে বসে সব লক্ষ্য করছিলাম। খানিক পরে চা এল,

বিস্কুট এল। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে তিনি বললেন, 'খান।' গুণধরবাবু নিজেও একটা চায়ের গ্লাস নিলেন।

চা খাওয়া শেষ হল। আমি উসখুস করছিলাম। স্কুল এখান থেকে কোথায়, কতদূর কিছুই জানি না। একবার জায়গা মতন পৌঁছতে পারলে যেন স্বস্তি!

গুণধরবাবু দোকানের একজনকে বললেন, 'এই মদন, মাস্টামশায়কে আমার বাড়িতে নিয়ে যা।' পরক্ষণেই আমার দিকে চেয়ে গরগর করে বলে গেলেন, 'ওখানে গিয়ে আপনি বিশ্রাম করুন, ইচ্ছে করলে চান-টানও করতে পারেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পরে যাবেন। ভয় নেই, সঙ্গে লোক দিয়ে দেব। ছোট মতন একটা নদী পেরোতে হবে মাত্র।'

আমি অবাক হলাম। কিন্তু বুঝতে দিলাম না। এরপর আবার নদী পেরোতে হবে! বুকটা আমার ধড়াস করে উঠল। মনে পড়ে না কখনো নদী পেরিয়েছি। মাস্টামশায় আমাকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত পথের নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর আর কিছু আমার কাছে খুলে বলেন নি। আমিও কিছু জিজ্ঞেস করি নি। নদী পেরোবার কথা তো আমাকে একবারও বলেন নি! আমি যে সাঁতার জানি না! নদীর নাম শুনতেই আমার মুখটা যেন কেমন শুকিয়ে গেল। আমার ভয় করতে লাগল। এরপর আবার কোথায় যেতে হবে কে জানে। গুণধরবাবুও পুরোপুরি আমাকে কিছু ভাঙলেন না।

খানিকক্ষণ পরে আমি গুণধরবাবুর বাড়িতে এলাম। মদন আর দাঁড়াল না। চলে গেল। আমি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। মনে মনে কেমন এক ক্লান্তি বোধ করছি। আর ভাবতে পারছি না। আমার মাথায় আর কিছু থাকছে না। নদীর কথা শুনে আমি মনমরা হয়ে গেলাম! আমার উৎসাহ যেন নিবু নিবু হয়ে আসছে। এখন কি করব বুঝতে পারছি না। দেখাই যাক।



এতদূর এসে ফিরে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না। ওখানে ফিরে যাওয়া মানে তো আবার সেই ব্যর্থতা, গ্লানি। সেই একঘেয়ে ছবি। যতই বিপদ আসুক, অসুবিধে হোক, আমার ফেরার কোন উপায় নেই। আমার কষ্ট হচ্ছিল। কান্না পাচ্ছিল। ছেলেমানুষের মতন আমার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কলকাতার মতন জায়গায় আমার সামান্য একটা চাকরি হল না! হায় রে কপাল! এই কলকাতার ওপরই না আমার কত অভিযোগ, কত রাগ! ওখানকার লোকজনের দয়া মায়া নেই, সব স্বার্থপর, নিষ্ঠুর। তারা আমাকে বোঝে না। আমার দুঃখ বুঝতে চায় না। এমনি আরও কত কি ভাবছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি সব যেন ভুলে গেলাম। এখন কলকাতার ওপর আমার আর কোন অভিযোগ নেই। কোনরকম রাগ নেই। এরই মধ্যে কলকাতার জন্যেই আমার মন পুড়ছে। ভেবেছিলাম এখানে এসেই আমার যাত্রা শেষ হবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, পথ আরো দীর্ঘ, আরো অসমান। এসব ভাবতে ভাবতে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাই নি। মনে হচ্ছিল, আমি কলকাতায় পরিচিত মহলেই আছি।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি সামনে গুণধরবাবু।

আমি ঠিক-ঠাক হয়ে বসলাম।

'আপনি চান করবেন না?' গুণধরবাবু শুধোলেন।

'না।'

'তাহলে হাত-মুখটা ধুয়ে নিন।'

চাকর ঘটি করে জল নিয়ে এল। গামছা এগিয়ে দিল।

আমি কথা ব্যয় না করে হাত-পা ধুয়ে নিলাম।

ইতিমধ্যে এই ঘরেরই মেঝেয় একটা আসন পাতা হয়েছে; এক গ্লাস জলও দিয়ে গেল একটি ছোট ছেলে।

সেক্রেটারী নিজেই ভাতের থালা নিয়ে এলেন। তিনিই পরিবেশন করলেন। এতেও আমি খানিকটা অবাক হয়েছি। হয়ত বিদেশী

লোকের সামনে বউ-ঝি-দের বেরোনো নিষেধ। খেতে খেতে আরো বেলা হল। ঘড়িতে তখন আড়াইটে।

গুণধরবাবু বললেন, 'একটু পরেই একজন লোক আসবে, ও আপনাকে নিয়ে যাবে। কোন অসুবিধে হবে না আপনার। আমি ওকে সব বলে দিয়েছি। আমি ওর হাতে একটা চিঠিও দিয়ে দিলাম। ও আসতে আসতে আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন।'

আমার আর ঘুম হল না। এবার কাজের জায়গায় যাওয়ার জন্যে মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে। একটু পরে একজন লোক এল। লোকটি প্রথমে ভেতরে চলে গেল। পরে এ-ঘরে এল। আমাকে হাত তুলে নমস্কার করল। আমিও প্রতি নমস্কার জানালাম।

'আপনিই আমাদের নতুন মাস্টামশায়!' হাসি হাসি মুখ।

আমি মাথা নাড়ালাম।

'গুণধরদা আমাকে সবই বলেছে।'

বাইরে তখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। এখানেও সেই আঁষটে গন্ধটা।

লোকটি বিড়ি টানতে টানতে বলল, 'বৃষ্টিটা একটু ধরলেই চলুন যাওয়া যাক। এখন একটা নৌকো পাওয়া যাবে।'

খানিকক্ষণ পর আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় সেই কাদা। জায়গায় জায়গায় কাঁঠালের স্তূপ। খেয়াঘাটে আসতে আসতে সেই আঁষটে গন্ধটা যেন আরো বেড়েছে। বাজার পেছনে রেখে আমরা নদীর পারে এলাম। ভীষণ নোংরা। জল কাদায় গা ঘিন ঘিন করে। খালে অনেক নৌকো। ছোট বড় মাঝারি। অনেক জায়গার নৌকো। এটা একটা বড় গঞ্জ। কোন কোনটা ছেড়ে যাচ্ছে, কোনটায় লোক উঠছে। এসব পেছল রাস্তায় আমার হাঁটার অভ্যেস নেই। পা টিপে টিপে হাঁটছি। খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। যে-কোন সময় চিৎপটাং হয়ে পড়ে যেতে পারি। অথচ আমার সঙ্গের লোকটির কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

একটা জায়গায় এসে আমরা দাঁড়ালাম। এখান থেকে নদীর খানিকটা চেহারা দেখা যায়। আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। শুকনো মুখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই নদী পেরোতে হবে?'

লোকটি আমার দিকে চেয়ে হাসল। হেসে হেসে বলল, 'এ তো ছোট নদী। ভয়ের কিছু নেই। আমরা তো প্রায় রোজই যাওয়া আসা করছি। আপনারা সহরের লোক। আপনাদের ভয়টা মাস্টামশায় অনেক বেশী। সহরেও তো বাস-ট্রামের তলায় পড়ে কত লোক মরে যাচ্ছে। কিন্তু নৌকোডুবিতে লোক মরেছে কালেভদ্রে। অত ভয় পাবেন না, অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

একথা শোনার পরও আমার ভয় গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পাল খাটিয়ে নৌকো ছুটে যাচ্ছে। অনেক নৌকো। বাতাস দুরন্ত। নদীর বুকে ঢেউ। আকাশ এখন আরো কালো। মেঘের ভারে যেন আকাশটা নদীর ওপর ঝুঁকে পড়েছে। যে-কোন সময় ওটা পড়ে যেতে পারে। ভেজা মাটির গন্ধ। মাছি ভন ভন করছে। আমার পায়ে কাদা। জামা-কাপড়েও কাদা লেগেছে। এরকম কষ্ট জীবনে আমার এই প্রথম। তবু পেছনে ফেরার কোন উপায় নেই। দেখলাম এক জায়গায় কিছু আধবয়েসী মেয়েছেলে গোল হয়ে বসেছে। বসে বসে ওরা বিড়ি ফুঁকছে। কিছু লোক গিয়ে নৌকোয় উঠেছে। নৌকোর কাছাকাছি কাদা থিক থিক করছে। অনেকের পা ডুবে যাচ্ছে সেই কাদায়। ওরা হাঁটুর ওপর পর্যন্ত কাপড় তুলে নিয়েছে। সেই কাদা ঠেলে ঠেলে ওরা নৌকোতে গিয়ে উঠছে। নৌকোর গায়ে কাঠের একটা সিঁড়ি লাগানো। লোকগুলো সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের কাদা ধুয়ে নিচ্ছিল। অনেকে নৌকোয় উঠে কিনারে বসে জলে পা দোলাচ্ছে। আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব ওরা কি করছে?'

'কাদা ধুয়ে নিচ্ছে।'

বুঝলাম আমাকেও ঠিক একই ভাবে কাদা ঠেলে ওখানে যেতে

হবে। ওভাবেই কাদা ধুয়ে নৌকোয় উঠতে হবে। পারব তো?

লোকটি বেশ আলাপে। হাসি মুখে বলল, 'আপনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন তো মাস্টামশায়?'

'এসব কখনো দেখি নি তো!' আমি আমতা আমতা করলাম।

'তা ঠিক, প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হয়ই। হাজার হোক, আপনারা হলেন সহরের মানুষ।'

আমি চুপ করে থাকি।

লোকটি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে আবার বলল, 'জায়গাটা আপনার খারাপ লাগবে না। বর্ষাকালটায় একটু অসুবিধে, কিন্তু অন্য সময়ে খুব সুন্দর।'

আমি সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের আর কদ্দূর যেতে হবে বলুন তো?'

'কদ্দূর আর, নদীটা পেরোলেই তো পৌঁছে গেলাম। কচুবেড়ে, কচুবেড়ে থেকে বামনখালি। মাত্র মাইল আড়াই হাঁটতে হবে।' খুব অনাড়ষ্ট গলায় বলে গেল।

মনে মনে বললাম, কপালে তাহলে আরো দুর্ভোগ আছে।

লোকটি বিড়ি ধরিয়ে নিল। বিড়ি টানতে টানতে বলল, 'বুঝলেন মাস্টামশায়, গাঁয়ে আসতে সহরের লোক বড় ভয় পায়।'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'সব সময় তা ঠিক নয়।'

'না না, সব সময়ই তা ঠিক। দায়ে না পড়লে সহজে কেউ এখানে আসে না।' লোকটিকে যেন এই মুহূর্তে সামান্য ক্ষুণ্ণ মনে হল। বিড়ি টানতে টানতে বলল, 'দেখছি তো, এখানে এসে কেউ দশ দিনের বেশীও থাকতে চায় না। থাকে না কেউ, পালিয়ে যায়। কেন, আমরা কি টাকা-পয়সা দিই না? আমরা তো সবাইকে এখানে আদর করেই রাখতে চাই। কিন্তু থাকবে না। বছরে দশবার করে মাস্টার এলে গেলে কি আর ছেলে-মেয়ের পড়াশোনা হয়!'

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে শুধোলাম, 'এসে এসে ওরা চলে যায় কেন?'

'কে, জানে, বোধহয় নদী-টদী দেখে ভয় পায়। আরে, আমারও তো এখানে আছি, আমরাও তো মানুষ, না মানুষ নয় ?'

বোঝা গেল না লোকটি আমাকেই বা এসব কথা শোনাচ্ছে কেন। হয়ত আমার মুখ-চোখে কিছু একটা দেখেছে। তাতেই ধরে-নিয়েছে আমিও ভয় পেয়েছি। আমিও একদিন অন্যদের মতন পালিয়ে যেতে পারি। সেজন্যেই কি আগে থাকতে কথাগুলো আমাকে শুনিয়ে রাখছে! অস্বীকার করে লাভ নাই, আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি। এরকমটা আমার ধারণা ছিল না। তবে নিরুপায় না হলে আমি সহজে এখান থেকে সরব না। যদি এরচেয়ে ভাল কোন সুযোগ আসে, তবেই চলে যাওয়ার প্রশ্ন। আমি চুপ করে থাকলাম।

লোকটি সখেদে আবার বলল, 'স্কুলটা হায়ার-সেকেণ্ডারী হয়েই ঠেকিয়েছে। আর কটা বছর মাস্টামশায়, তারপর দেশের ছেলেগুলো একবার পাস করে এলেই আর সাধাসাধি করতে হবে না।'

'আপনিও কি ওই স্কুলের সঙ্গে জড়িত ?'

'হ্যাঁ, আমিও স্কুল কমিটির একজন মেম্বার। আমরাই অনেক কষ্ট করে স্কুলটা করেছি।'

'আপনার নামটা ?'

'সুদর্শন খাটুয়া।' বিড়িটা শেষ হয়ে এসেছে। আরো কটা টান মেরে টুকরোটা ফেলে দিয়ে আবার বলল, 'আমরা এখানে তিন পুরুষ আছি। সে-সব ভয়ঙ্কর দিনের কথা শুনলে তো আর উপায় নেই।'

সুদর্শন খাটুয়ার বয়েস পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ হবে। শক্ত মজবুত চেহারা। গায়ের রঙ কালো কুচকুচে। পরনে খদ্দরের কাপড়। গায়েও রঙিন খদ্দরের জামা। অনর্গল কথা বলে যেতে পারে। একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, 'যখন হায়ার-সেকেণ্ডারী হয় নি তখনই স্কুলটা ভাল ছিল। কত ভাল ভাল মাস্টামশায়রা তখন

এখানে এসেছেন। তাঁরা এসে নাক কুঁচকে চলে যান নি। আমরা তখন ছাত্র। কি যে ভালবাসতেন আমাদের। এখন আর পুরনোদের কেউই নেই। এই হেডমাস্টামশায়ও ভাল, তবে বুঝলেন কি না, ভাল ইংরেজী বলতেন দাশগুপ্ত। আমাদের হেডমাস্টামশায় ছিলেন।' একথা বলতে গিয়ে যেন গর্ববোধ করে সুদর্শনবাবু।

'কে দাশগুপ্ত ?'

'তিনিই তো স্কুলটা অনেক কষ্ট করে গড়েছেন। সেদিন কি আর এমন টাকা-কড়ি ছিল! কিছুই না। কলকাতা থেকে ইন্সপেক্টর এল। খুশি হয়ে কলকাতায় ফিরে গেল আবার। হেডমাস্টামশায়ের মুখে ইংরেজী শুনে থ। মুখে যেন খই ফুটত। কিন্তু কি যে হল হঠাৎ, একদিন গভীর রাত্রে কাউকেই প্রায় না জানিয়ে তিনি চলে গেলেন।'

আমার খুব মজা লাগছিল। আমি জিজ্ঞেস করলম, 'সে কি ?'

'হ্যাঁ—। কি যে রহস্য, আমরা আজো জানি না। জানলেও বিশ্বাস হয় না।'

'কি বিশ্বাস হয় না ?'

'এখন কেউ কেউ অন্য কথা বলে।' মুখটা যেন ওর বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুদর্শনবাবু ফের বলতে আরম্ভ করে, 'গোবিন্দবাবু বলে আমাদের এক মাস্টামশায় ছিলেন। তিনিও হেডমাস্টামশায়ের দেশের মানুষ। খুব ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। একদিন কি নিয়ে যেন দুজনের মধ্যে দারুণ ঝগড়া। সে কি ইংরেজীতে কথা কাটাকাটি! সেদিনই আমরা গোবিন্দ স্যারের রাগ দেখলাম। কি ভয়ঙ্কর রাগ! আর এই ঝগড়াই হল কাল। আমরা তখন ছাত্র। এরপর স্কুল ছুটি হয়ে গেল। এটা নিয়ে আমাদের গাঁয়ে বড় ছোট সকলের মধ্যেই হই-চই পড়ে গেল। এরপর থেকে গোবিন্দ স্যারের সঙ্গে হেডমাস্টামশায়ের কথা বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন গোবিন্দ স্যার কতকাতায় চলে গেলেন।

কদিন পর আবার ফিরে এলেন। খুশি খুশি ভাব। হেডমাস্টা-মশায়কে আবার কি সব যেন নতুন করে বললেন। হেডস্যার সেবার আর ঝগড়া করলেন না। মুখের ভাব যেন অন্যরকম হয়ে গেল। কিছু বুঝতে পারলাম না আমরা। ওই রকম যাঁর দাপট, হঠাৎ যেন তিনি কেমন নিবু নিবু হয়ে গেলেন। তারপর একদিন উধাও। গাঁয়ের মানুষ অবাক। মাথায় হাত দিয়ে বসল। হায় হায় করতে লাগল। এরকম একজন মানুষ কিনা শেষে এভাবে পালিয়ে গেল! গোবিন্দবাবু কলকাতা থেকে কি যে খবর নিয়ে এলেন! আমাদেরও খুব কষ্ট হয়েছিল।'

আমার কাছেও কেমন রহস্যময় মনে হয়। কৌতূহল দমন করে নিলাম। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের কোন্ নৌকোয় উঠতে হবে?'

সুদর্শন খাটুয়া আঙুল তুলে একটা নৌকো দেখাল। সেখানে অনেক লোক বসে আছে। বলল, 'এখনও মাঝি ওঠে নি। চলুন নৌকোয় গিয়ে বসি।'

আসতে আসতে দেখলাম অনেকগুলো নৌকো। ওই খালের মধ্যে আবার পর পর দুটো নৌকো ঢুকল। পাল নামিয়ে নিয়েছে। আমার কেন যেন ভয় হচ্ছিল, যে-কোন নৌকোর সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, কারো সঙ্গে কারো ধাক্কা লাগে না। আজ কাকদ্বীপের হাট, সেজন্যেই নাকি দূর দূর থেকে নৌকো আসছে। মাল কেনা বেচার বড় মোকাম। কোনটায় মাল বোঝাই, কোনটায় লোকজন! সুদর্শন খাটুয়া ওদের একজনকে জোরে জোরে জিজ্ঞেস করে, 'এ কোথাকার লৌকা গো মাঝির পো?'

'এ মনসাতলার লগেন জানার লৌকা।'

একপাশে কতকগুলো নৌকো নোঙর করা। এগুলো আজ যাবে না। হাটবাজার শেষ করে আগামীকাল জোয়ারের মুখে

ছাড়বে। একদিন দুদিনের পথ। হাসতে হাসতে একজনকে শুধোয়, 'তুমানে কাই যাব গো মাঝির পো ?'

'বুড়াবুড়ির তট।' বুড়ো মাঝি উত্তর দেয়।

কিছু পাখি নদীর পারে ঘোরাঘুরি করছে। কুকুরের চিৎকার। জলের ওপর ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ভাসতে ভাসতে বকের মতন সাদা কতকগুলো পাখি দোলা খাচ্ছে। অনেক ভেতরে চলে যায় ওরা। আবার উড়ে আসে। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি, 'ওগুলো কি পাখি ?'

সুদর্শন খাটুয়া হাসল, 'এগুলাই তো গাঙ চিল।'

গাঙচিল আমি এই প্রথম দেখলাম। কী সুন্দর !

আমরা নৌকোর কাছাকাছি চলে এসেছি। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। গাঙচিল, এই মেঘলা আকাশ, নদী নৌকো লোকজন দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। হঠাৎ কাদার মধ্যে ফস করে পা-টা আটকে গেছে। পা তুলতে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। সুদর্শনবাবু আমার হাত ধরে ফেলেছে। পা-টা কাদার ভেতর থেকে টেনে আনতে আমাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। আমার এই অসহায় অবস্থা দেখে নৌকোর ওপর থেকে কেউ কেউ হেসে উঠেছে। কে একজন ধমক দিল, 'এই, হাসছ কেনি ?' সকলের দৃষ্টি আমার ওপর। আমার চোখ-মুখ লজ্জায় আরো যেন কুঁকড়ে এল। একটা অপ্রস্তুত ভাব। কে যেন বলল, 'এঠিকরার লোক না, বাবু লতুন।'

আমি উঠে এলাম। নৌকোর কাছাকাছি এসে কাঠের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাদা ধুয়ে নিলাম। ভাল করে ধোয়া হল না। তা হোক। আমি নৌকোয় উঠে গিয়ে মাঝামাঝি একটা জায়গায় বসলাম। সুদর্শনবাবুও আমার পাশে বসল। সবাই আমাকে কৌতূহলের চোখে দেখছে। কেউ কেউ বিড়ি টানছে। চটকা বাতাস। ভাঁটা শুরু হয়ে গেছে। জল অনেক কমে এসেছে। আর দেরি

করলে নাকি নৌকো চড়ায় আটকে যাবে। লোকে ঠাসাঠাসি, তখনও লোক উঠছে।

'তুমানে একটু সইর‍্যা সইর‍্যা বইসঠে গো।'

'আর সইর‍্যা কাই যাব ?'

'আমরা কি যাব নি ?'

'হ্যাঁ, তুমানকে ঝগড়া করঠে কেনি ? চুপ কইর‍্যা বইসঠে।'

একজন বলল, 'কি গো মাঝির পো, লৌকা ছাড় !'

মাঝি হাল ধরেছে। নোঙর তুলে নিয়েছে। লগি ঠেলে ঠেলে দাঁড়ী ছোট খাল থেকে নৌকোটা বের করে আনছে। আমাদের গায়ে মুখে এসে তখন বাদলা বাতাস জোরে জোরে কামড় দিচ্ছে : নৌকোটা ছোট খাল থেকে এসে বড় খালে পড়ল।

আমি চুপ করে আছি দেখে সুদর্শনবাবু বলল, 'ওপাশে ওই যে জায়গাটা দেখছেন, ওটা আসলে চড়া। বড় জোয়ারের সময় ডুবে যায়।'

নদী সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। আমি প্রথমটায় এটাকেই নদী মনে করেছি। এবং আমার ধারণা ছিল, এটুকু পেরোলেই আমরা ওপারে পৌছে যাব।

চড়ার গা ঘেঁষে নৌকোটা যাচ্ছিল। ভেতরে জঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু পাখি উড়ে গেল। আমি চুপচাপ সব দেখছি। এদের কথাবার্তাও শুনছি। সব বুঝতে পারছি না। জমিজমা, মামলা, চাষবাসের সমস্যা, স্কুল, রাজনীতি সবই ছিল আলোচনার বিষয়।

একজন বুড়ো গোছের লোক আমাকে বার বার দেখছিল। আমার মনে হল, বোধহয় আলাপ করতে চায়। আমি আর কি বলব। চুপ করে আছি। লোকটি বিড়ি টানতে টানতে এক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবু কাই যাব ?'

আমি সুদর্শনবাবুর দিকে তাকালাম। আমার হয়ে সুদর্শন খাটুয়া জবাব দিল, 'বামনখালি, আমাদের নতুন মাস্টামশায়।'

'দেশ থাইল কাই ?'

'বাবু কলকাতার লোক।'

বুড়ো চুপ করে গেল। আমাকে অবাক চোখে দেখতে লাগল। আরো অনেকেই আমাকে কিরকম এক সন্দিগ্ধ, অবাক দৃষ্টিতে দেখছিল। আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু উপায় নেই। নৌকো ধীরে ধীরে চলছে। রূপোলি মাছের ঝাঁক লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতন দৃশ্য। নৌকোটা চড়ার গা ধরে ধরে অনেকটা যাওয়ার পর আসল নদীতে পড়ল। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। জলের ভীষণ শব্দ। এতক্ষণে বোঝা গেল। যেদিকে তাকানো যায় শুধু জল আর জল। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। ওপার দেখা যায় না। নদীর বুকে অনেক নৌকো। তীরের মতন ছুটে যাচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নৌকো নাচছে। দেখে মনে হচ্ছিল, কোনটা ডুবে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়ার উপক্রম। আমার এবার ভীষণ ভয় করছিল। নৌকোডুবি হলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুদর্শনবাবু আমার দিকে চেয়ে বোধহয় আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে। সাহস দেওয়ার জন্যে বললে, 'ভয়ের কিছু নেই মাস্টামশায়, দেখবেন মিনিট কুড়ির মধ্যে পৌঁছে গেছি আমরা।'

আমার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোল না। মনে হচ্ছিল, আমি আর কখনোই আমার নিজের লোকের কাছে ফিরে যেতে পারব না। আমার চোখ যেন কেমন ঝিম ঝিম করছে। মাথা ঘুরছে। আমি চোখ বুজলাম। খানিকক্ষণ পর আবার তাকালাম। এখানে বাতাসের মাতামাতি যেন অনেক বেশী। এলোমেলো।

আরো অনেকখানি পথ টেনে টেনে নিয়ে যাওয়ার পর নৌকোয় পাল খাটানো হল। হঠাৎ যেন আমাদের নৌকোর গতি বেড়ে গেল। এবার জোরে ছুটছে। নৌকোর একটা ধার অনেকটা উঁচুতে উঠে গেল। আরেকটা ধার জলের সামান্য মাত্র উঁচুতে। একটু

জোরে বাতাস এলেই যেন উল্টে যাবে। মাঝে মাঝে নৌকোয় চটকা বাতাস এসে পালটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। পালের দড়ি ধরে আছে একজন। বাতাস এলেই দড়িটা ঢিলে করে দিচ্ছে।

আমার মুখে কোন কথা নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে আমাদের ভয় আরো বেড়ে গেল। মাঝি ঘন ঘন আকাশের দিকে চোখ রাখছে। আমার মনে হল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশটা ভেঙে পড়বে। ওদের চোখে চোখে যেন কিসের ইশারা হল। ওরাও যেন অল্প ভয় পেয়েছে।

নৌকো তীরের গতিতে ছুটছে। এবার পার দেখা যাচ্ছে। মাটির উঁচু বাঁধ। কয়েকটা দোকান-টোকান চোখে পড়ছে। অনেকগুলো নৌকা নদীর খাঁড়িতে নোঙর করা। হু হু করে ঝড়ো বাতাস ছুটে যাচ্ছে।

বড় বড় ফোঁটায় এবার বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে এল। নদীর বুকে বৃষ্টির নতুন এক চেহারা দেখলাম। মনের মধ্যে গেঁথে রাখার মতন ছবি।

কেউ কেউ ছাতা খুলতে গেল। একজন দাঁড়ী ধমকে উঠল, 'তুমান্নে কেউ ছাতা ফুটাব নি।'

খানিকক্ষণ পর নৌকো তীরে এল। সবাই আমরা তখন ভিজে একাকার। একে একে সবাই নামল। আবার সেই কাদা। আমি অনেক কষ্টে ওপরে উঠে এলাম। তখনো সমানে বৃষ্টি। বাতাস যেন আরো দুরন্ত। জামা-কাপড় ভিজে জব-জব করছে। বাতাস এসে তখন গায়ে কামড়ে ধরেছে। এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক গ্লাস চা খেয়ে নিলাম।

সুদর্শনবাবু বলল, 'ভিজে গেছি, চলুন চলে যাই।' এরমধ্যে কার কাছ থেকে একটা ছাতা জোগাড় করে নিয়েছে সুদর্শনবাবু।

এখনো পথের শেষ হল না। এরপরও আড়াই মাইল পথ। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘ গর্জন করছে। দুপাশে ধানের ক্ষেত। মাঠের বুক থেকে ঠাণ্ডা

বাতাস হু হু করে ছুটে আসছে। ক্ষেতের কাজ এখনো শেষ হয় নি। সবে শুরু। আমার আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। ভাল লাগছে না। আমার পাশ দিয়ে ক'জন লোক দ্রুত হেঁটে চলে গেল।

সুদর্শনবাবু বলল, 'এসব রাস্তা আর ক'বছরের মধ্যেই পাকা হয়ে যাচ্ছে।'

আমি ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আমার শীত করছিল।

সুদর্শনবাবু আবার বিড়ি ধরিয়ে নিয়েছে। আমরা চুপচাপ হাঁটছিলাম। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। হাঁটছি তো হাঁটছি।

সুদর্শনবাবু বিড়ি টানতে টানতে বলল, 'এ জায়গার নাম জানেন তো?'

'না।' আমি বোকা-বোকা চোখে একবার ওর দিকে তাকালাম।

'এই হল সাগরদ্বীপ।'

'এখানেই তাহলে গঙ্গাসাগরের মেলা হয়?' আমার গলায় চাপা এক বিস্ময়।

'হ্যাঁ, এই দ্বীপেরই একেবারে দক্ষিণে কপিল মুনির আশ্রম। সামনেই বঙ্গোপসাগর। মেলাটা ওখানেই হয়।'

'এটা তাহলে সত্যি সত্যিই একটা দ্বীপ? ভূগোলে যাকে বলে চারদিকে জলবেষ্টিত ভূখণ্ডের নাম দ্বীপ, সেই দ্বীপ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই দ্বীপ।'

আমার কেমন অবাক লাগছে। এর চেয়েও বড় কথা, আমি না জেনেই বহু মানুষের বাঞ্ছিত এক পুণ্যতীর্থে এসে পড়েছি। বুকের ভেতরে কিরকম যেন এক শিহরন খেলে গেল।

'তাই বলে দ্বীপটা একেবারে ছোট নয়। আশি বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা সত্তর হাজার।' সুদর্শনবাবুর মুখে গর্বের হাসি।

'বলেন কি?'

'হ্যাঁ, এখানে তিন তিনটে হায়ার-সেকেণ্ডারী স্কুল। জুনিয়ার স্কুল অনেকগুলো। প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যাও অনেক!'

আবার চুপচাপ।

সুদর্শনবাবু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। খানিকক্ষণ পর ফের বলল, 'এসব জায়গা একসময় গভীর জঙ্গল ছিল, বুঝলেন মাস্টামশায়। ভয়ঙ্কর সব জন্তু-জানোয়ার এখানে দিনরাত ঘোরাঘুরি করত। যাকে বলে সুন্দরবন। সে এক মজার ইতিহাস। পরে আস্তে আস্তে সবই শুনবেন।' একটু সময় চুপ করে থেকে আবার বলল, 'ওই যে বড় বড় মাটির ঢিপি দেখছেন, ওখানে আসলে পুকুর।'

'পুকুর?'

'হ্যাঁ মাস্টামশায়, পুকুর। পাড়গুলো খুব উঁচু করা হত। কেন বলুন তো?'

আমি চুপ করে থাকলাম। ছেলেবেলা থেকে সহরে মানুষ। এসব সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই। কি বলতে কি বলে ফেলব! আমার বেফাঁস কথা শুনে হয়ত ওরা হাসাহাসি করবে। তার চেয়ে কোন কথা না বলাই ভাল। আমি সুদর্শনবাবুর চোখে চোখে তাকালাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুদর্শনবাবু নিজেই উত্তর দিল, 'পাছে বান-টান এলে নোনা জল ঢুকে যায় সেই ভয়ে। জানেন মাস্টামশায়, এক সময় এখানে বড় বড় মাটির জালা করে নৌকোয় দেশ থেকে মিঠে জল আসত।'

আমরা কথা বলতে বলতে প্রায় এসে গেলাম। দূরে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। মাঠে প্রান্তরে তখন আরো ঘন হয়ে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারের গায়ে গায়ে জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। তখনো খানিকটা পথ বাকি। পথ না ফুরোতেই ভাঙা একটা প্রাইমারী স্কুলের কাছাকাছি হঠাৎ করে বিকেল শেষ হয়ে গেল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল।

বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু বাতাসের দাপট দিল। লোকজন আমাকে গভীর আগ্রহে দেখছিল। আমার কোনদিকে নজর ছিল না।

কখন জায়গা মতন পৌঁছে ভিজে জামা-কাপড় ছাড়ব সেই চিন্তা। আমার শীত করছিল।

সুদর্শবাবু বলল, 'এই হল গিয়ে আপনার স্কুল।' বলতে বলতে এগিয়ে গেল।

আমিও পেছনে পেছনে যাচ্ছি।

মাটির দোতলা ঘর। সুদর্শনবাবু পণ্ডিতমশায়ের নাম ধরে ডাকল। ওপরে ছেলেরা পড়ছে।

পণ্ডিতমশায় বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যেই একটা চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি উঠে এলেন।

সুদর্শনবাবু আমাকে দেখিয়ে বলল, 'মাস্টামশায় পাঠিচে গুণধরদাও একটা চিঠি দিয়া কইয়া দিচে কাল নু কাজে লাগবে।'

'আসুন আসুন।' ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পণ্ডিতমশায়। খালি গা। দীর্ঘ চেহারা।

'আমি আর দাঁড়াব না।' সুদর্শনবাবু আমার দিকে তাকাল। হাসি হাসি মুখে বলল, 'পরে আবার দেখা হবে। জামা-কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করুন।' বলে চলে গেল সুদর্শনবাবু।

ওপর থেকে তাড়াতাড়ি করে একটি ছেলে হ্যারিকেন নিয়ে এল। এসেই ঢিপ করে প্রণাম করল। খবর পেয়ে অন্যরাও নেমে এল। তারপর একের পর এক প্রণাম।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'এই হল হোস্টেল। নিচে এসব ঘরে পড়ানো হয়। আপনি আগে ভেজা কাপড়-জামা ছেড়ে ফেলুন।'

আমি জামা-কাপড় ছাড়লাম। আমার তখনো শীত করছিল। ছেলেরাই জল এনে দিল। যত্নের কোন ত্রুটি নেই। এরই মধ্যে মনে হল, মাটি শুকিয়ে উঠেছে। বাতাসের জোর খানিকটা কমে গেছে। গা-হাত-পা ধোয়ার পর আমার যেন ক্লান্তি আরো বেড়েছে। আকাশের মেঘ কেটে যাচ্ছে। তারা ফুটতে শুরু করেছে। খানিকক্ষণ আগেই

কী ঘন দুর্যোগ। আর এখনই অন্য চেহারা! আকাশেরও কিরকম ভেল্কিবাজী, খেয়ালী মেজাজ!

আমার সব উৎসাহ যেন দমে গেল। এই মাটির ঘরে আমাকে পড়াতে হবে? আমার বুকের ভেতরটায় কিরকম এক কষ্ট হচ্ছিল, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছিল। আমার মন বলছিল, না না এখানে আমার বেশীদিন থাকা চলবে না। চলবে না। এ আমি কোথায় এলাম! মার মুখটা আবার আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে। বুকের ভেতরটা আমার ভারী হয়ে উঠেছে। আমার কান্না পাচ্ছে। ভীষণ কান্না। দূরে মাঠের দিক থেকে তখন একটা পাখি হট্টি-টি-টি করতে করতে উড়ে গেল। ওটাও কি আমারই মতন নিঃসঙ্গ, স্বজন নির্বাসিত!

তিন

পণ্ডিতমশায় আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। সকাল হয়েছে। তখনো আমার চোখে গাঢ় ঘুম। ভাঙতেই চায় না। তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ জড়িয়ে জড়িয়ে আসে। আমি আবার শুয়ে পড়েছি। কাল শরীরের ওপর দিয়ে কি ধকলটাই না গেছে। ভাবলে এখনো আমার ভয় হয়। গতকাল পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টেরও পাই নি। তারপর ঘুম-ঘুম চোখে কখন খেতে গেছি, খেয়ে-টেয়ে আবার ওপরে উঠে এসেছি, শুয়েছি, আমার কিছু মনে নেই। আমি যেন এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম।

পণ্ডিতমশায় আবার আমাকে ডাকলেন, 'এবার উঠে পড়ুন, এখন কিন্তু মর্নিং স্কুল। ছেলেরা আসতে শুরু করেছে।'

জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছে। শোঁ শোঁ শব্দ। আবার ঝড়-টড় আসছে নাকি! আমি উঠে পড়লাম। কোথায় ঝড়, ঝকঝকে সকাল। এখানে নাকি এরকমই বাতাস বয়ে যায় সর্বক্ষণ। আকাশ ধোওয়া-মোছা।

আমি তাড়াতাড়ি করে মুখ-চোখটা ধুয়ে নিলাম। এখন যে একবার চা খেতে হয়! পণ্ডিতমশায় একজনকে হাঁক দিলেন। ছেলেটি এগিয়ে এল। এই ছেলেটিই কাল অনেকক্ষণ আমার কাছে কাছে ছিল। জল এনে দিয়েছে। চা-বিস্কুট এনেছে। এজন্যে কোনরকম অসন্তোষ নেই ওর। বেশ হাসি-খুশি। খুবই অনুগত, ভদ্র। ও চা আনতে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা বিস্কুট নিয়ে ফিরে এল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'কি, আমার ওপর রাগ হচ্ছে না তো?'

ছেলেটি সলাজ হাসি হেসে বলল, 'না স্যার, রাগ হবে কেন।'

'তোমার নামটা যেন কি?'

'অনিল পড়ুয়া।' বিনীত, নম্র ভঙ্গি।

'কোন্ ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস নাইন-এ।'

পণ্ডিতমশায় হঠাৎ হেসে উঠলেন। কি যেন মনে পড়েছে তাঁর! হাসতে হাসতে বললেন, 'নাইন-এ পড়লে হবে কি, টকার ঘরে বউ আছে।'

'টকা?' আমার চোখে বিস্ময়।

'আপনারা যাকে ছেলে বলেন, এখানে গাঁওয়ালি ভাষায় টকা।'

আমি অবাক। বলে কি, এইটুকু ছেলে, তার আবার বিয়ে!

অনিল লজ্জায় আর এখানে দাঁড়াল না। এক দৌড়ে চলে গেল।

পণ্ডিতমশায় তখনও হাসছেন। বললেন, 'এখানে অনেক শ্রীমানই চতুষ্পদী।'

আমি ওঁর রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠেছি। চতুষ্পদীই বটে!

চা খাওয়া শেষ করে আমি তাড়াতাড়ি করে জামা-কাপড়টা পরে নিলাম। একটা ঘণ্টা পড়ে গেছে। ছেলেমেয়ের চিৎকার কানে আসছে।

পণ্ডিতমশায় আমাকে নিয়ে নিচে নামলেন। ছেলেমেয়েরা উঁকি ঝুঁকি মারছে। ইতিমধ্যেই রটে গেছে কলকাতা থেকে নতুন মাস্টার-মশায় এসেছেন। সুতরাং কৌতূহলের আর শেষ নেই। আমি লাজুক মুখে হেঁটে এলাম। এক পাশে হেড-মাস্টামশায়ের ঘর। তারপরই স্টাফ-রুম। এরপরই ক্লাস ঘর। মাটির দেওয়াল। ওপরে শনের ছাউনি। পণ্ডিতমশায় আমাকে হেড-মাস্টামশায়ের ঘরে নিয়ে এলেন। ওখানে একজন বসে কি সব কাগজপত্তর দেখছেন। পণ্ডিত-

মশায় বললেন, 'ইনি এখানকার অ্যাসিট্যাণ্ট হেড-মাস্টার, ধীরেন দাস।' বলেই সেক্রেটারীর চিঠিটা ওঁর হাতে দিলেন।

ধীরেনবাবু আমাকে বসতে বলে চিঠিটা পড়ে ফেললেন। পরে হেসে বললেন, 'ভালই হয়েছে! এখানে লোকের বড় অভাব।'

ধীরেনবাবুর বয়েস অনেক কম। গাট্টা-গোট্টা চেহারা। পণ্ডিত-মশায়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি ওঁকে স্টাফ-রুমে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।' পরে আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে আবার তিনি বললেন, 'আপনিও ওদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করুন।'

পণ্ডিতমশায় আমাকে স্টাফ-রুমে নিয়ে এলেন। সবাই অবাক। আমার ওপর সকলের দৃষ্টি। কেউ কেউ দেখলাম মুখ টিপে হাসছে।

'বসুন।'

একজন আমাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। সামনে বড় একটা টেবিল। কিছু চেয়ার, বড় একটা বেঞ্চ। তিনটে আলমারী। তাতে কিছু বই। একটায় বিজ্ঞানের কিছু যন্ত্রপাতি। একপাশে একটা ম্যাপ-স্ট্যাণ্ড। আমি এক পলক দেখে নিলাম।

পণ্ডিতমশায় পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি অনাদি কুইলা, বিমল মাইতি, কার্তিক মিধ্যা, কালিপদ পাহাড়ী, বিষ্ণুব্রত পুরকাইত, আশুতোষ দিন্দা, এঁরা সব এখানকার লোক। আর উনি হলেন নির্মল ঘোষ। আপনাদের ওদিকের লোক।'

'ভুল বললেন পণ্ডিতমশায়, উনিও এখন এখানকারই লোক। এ-দেশের জামাই।' বলে কার্তিকবাবু হেসে ফেললেন।

'তা বটে।'

আমি দেখলাম নির্মলবাবুর মুখে সামান্য ম্লান হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

আশুতোষ দিন্দা বললেন, 'আপনার নিজের নামটাই তো বললেন না।'

পণ্ডিতমশায় রগুড়ে গলায় হাত জোড় করে হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ, অধমের নাম শ্রীগুণাকর গিরি।'

পণ্ডিতমশায়ের বলার ভঙ্গি দেখে সকলেই হো হো করে হাসল। আমিও না হেসে পারলাম না।

অনাদিবাবু বললেন, 'আবার কিন্তু একটা ভুল করলে পণ্ডিত।'

'কি?' পণ্ডিতমশায় ঠিক যেন বুঝতে পারলেন না।

'ওঁর নামটা অখনো পর্যন্ত আমাদের জানি নি।'

পণ্ডিতমশায় কিছু বলার আগেই আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, 'আমার নাম অরুণাংশু মিত্র।'

'আপনি কি সোজা কলকাতা থেকেই আসছেন?' বিষ্ণুব্রতবাবুর প্রশ্ন।

'হ্যাঁ।'

বিমলবাবু বললেন, 'কাল ওই ঝড় জলের মধ্যে এলেন? আপনার সাহস আছে বলতে হবে।' বলতে বলতে কালিপদবাবুর চোখে চোখে চেয়ে মুচকি হাসলেন। ওঁদের মধ্যে ইঙ্গিতে কি যেন কথা হলো।

কথাটার মধ্যে যেন সামান্য খোঁচা ছিল। কার্তিকবাবু দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'এতে সাহসের কি হল, এত লোক আসতে পারল, আর ওঁর না আসার কি আছে!'

'কিছু নেই, তবে সহরের লোকের ভয়টা আবার বেশী তো!' বিমলবাবু টেনে টেনে বললেন। হাসলেন খিক খিক করে। হাসিটা শুকনো। কৃত্রিম।

কার্তিকবাবু সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ঠাট্টার সুরে বললেন, 'আপনি দেখছি লোক সম্পর্কে এক্সপার্ট!'

'আহা, এতে এত কথা কাটাকাটির কি আছে।' আশুতোষবাবু যেন সামান্য বিরক্ত হলেন।

বিমলবাবু গুম হয়ে গেলেন।

অনাদিবাবু বিনয়ের গলায় শুধোন, 'স্যার, আপনার সাবজেক্ট ?'

'বাংলা।'

আমার কথা শুনে খুব একটা উৎসাহিত হল না কেউ। সামান্য মিহি মিহি গলায় আশুতোষবাবু বললেন, 'বাংলা আজকাল খুব কঠিন হয়েছে।'

কালিপদবাবু বললেন, 'আমাদের এখানে তো আগে ইংরেজীর লোকের খুব দরকার।'

'দরকার সবটারই।' বলে কার্তিকবাবু সিগারেটে টান দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখবেন, আমাদের আবার ছেড়ে যাবেন না।'

এতক্ষণ একজন কোন কথা বলেন নি। চুপচাপ সিগারেট টানছেন। কখনো অল্প একটু হাসছেন, কখনো মুখ গম্ভীর। আবার কোন কোন কথায় উৎসাহ বোধ করেছেন। সব কথা নীরবে শুনে গেছেন। তিনি নির্মলবাবু। ফাঁকে ফাঁকে তিনি আমাকে দেখছিলেন। আমিও। সিগারেটটা ছোট হয়ে এসেছে। আরো কয়েকটা টান দিয়ে টুকরোটা তিনি পা দিয়ে ঘষে ঘষে নিবিয়ে দিলেন। এবার আমার মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'কলকাতার কোন জায়গায় থাকেন ?'

'শ্যামবাজার।'

'আমিও তো গ্রে-স্ট্রীটে থাকতাম!'

'ওখানে এখন আপনার কেউ থাকে না ?'

'হ্যাঁ, পিসীমা পিসেমশায়রা থাকেন!'

আমি একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করি, 'এখানে আপনি কতদিন ?'

'তা প্রায় বছর তিন, সাড়ে তিন হয়ে গেল।'

'এর মধ্যে আর যান নি কলকাতা ?'

'গিয়েছি, দুবার গিয়েছি।' বলতে বলতে ওঁর একটা দীর্ঘশ্বাস

বেরিয়ে এল। মুখের ওপর যেন পাতলা মলিন এক ছায়া নেমে এসেছে।

আমি চুপ করে থাকি। এখনই এত কৌতূহল দেখানো ভাল নয়। আমিও একটু অবাক হয়েছি। কলকাতার গ্রে-স্ট্রীটের ছেলে, এতদূরে কি করে শ্বশুরবাড়ি হল! নিশ্চয়ই কিছু একটা মজার ব্যাপার আছে।

নির্মলবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনাকে পরে একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি শোনাব।'

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ে গেছে। এক এক করে যে যার নির্দিষ্ট ক্লাসে চলে গেলেন।

ধীরেনবাবু আস্তে আস্তে এ ঘরে এলেন। আমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে একটা চেয়ার টেনে নিলেন। টেবিলের ওপর থেকে অ্যাটেনডেন্স খাতাটা চেয়ে নিলেন। যাঁরা আসেন নি সেখানে লাল কালির দাগ মারলেন।

খাতাটা দেখতে দেখতে ধীরেনবাবুর মুখ গম্ভীর হল! মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি ভেতরে ক্ষুব্ধ, সামান্য উত্তেজিত। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন। পকেট থেকে কালো কালির পেনটা টেনে নিলেন। মুখে হাসি টেনে বললেন, 'আপনার নামটা বলুন, এই খাতায় তুলে দিই।'

'অরুণাংশু মিত্র।'

ধীরেনবাবু নামটা লিখে আমার দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন।

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'বি. এ. অনার্স।'

এমন সময় একটি ছেলে এসে দোর গোড়ায় দাঁড়াল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'স্যার!'

'কি রে?'

'আমানুকের ক্লাস ফাঁকা যাচ্ছে।'

ধীরেনবাবু এবার রীতিমতন ক্ষেপে উঠলেন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে

বললেন, 'যাবেই তো ফাঁকা। আমি কি করব, উনি দুদিন আসবেন তো চারদিন আসবেন না। এমন ভাগ্য আর কজনের হয়!' ছেলেটি চলে গেল।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ধীরেনবাবু আমার দিকে তাকালেন। চোখে-মুখে একরাশ বিরক্তি। একটু ঝাঁজের গলায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে তো এখনো আসল লোকেরই মোলাকাত হয় নি!'

'কি রকম?' আমিও ওঁর মুখের দিকে চাপা এক কৌতূহল নিয়ে তাকালাম।

'কেষ্ট ঠাকুর, যে সে কেষ্ট নয় বাবা, একেবারে কলির কেষ্ট।' গলায় ঠাট্টা।

আমি চুপ করে থাকি। এছাড়া আমার আর উপায় কি!

ধীরেনবাবু এবার যেন আরো রেগে গেলেন, 'বুঝলেন, এই লোকটি ঠিক মতন আসবে না। এলেও ক্লাসে যেতে চাইবে না। এই নিয়ে কিছু বলতে যান, আবার পাঁচ রকম কথা শুনতে হবে। কমিটির লোকগুলোও হয়েছে চোরের সাক্ষী মাতাল। কেষ্টবাবুর সম্পর্কে সাতখুন মাপ। এবার এই নিয়ে কমিটি-মিটিং-এ ফাটাফাটি। এসেছেন যখন, আস্তে আস্তে তখন সবই শুনবেন। লোকটি পয়লা নম্বরের ঘুঘু।'

কেষ্টবাবুকে এখনও আমি চোখে দেখি নি। আলাপ হয় নি। আমার প্রতি তাঁর কি রকম ব্যবহার হবে, এখনও আমি কিছুই জানি না। তবে তিনি যে একজন আলাদা কিছু, এটা ধীরেনবাবুর কথা থেকে আঁচ করে নিয়েছি। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক যে বেশ তিক্ত, তাও বোঝা যায়। এসব ক্ষেত্রে নীরব থাকাই বিধেয়, শোভন। এখানকার আবহাওয়া এখনও আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ধীরেনবাবু আমাকে বললেন, 'আজকের তারিখ দিয়ে ওখানটায় একটা সই করবেন।'

'এখুনি করে দিচ্ছি।' আমি সই করে খাতাটা আবার সরিয়ে রাখলাম।

ধীরেনবাবু আমার চোখে চোখে চেয়ে শুধোলেন, 'আজ কি কোন একটা ক্লাসে যাবেন ?'

'আমার কোন আপত্তি নেই।'

'এর পরেই ক্লাস টেনে বাংলার একটা ক্লাস আছে। ওদের অনেকদিন বাংলা হচ্ছে না।' কথা বলতে বলতে ধীরেনবাবু কি যেন ভাবছিলেন। পরক্ষণেই আমার চোখের দিকে চেয়ে একটু হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি।'

আমিও ওঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি।

ধীরেনবাবু বললেন, 'বি. এ-তে আপনার কমবিনেশন-পেপার কি ছিল ?'

'ফিলজফি।'

আমার কথা শুনে ধীরেনবাবু যেন উল্লসিত হলেন। খুশি-খুশি গলায় বললেন, 'বাঁচিয়েছেন মশায়। এবার থেকে লজিকটা আপনিই পড়াবেন। ও কি আর বই দেখে দেখে পড়ানো যায়! ভীষণ অসুবিধে হয়।'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, বিষয়টা আগে থাকতে জানা না থাকলে একটু অসুবিধে হয়।'

'কি বলব আপনাকে, এ পর্যন্ত ফিলজফির একজন লোকও পাওয়া গেল না। যা-ও একজন এসেছিল, একদিন থেকেই কেটে পড়ল। এসে এখানে কেউই থাকতে চায় না।'

আমি সামান্য ভয়ের গলায় বললাম, 'নদীটার জন্যেই আরো ভয়। বাপ রে বাপ, কি বিশাল নদী; দেখে আমারও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এপার ওপার দেখা যায় না। ভাবলেই বুকের ভেতরটা

কেমন ধড়াস ধড়াস করে।' আমার চোখে-মুখে যেন সেই ভয়টা আবার তির তির করছে। গলাটা শুকিয়ে এল।

'আমাদের ওসব কিছুই হয় না।' ধীরেনবাবুর গলা নির্বিকার।

'আচ্ছা, নদীটার নাম কি?'

'বড়তলা নদী। আসলে এটা মোহনা। আর কিছু দূরেই তো সাগর।'

আমি একটা ঢোক গিলে বললাম, 'মোহনারই যে চেহারা! আমার এখানে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ডুবে গেলাম।'

'না না, অত সহজে নৌকোডুবি হয় না।' ধীরেনবাবু হাসলেন। হাসতে হাসতে ফের বললেন, 'আমি তো এখানকারই ছেলে, আজ পর্যন্ত শুনি নি কোন নৌকো ডুবি হয়েছে, লোক মরেছে। সেরকম বুঝলে, খেয়া-ই বন্ধ করে দেবে।'

'যাই বলুন, এরকম একটা নদী পেরোতে হবে শুনলেই বুকে জল থাকে না!'

ধীরেনবাবু হাসলেন। বললেন, 'এসব তো ভাল কথা মনে হচ্ছে না!'

'না না, আমি এখুনি পালাচ্ছি না, গেলে আমি বলে কয়েই যাব।'

ধীরেনবাবু আমায় সাহস দেওয়ার জন্যে হালকা গলায় বললেন, 'নতুন বলে এখন এরকম মনে হচ্ছে! কদিন গেলেই দেখবেন এসব ভয়-টয় কোথায় চলে গেছে। আরে, নদীমাতৃক বাংলাদেশ! নদীনালা খাল বিল খাঁড়ি তো এখানে থাকবেই। আর আমরা হচ্ছি বাংলা মায়ের দামাল ছেলে, আমাদের ভয় করলে চলে! আপনিই তো মশায় পড়াবেন: বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা বাঁচিয়া আছি।' ধীরেনবাবু কথা শেষ করে হাসতে থাকেন।

আমিও হেসে গড়াগড়ি। এ একটা কথার মতন কথা বটে! আমরাও ছেলেবেলায় কবিতাটা পড়েছি। এখন ভাবলে হাসি পায়।

ঘণ্টা পড়ল। মাস্টামশায়রা ফিরে এলেন। আবার হয়ত

কাউকে কাউকে এক্ষুনি ক্লাসে যেতে হবে।' কেউ কেউ সিগারেট, বিড়ি ধরিয়ে নিলেন।

ধীরেনবাবু আমাকে নিয়ে একটা ক্লাসের দিকে চললেন। ছেলেমেয়েগুলো আমাকে জুলজুল চোখে দেখছে। আজ সবার চোখ যেন আমার ওপর। আমি পেছনে! কয়েকটা ক্লাস থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে হাসি হাসি মুখে ডাকছে, 'আমাদের ক্লাসে আসুন স্যার।'

আমি স্মিতমুখে বলেছি. 'আসব, সব ক্লাসেই আসব।'

ক্লাস টেন-এর ঘরটা একেবারে কোণায়। চারটে জানালা। হু হু করে বাতাস আসছে। ঘরের ডান দিকে একটু জঙ্গলের মতন।

ধীরেনবাবু প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

আমার ডানপাশে দুটো বেঞ্চে গোটা চারেক মেয়ে। আর সামনে জনা কুড়ি ছেলে। কারো পরনে খাটো ধুতি, লুঙ্গি। কেউ বা পাজামা হাফপ্যান্ট পরেছে। মেয়েদের সবারই পরনে শাড়ি। খালি পা। নাম ডেকে খাতাটা টেবিলের ওপর রেখে গোটা ক্লাসটা একবার দেখে নিলাম। সবাই চুপ করে আমাকে দেখছে। বেছে বেছে আমি কয়েকজনের নাম জেনে নিলাম। সিরাজুল, সাহেবুল, সুনীল, মিলন রিজিয়া রঞ্জাবতী।

হঠাৎ একটি ছেলে উঠে এল। আমার পায়ে হাত রেখে প্রণাম করল। একে একে সবাই এসে আমাকে প্রণাম করে আবার জায়গা মতন গিয়ে বসল।

আমি বই নিয়ে সবে পড়াতে শুরু করেছি।

হঠাৎ সাহেবুল চেঁচিয়ে উঠল, 'স্যার, সরে যান, সাপ।'

'সাপ!' আমি একলাফে টেবিলের ওপর উঠে বসলাম। আমার মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে। বুকটা ধক ধক করে দ্রুত লাফাচ্ছে। ভীষণ ভয় পেয়েছি।

ছেলেমেয়েদের মধ্যেও হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কেউ কেউ ঘর

থেকে বেরিয়ে গেল। 'সাপ, সাপ' চিৎকারে অন্য ক্লাস থেকেও মাস্টামশায়রা ছুটে এলেন।

সাপটাও এত হইচই শুনে কেমন হকচকিয়ে গেছে। মনে হল, ওটাও ভয় পেয়েছে। কিন্তু যেতে পারছে না।

কেউ কেউ অভিজ্ঞ গলায় বলল, 'হুঁ, বিষধর সাপ।'

অনাদিবাবু আমাকে ডাকলেন, 'আপনি বেরিয়ে আসুন স্যার, বেরিয়ে আসুন।'

আমি বেরিয়ে এলাম ভয়ে ভয়ে। ক্লাসের মধ্যে সাপ! শুনে রক্ত জমে যাবার জোগাড়। আমার তখনো ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। শরীর-টরীর কেমন অবশ অবশ।

কালিপদবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি সাপ?'

'বোড়া।'

অনাদিবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আচ্ছা, সাপটা এখানে এল কি করে!' যেন এতে তিনি ভীষণ অবাক হয়েছেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'সে গবেষণা পরে হবে, আগে এটাকে খতম করুন তো!'

'কেন, এটা তো কারও ক্ষতি করে নি?'

'ক্ষতি করুক বা না করুক, আগে মেরে ফেলা দরকার।'

অনাদিবাবু হাসলেন। চোখ পিট পিট করে বললেন, 'আহা, ভগবানের জীবটাকে শেষে মেরে ফেলবে?'

'খুব যেন কষ্ট হচ্ছে আপনার?' কার্তিকবাবু ঠাট্টা করলেন।

'তা একটু হচ্ছে।' মুখে সেই অমায়িক হাসি।

ওঁর কথাগুলো আমার কাছে যেন কিরকম লাগছে। সত্যিই কি এগুলো ওঁর মনের কথা? না, এর গভীরে অন্য কোনরকম ঠাট্টা আছে! আমি ভয়ে ভয়ে তখনো চারদিকে তাকাচ্ছি। আবার কোন দিক থেকে সাপ বেরোবে, কে জানে।

'দেখছেন, দেখছেন, বেচারা কিরকম ভয় পেয়েছে!'

ধীরেনবাবু বললেন, 'ওকে দেখে হঠাৎ আপনার এত দয়া উথলে উঠল, ব্যাপারটা কি।'

'ব্যাপার কিছুই নয় মাস্টামশায়। আমি বলছিলাম, নিরীহ জীবটাকে শুধু শুধু মেরে লাভ কি!'

'নিরীহ, কি বলছেন, বোড়া সাপ নিরীহ!'

'তাছাড়া কি, ও তো ফনাও তুলতে পারে না, দৌড়তেও পারে না।'

'তাতে কি, মুখে বিষ আছে তো?'

অনাদিবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। পরে হেঁয়ালির মত করে বললেন, 'এরচেয়েও তো বিষধর প্রাণী আমাদের মধ্যে আছে, আমরা তার কি করতে পারি?'

কার্তিকবাবুও হাসলেন ওঁর কথা শুনে। আরো কেউ কেউ হাসলেন। নির্মলবাবু বললেন, 'এ একটা যা বলেছেন না, লাখ কথার এক কথা।'

ততক্ষণে সাপটাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

অনাদিবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে হেসে হেসে আবার বললেন, 'আমি স্যার এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, সাপটা এখানে এল কি করে!'

'বুঝে আর কাজ নেই, এবার ক্লাসে যাই চলুন।' বিমলবাবু ওঁর হাত ধরে টানলেন।

'বেটা সহরের লোকের গন্ধে গন্ধে ঠিক এখানে চলে এসেছে।' অনাদিবাবু কি ভেবে ফের হাসলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সব ঠিক হয়ে গেল।

আমার ভয়টা কিন্তু গেল না। পড়ানোর সুরটাই কেটে গেল।

মিলন বলল, 'এটা স্যার তেমন মারাত্মক সাপ নয়।'

'বল কি, সাপ মাত্রই মারাত্মক।'

ছেলেরা আমার কথা শুনে হাসল।

সিরাজুল বলল, ‘কেউটে কাটলেও এখন আর তত ভয় নেই স্যার। বেঁধে-টেঁধে সময় মতন হাসপাতালে নিয়ে গেলে আজকাল বেঁচে যায়। কিন্তু শিয়রচাঁদা সাপে একবার স্যার কাটলে, আর বাঁচার আশা থাকে না।’

আমি বললাম, ‘এসব সাপের তো নামই শুনি নি।’

সুনীল বলল, ‘ওটা স্যার মাঠ থেকে আসে, দেখতে ছোট, ওটাও ফনা তুলতে পারে না।’

ঘণ্টা পড়ে গেল। সাপের কথায় আমি ভয় পেয়েছি দেখে ওরা যেন মজা পেয়েছে। কেউ কেউ মুখ টিপে টিপে হাসছিল।

আরো কয়েকটা ক্লাসে গেলাম। কিন্তু ভেতরে ভয়টা আমার তখনো থেকে গেছে। মুখের ওপর থেকে ভয়টা তখনো পুরোপুরি সরানো গেল না।

একসময় ছুটি হয়ে গেল স্কুল। সবাই একে একে চলে গেল। নির্মলবাবু যাওয়ার আগে বললেন, ‘একদিন আপনাকে আমার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাব। একটু হাঁটতে হবে। তা হোক, গল্প করতে করতে চলে যাব।’

স্কুলের সঙ্গেই পুকুর। এরই মধ্যে বোর্ডিংয়ের কয়েকটা ছেলে ঝপাঝপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে ওপরে উঠে এলাম আবার।

আজকের দিনটা আমার মনে থাকবে বহুদিন।

চার

বাইরে রোদ চিক চিক করছে। কিন্তু সেরকম গরম নেই। দমকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। পণ্ডিতমশায় কথা বলতে বলতে এক ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন নাক ডাকাতে শুরু করেছেন। ছেলেরাও ওপাশে হয়ত ঘুমোচ্ছে। কোন সাড়া শব্দ নেই।

আমার ঘুম আসছে না। পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। খাওয়াটা তেমন জুত হয় নি। ভেটকি মাছের ঝোল, ডাল আর মাছের টক। কিন্তু ঝোলে ভীষণ ঝাল দিয়েছে। এত ঝাল খাওয়ার আমার কোন কালেই অভ্যেস নেই। মাছের টকও আমার এই প্রথম। সেক্রেটারীর বাড়িতেও মাছের টক খেয়েছি। এটা বোধহয় এখানকার বিশেষত্ব।

পণ্ডিতমশায় আমায় বলেছেন, 'নোনা জায়গা, টক ঝাল না খেলে মরে যাবেন, শরীর কষে যাবে।'

আমি কিছু বলি নি। হতে পারে, জায়গা বিশেষে খাওয়া দাওয়ারও এই হেরফের। চারদিকেই তো নদী। তাহলেও এই ঝাল আমার সইবে না।

স্কুলের লাগোয়া পুবদিকে একটা খাল। খালের পাশে বাবলা গাছ। বাবলার ডালে সাঁই সাঁই শব্দ। ওপাশে একটা শিবমন্দির। গাছ-গাছালিতে জায়গাটা ভরা। দূরে দূরে কিছু বাড়ি-ঘর। দক্ষিণে ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে দু একজন লোক যাচ্ছে। কাক ডাকছে। আরো দূরে দিগন্ত-ছোঁয়া বিশাল বিশাল ক্ষেত চোখে পড়ে। গাছ গাছালির ফাঁকে ফাঁকে ঘন লোকালয়।

এখানে কোথাও তেমন যাওয়ার জায়গা নেই। স্কুল-লাইব্রেরী থেকে একটা বই নিয়ে এসেছি। অথচ পড়তে ইচ্ছে করছে না। বুকের ভেতরটা ফাঁকা লাগছে। কেন যেন টন টন করছে। মনে হচ্ছে, এখুনি এসব ছেড়ে-ছুড়ে ছুটে চলে যাই। এ আমি কোথায় এলাম! আমি যে এখনও মন বসাতে পারছি না! এখানে বাইরে থেকে যারা আসে, তারা নাকি একদিন দুদিন থেকে পালিয়ে যায়। পালাবে না তো কি করবে! নদী সাপ ঝড় জল কত কি! ওরা আমাকে সন্দেহ করছে, আমিও এখানে বেশীদিন থাকব না। ওরা আমার সব কথা জানে না। জানলে আর ওরকম ভাবত না। বাপ রে বাপ, ক্লাসের মধ্যেও সাপ! ভাবলে ভয়ে এখনও আমার বুক শুকিয়ে যায়, শরীর হিম হয়ে আসে। ভাগ্যিস, সাহেবুলটা দেখেছিল! না হলে খুট করে একটু বিষ ঢেলে দিলেই তো হয়েছিল। এতক্ষণে ইহলীলা শেষ! মরার সময় নিজের লোকরাও কাছে থাকবে না!

থেকে থেকে আমার কলকাতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এ রকম করে আগে কখনো কিছু মনে হয় নি। আমার সেই আলো না-ঢোকা বাসাটাই এখন খুব আপন মনে হতে লাগল। রাস্তা-ঘাট সব মনে পড়ছে। মা বাবা ভাই-বোন এদের জন্যে মন কেমন করছে। থেকে থেকে মনটা বেদনাতুর হয়ে উঠছে। বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। অথচ ওখানে থাকতে কত রাগারাগি, কত অভিমান, কত অশান্তি। এখন আর ওসব কিছু মনে নেই। সবার কথা ভেবেই মনটা সজল, নরম হয়ে আসে। সেই বাস, সেই ট্রাম, খোকনের চায়ের দোকান। বন্ধুদের সঙ্গে কত বচসা, কত ঝগড়া। দেশবন্ধু পার্ক। ইউনিভার্সিটি, কফি-হাউস, অবনী, স্বাতী। সবার কথাই মনে পড়ে যায়। কত তুচ্ছ টুকরো কথা, ঘটনা, ছবির মতন একে একে মনের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। ওখানকার মানুষজন সবার ওপরই আমার এক সময় কি রাগ, কি ঘৃণা ছিল। ওখানে কেউ

কারো খোঁজ রাখে না। কারো দুঃখে এতটুকু দুঃখ বোধ করে না। কি নির্মম, কি নিষ্ঠুর! কত কি ভেবেছি। কিন্তু এখন ওই কলকাতার জন্যেই যে মনটা আমার কাঁদে, কেবলই কাঁদে। ভাবি, কখন আবার ফিরে যাব ওখানে। একবার ফিরলে যেন বেঁচে যাই।

মা হয়ত আমার জন্যে এখন খুব ভাবছে। মার এই ভাবনা আমাদের সবার জন্যেই। হায়! এ জীবনে তা আর শেষ হওয়ার নয়! মার রোগা করুণ মুখটা আমার চোখের সামনে বারবার ভাসছে। আসবার সময় আমাকে বারবার করে বলে দিয়েছে, পৌঁছেই যেন চিঠি দিই। আমিও জানি, চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত মার অস্বস্তি যাবে না, দুশ্চিন্তা কাটবে না। আমি ঠিক মতন পৌঁছেছি কিনা, কোন অসুবিধে হল কিনা, এসব জানার জন্য মা ছটফট করছে। মার আঁচল ছেড়ে এর আগে কখনো বেরোই নি তো! মা-ও আমাদের ছেলেবেলা থেকে কখনো দূরে যেতে দেয় নি। খালি ভয় আর ভয়। আমরা বড় হওয়ার পরও মার এই ভয় আর গেল না। মার ওই বিষণ্ণ কাতর মুখের কথা ভাবলে আমার বুক ভারী হয়ে আসে। মার মনেও আজ শান্তি নেই। সংসারে অভাব আর অভাব। খাটতে খাটতে মার চেহারাও এই কবছরে খুব ভেঙে গেছে। অনেক দিন আগে মার খুব কঠিন একটা রোগ হয়েছিল। বাঁচার আশা ছিল না। আমি বোধহয় সেবার স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দেব।

বাবা এজন্যে অনেক ধার দেনা করেছিল। কোন কারণে খুব রেগে গেলে মা আজো বাবাকে বলে, 'আমি তো মরতেই বসেছিলাম। আমাকে কি আরো কষ্ট দেওয়ার জন্যেই তুমি ভাল করে তুলেছিলে?'

বাবাও রেগে গিয়ে জবাব দিত, 'তুমি যেমন বোঝ।'

এখন আবার বাবুলটাও মাকে নতুন করে জ্বালাচ্ছে। ওর জন্যে মার যেন দুশ্চিন্তার শেষ নেই। মার ধারণা, ছেলেটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

মার মনে অনেক দুঃখ জমে আছে। মা ঠিক যেমনটি চেয়েছিল,

সেরকম সংসার আর করতে পারল না। দিন দিনই মার চেহারা ভাঙছে। মনে যেন সুখ নেই। সংসারে মা যেন ক্রমশ মনের দিক থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে। ভারী কোন কাজ করা অনেক দিনের নিষেধ। কিন্তু রেগে গেলে তখন আর কারো কথা মা শুনবে না। যা খুশি তাই করবে। পরে হয়ত এজন্যে আরো ভুগতে হয়; কিন্তু তখন সেকথা মনে থাকে না। আমার কেন যেন ভয় হয়, এই রাগে রাগেই মা একদিন দুম করে মরে যাবে।

এসব ভাবলেই আমার চোখে জল চলে আসে। মাকে আমার এই অসুবিধের কথা কখনোই জানানো হবে না। জানালে আর উপায় নেই। আমি মনে মনে বললাম: মা গো, এখানে তোমাদের ছেড়ে এসে আমার ভীষণ, ভীষণ খারাপ লাগছে। এতবড় নদী আমি জীবনে দেখি নি। দেখলেই বুক শুকিয়ে যায়। সেই নদীও শেষে পেরিয়ে এলাম। তুমি তো সেই ছেলেবেলা থেকেই কখনো আমাকে বাইরে যেতে দিতে চাইতে না। কত রকম ভয়ের কথা বলতে! কারা ধরে নিয়ে গিয়ে অন্ধ করে দেয় সেই ভয়, কখন বাসে-ট্রামের তলায় পড়ি সেই ভয়। এর মধ্যেও কোন কোনদিন দেরি করে ফিরলে, তোমার চিন্তার শেষ থাকত না। বুকের মধ্যে গভীর এক উৎকণ্ঠা, ছটফটানি নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে। ফিরলে তবে নিশ্চিন্তি। কিন্তু এখানে যে আরো অনেক ভয়। বিষধর সব সাপ। তোমাকে তো মা এসব কথা জানানো যাবে না। মাগো, তোমাদের জন্যেই আমি এখানে থাকব। আমার চলে আসার কোন উপায় নেই। আমার এই কষ্ট তো আর কেউ বুঝবে না! কেই বা কার দুঃখ বুঝতে চায়!

বুকটা আবার কেন যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। আমি চোখ বুজে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলাম। বাবুলটা এখন কি করছে কে জানে। লতু টুটুল ওরা এখনও হয়ত ঘরে ফেরে নি।

কয়েকটা চিঠি লেখা দরকার। স্বাতীর কাছেও একটা চিঠি লিখতে হবে।

আমি উঠে গিয়ে পোষ্টকার্ড, খাম কাগজ নিয়ে এলাম। ওগুলো আমি সঙ্গে করেই এনেছি।

প্রথমেই মাকে পোস্টকার্ডে লিখলাম।

শ্রীচরণেষু,

মা, আমি ভাল ভাবেই আসিয়া পৌঁছিয়াছি। পথে কোন অসুবিধা হয় নাই। জায়গাটা আমার কাছে ভাল লাগিয়াছে। মাঝে মাঝে তোমাদের কথা মনে পড়ে। আমার জন্য কোন দুশ্চিন্তা করিও না। তুমি সাবধানে থাকিও। শরীরের প্রতি যত্ন লইও। ঠিকমত ওষুধ খাইও। বাবুলটাকে একটু সাবধানে চলাফেরা করিতে বলিও। টুটুল ঠিক মতন স্কুলে যায় তো? মিলুর তো এখন কলেজ বন্ধ। সংসারের কাজে ও তোমাকে এখন সাহায্য করিতে পারিবে। বাবার শরীর কেমন জানাইবে। তুমি এবং বাবা আমার প্রণাম গ্রহণ করিও। ইতি প্রণত অরুণাংশু।

চিঠিটা শেষ করে আমি আবার একবার পড়লাম। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার। পাছে মা আরো দুঃখ পায়, সেজন্যে মার কাছে সত্যি কথাটা আর লিখতে পারলাম না। জায়গাটা আমার কাছে ভাল লেগেছে এবং আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না, এটা জানতে পারলেও মা খানিকটা স্বস্তি বোধ করবে। আমার কাছে এটুকুই লাভ, সান্ত্বনা।

পণ্ডিতমশায় এবার পাশ ফিরে শুলেন। এখনও তিনি গভীর ঘুমের মধ্যে রয়েছেন। হু হু করে বাতাস বইছে। বাবলার ডালে সাঁই সাঁই শব্দ। শালিখ পাখির ডাক। স্তব্ধ হেলানো ঝিমঝিম দুপুর! কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। কত কি ভাবনা এসে আমাকে আনমনা করে দিচ্ছে। কখনো বা বেদনায় বুক ভরে উঠছে।

স্বাতীর জন্যেও আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ওর কাছে যদি এই মুহূর্তে একবার যেতে পারতাম! তেষ্টা পেলে মানুষের যেরকম মনে হয়, স্বাতীর জন্যেও এখন আমার সেরকম অনুভূতি। কলকাতায় থাকতে আমার এরকম হয় নি। দূরে এলে যেন সব ধরা পড়ে। স্বাতীও কি আমার জন্যে এমন করে ভাবে! জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে। হয়ত আমিই এরকম করে ভাবছি। কি আর করি। এখানে এখন আমার অখণ্ড অবসর। আপাতত আমার সামনে করণীয় কিছুই নেই। চারপাশে এক দীর্ঘ নিঃশব্দ মুহূর্ত। বোধহয় সেজন্যেই অনেক কথা, প্রিয়জনের স্মৃতি, একান্ত ঈপ্সিত গোপন কিছু কিছু মুহূর্ত, আমাকে এভাবে কেবলই উন্মনা, উদাস করে দিচ্ছে। লোভীর মতন আমি এগুলোকে আঁকড়ে ধরে তার মধ্যে ডুবে থাকতে চাইছি। ডুবন্ত মানুষ যেরকম করে খড়কুটো ধরেও বাঁচতে চায়, আমিও ঠিক সেরকম করেই এইসব টুকরো, ছেঁড়া ফাটা, ময়লা-জমা ছবি, ঘটনা দিয়ে মনের শূন্যতাকে ভরিয়ে রাখতে চাইছি।

কলকাতায় সেরকম কোন ব্যাপার নেই। মন খারাপ হল তো তার জন্যে অনেক ব্যবস্থা আছে। সিনেমা থিয়েটার, গান বাজনা, জাদু সার্কাস নানা ধরনের আয়োজন। পছন্দ মতন একটা বেছে নিলেই হয়। মোটকথা, একটা না একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকা যায়। কিন্তু এখানে এসব কিছু নেই। অথচ মানুষ সব সময়ই তো প্রিয়সঙ্গ কামনা করে! সৃষ্টির আদিম মুহূর্ত থেকেই তো সে যূথচারী! তবু আমি এখনো সেরকম ভাবে এদের সঙ্গে মিশতে পারি নি। হয়ত এ কারণেই কলকাতা আমার কাছে এখনও মোহময়ী। এখনও ওর হাতছানি আমাকে বিভ্রান্ত করে। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। বুকটা দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে থাকে।

হঠাৎ খেয়াল হল, আমি চুপচাপ বসে আছি। একটা বর্ণও স্বাতীকে লেখা হয় নি। না, যে করেই হোক চিঠিটা শেষ করা দরকার। ওকে আমার কথাগুলো জানানো উচিত। তাহলেও

এই একাকী মুহূর্তের যন্ত্রণার খানকিটা উপশম হবে। আমার হাতে এখন অঢেল সময়। কিন্তু খরচ করার কোন সুযোগ নেই। ভারী কোন বোঝার মতন মনে হয়। এর আগে কখনো আমি এমন বেকায়দায় পড়ি নি। স্বাতীকে এগুলো আমায় জানাতেই হবে। আমি লিখতে শুরু করলাম।

স্বাতী,

নিশ্চয়ই আমার এ-চিঠি পেয়ে তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ, তাই না? হওয়ারই কথা। আমি নিজেই নিজের সম্পর্কে অবাক হচ্ছি, তা তুমি! আমি নিজেই কি কখনো ভেবেছি চাকরির জন্যে আমাকে শেষপর্যন্ত এখানে ছুটে আসতে হবে! ভাবি নি। ভাবছ হেঁয়ালি! মোটেই তা নয়। তোমাদের কাছ থেকে এখন আমি অনেক দূরে। হয়ত এর চেয়ে দূরেও মানুষ যায়, কিন্তু সেসব জায়গায় এমন অসুবিধে থাকে কিনা জানি না। থাকলে আমারই মতন তারা নিঃসঙ্গ বোধ করবে। এর আগে, বিশ্বাস কর, নিজেকে আর কখনো এমন একা বোধ হয় নি। আমার, তোমাদের কথা ভেবে এখন খুব হিংসে হচ্ছে, কষ্টও। আমার মনের অবস্থাটা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। এখানে যে আমার সময়ই ফুরোতে চায় না স্বাতী!

সেদিন তোমার ওখানে আমার যাওয়ার কথা ছিল। আর যাওয়া হল না। ভীষণ রেগে গেছ তো? কিন্তু আমি বিশ্বাস কর, এর মধ্যে একদম সময় পাই নি। তোমাকে খবরটা জানাবার জন্যে আমার মন ছটফট করেছে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সামনে গিয়ে খবরটা দিতে পারলাম না! খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল! অবনীর সঙ্গে দেখা হলে সব জানতে পারবে। আসলে ও-ই এর মূলে। শেষপর্যন্ত একটা চাকরি আমার জুটে গেল। অবনীর কাছে এজন্যে আমি চিরদিনের ঋণে বাঁধা পড়ে গেলাম। ভাবছ, দারুণ বুঝি কিছু! তা নয়। আহা মরি করার মতন কোন চাকরি নয়! সামান্য মাস্টারী। তোমার তো আবার এ-চাকরিতে ভীষণ

আপত্তি! মন খারাপ হয়ে গেল তো! কি আর করব বল! ছেড়ে দেওয়ার মতন আমার মনের জোর ছিল না! হায় রে, এর জন্যেই আমাকে আজ এই স্বজন-নির্বাসন বেছে নিতে হল! এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার।

তুমি বলবে, যদি মাস্টারীই করব তবে এতদূরে কেন, ধারে কাছেও তো করতে পারতাম। আমার তখন এত ভাববার সময় ছিল না। হাতের কাছে পেয়ে, যতই সামান্য হোক, চাকরিটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হল না। ঘা খেয়ে খেয়ে আমি সাহসও হারিয়ে ফেলেছি। অনেক তো ঘোরাঘুরি করেছি। কিছুতেই কিছু হল না। কতজন তো কত রকম আশ্বাসও দিয়েছিল। হল আর কোথায়! আমার দুঃখটা কেউই বুঝতে চায় নি। বুঝলে স্বাতী, সংসারে কোন কোন কপাল থাকে, বড় পাথর চাপা কপাল। ভাগ্যদেবী সহজে সেখানে প্রসন্ন হতে চান না। সামান্য কৃপা দেখাতেও যেন কত কুণ্ঠা! অভাগা আর কাকে বলে! আমারও সেরকমই কপাল। দুঃখ করে কোন লাভ নেই জানি, তবুও না করে যে পারি না! তুমি একবার ভাব তো, এত বড় বিশাল সহরটায় নিতান্ত কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকার মতন আমার একটা কাজ হয় না? আমি কি এতই অযোগ্য, অপদার্থ? অথচ ওরা আমাকে নির্দয়ের মতন দূরে ঠেলে দিল। আমি কার ওপর রাগ করব বলতে পার?

জায়গাটা যে এতদূর, দূরেও ক্ষতি ছিল না, এমনভাবে বিচ্ছিন্ন, তা আমিও আগে থাকতে কিছু জানতে পারি নি। আমাকে জানানো হয় নি। যখন জানলাম তখন আর ফেরার উপায় ছিল না। শেষমেষ টোপটা আমাকে গিলতেই হল। তুমি বিশ্বাস করবে না, সামনে বিশাল নদী। এপার ওপার দেখা যায় না। নদীর ফোঁস ফোঁস আওয়াজ। কি বড় বড় ঢেউ। নৌকোয় উঠে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। মাথা ঘুরছিল। জান, জীবনে এই প্রথম আমি নদী পেরিয়েছি। তার ওপর দিনের মেজাজও

গতকাল ভাল ছিল না। টালমাটাল। যেন অপ্রকৃতিস্থ। ঝড়ো বাতাসের সে কি দাপাদাপি! এরকম ভয় জীবনে আর কখনই পাই নি।

কি, তোমার ভয় হচ্ছে তো? আমি এখন এরকমই একটা জায়গায় আছি। আচ্ছা, ছেলেবেলায় ভূগোলে-পড়া সেই দ্বীপের সংজ্ঞাটা তোমার এখন মনে আছে? সেই যে, চারদিকে জল, মধ্যিখানে স্থল! এও সেই দ্বীপ। আমার চারদিকেই নদী। শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে। আমার এখান থেকে আসল সমুদ্র মাত্র আঠেরো মাইল। কান পাতলে নিশুতি রাতে সমুদ্রের গর্জনও নাকি শোনা যায়! এখনও আমি শুনি নি। গতকাল ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম। মরার মতন ঘুমিয়েছি! তবে আজ নদীর গোঙানি খানিকটা শুনেছি। জান স্বাতী, আমি এখন আমার দেশের একেবারে শেষ প্রান্তে। এই দ্বীপের পরেই সমুদ্র। বঙ্গোপসাগর। সাগর জলে স্নান সেরে সুন্দরী রমনীর মতন উঠে এসেছে এই দ্বীপ। এখনও তার অঙ্গে শিথিল, সিক্ত বেশবাস। কি রকম বুঝছ? রোমাঞ্চিত হচ্ছ তো!

শুনেছি, একসময় এসব জায়গায় নাকি গভীর জঙ্গল ছিল। যাকে বলে সুন্দরবন, সেই সুন্দরবন। হিংস্র শ্বাপদ সংকুল আদিম অরণ্যভূমি। লোকে বলে, একদা এসব জায়গা নাকি পর্তুগীজ হার্মাদ্‌দের লীলাভূমি ছিল। কত ডাকু লুঠেরা। ধীরে ধীরে এখানে একজন একজন করে অনেক মানুষ এল। জঙ্গল কাটল। বাঘ মারল। বুনো শূয়োর মারল। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার তাড়াল। নতুন সমাজ গড়ল। তারপর? সেই সমাজের চেহারাও ধীরে ধীরে একদিন বদলালো। এখন তো সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা অনেকের মনেও পড়বে না। তার চিহ্নও প্রায় শেষ। ঠিক কথা। কিন্তু আমি একটা জিনিস ভেবে দেখেছি স্বাতী, এখানে এই আরণ্যক পটভূমিকায় একদিন যে-কজন মানুষ প্রথম এসেছিল, তারাও সমাজে আমার মতনই উপেক্ষিত, মার-খাওয়া মানুষ। নিরুপায় হয়েই হয়ত তারা একদিন ছুটে এসেছিল এখানে। কিন্তু কেন? বাঁচার জন্যেই তো!

ওদের সঙ্গে আমারও কোথায় যেন একটা মিল আছে! আশ্চর্য।

এখানে এখনও নাকি সাপের ভীষণ উৎপাত। আজই আমার ক্লাসে কোত্থেকে বিষধর একটা সাপ ঢুকে পড়েছিল। বলে রাখি, এখানে এখন মর্নিং স্কুল। মা গো, ভাবলে এখনও শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। কিন্তু কি করব, এর মধ্যেই আমাকে থাকতে হবে স্বাতী। তোমাদের কথা আমার খুব মনে পড়ে। বুকের ভেতরটা তখন টন টন করে। দীর্ঘশ্বাসে বুকের মধ্যেটা ভরে ওঠে। বিকেল হয়ে আসছে। দূর মাঠে তার ছায়া পড়ছে। ইতি অরুণাংশু।

চিঠি লেখা শেষ করে আমি সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার এখন কিছুই ভাল লাগছে না। বুকের মধ্যে কি যেন একটা বিঁধে আছে। আমি সেটা খুলতে পারছি না। ভেতর থেকে এই মুহূর্তে হঠাৎ যেন এক কান্না ঠেলে উঠছে। আমি ঠোঁট কামড়ে ধরে কোন রকমে সামলাবার চেষ্টা করছি। এরা কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে! নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, বাঁচার জন্যে মানুষ আরো কত যে কষ্ট ভোগ করে! জীবন সংগ্রাম, বড় কঠিন সংগ্রাম। মনকে শক্ত না করলে এখানে টেঁকা যাবে না। এখানে কেউ কারো জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয় না। নিজের শক্তি দিয়ে জায়গা করে নিতে হয়। আমাকেও বাঁচতে গেলে, মনকে আরো কঠিন করতে হবে। অন্যের কাছে আমার এই কষ্টের কি দাম! এতে তারা আরো হাসবে। উপহাস করবে। অবস্থার সঙ্গে যেভাবেই হোক নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। আমার কাছেই আমার বাঁচার ছাড়পত্র। একটু অসতর্ক হলেই এই ছাড়পত্র আর একজন কেড়ে নেবে। তখন কেউ মুখ ফিরেও তাকাবে না। একসময় পণ্ডিতমশায় উঠলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুমোন নি?'

'না। ঘুম এল না।' আমি চিঠিগুলো রেখে দিলাম।

পণ্ডিতমশায় কিছু বললেন না। হাসলেন শুধু।

পাঁচ

আমি একসময় নিচে নেমে এলাম। শুয়ে বসে এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি। ছেলেরা খেলতে গেছে। আমাকেও ওরা ডেকেছিল। এসব খেলাধুলো আমার তেমন অভ্যেস নেই। সেই কোন্ ছেলে-বেলায় মাঝে-মধ্যে এক-আধবার ফুটবল খেলেছি। এখন আর মনেও পড়ে না। জায়গাটা ভীষণ ফাঁকা লাগছে। ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই। খাঁ খাঁ শব্দে একটানা শুধু পাগলা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে এল। ফিকে ছায়া মাঠের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে যেন এগিয়ে আসছে। বক উড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছেলেদের চিৎকার ভেসে আসে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক হয়ে এসব পলকা, ভাঙা-ভাঙা ছবি দেখছিলাম। এমন এক ক্লান্ত বিষণ্ণ সন্ধ্যা আমার জীবনে এই প্রথম।

পণ্ডিতমশায় কোথায় যেন গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন। কাঁধে একটা গামছা। দীর্ঘদেহী। পরণে একটা ধুতি। আমার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললেন, 'একটু এদিকে গিয়েছিলাম।'

বারান্দায় দুটো তিনটে চেয়ার। পণ্ডিতমশায় আর আমি পাশাপাশি বসলাম। আমাদের ডানপাশে ডোবা মতন একটা জায়গা। কয়েকটা খেজুর আর বাবলা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ডুমুর আর কিছু বুনো লতাগুল্মের পাতলা ঝোপও চোখে পড়ল আমার। সেখানে সন্ধ্যের মুখে মুখে একটা-দুটো নতুন ধরনের পাখি এসেছে। দেখতে কুচকুচে কালো। ঠোঁটটা সরু। লেজটা বড়। থেকে থেকে লেজ নাচাচ্ছে। মাঝে মাঝে ওরা অদ্ভুত রকমের শব্দ করছে। খেজুরের ডাল থেকে বাবলার ডালে তিড়িং করে লাফিয়ে পড়ছে।

পরক্ষণেই আবার ডুমুর পাতার ঝোপে লুকিয়ে পড়ে। একটা আর একটাকে ধরবার চেষ্টা করছে। যেন লুকোচুরি খেলা চলছে। আমার খুব মজা লাগছিল দেখতে। এসব পাখি আমি কলকাতায় কখনো দেখি নি। গাঙচিলের কথা আমার এখনও মনে আছে। আমি একটুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে পণ্ডিতমশায়কে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কি পাখি?'

পণ্ডিতমশায় একবার তাকালেন। হেসে হেসে বললেন, 'এগুলোই তো ফিঙে।'

'এসব জায়গায় অনেক নতুন নতুন পাখি দেখছি!'

'আগে এখানে অনেক পাখি আসত। এখন আর আসে না। কোথায় যে ওরা চলে গেছে কে জানে।'

'ওরাও বোধহয় নতুন জায়গা খুঁজে নিয়েছে।' আমি চুপ করে থাকলাম। কথাটা হঠাৎ যেন আমার কাছে নতুন একটা অর্থ নিয়ে এল। শুধু ওদেরই নয়, এমনি করে আমাদেরও বারবার নতুন করে জায়গা বদল করতে হয়। মানুষের এই চলার কি আর শেষ আছে! শেষ নেই। অজানা পৃথিবী নিরন্তর তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। উপেক্ষা করার সাধ্য কি! আমিই কি কখনো ভেবেছিলাম, আমার এই পরিচিত গণ্ডী, এতদিনের চেনা-জানা এক অভ্যস্ত বাঁধাধরা জীবন ছেড়ে দিয়ে এভাবে এখানে আসব! তবু তো চলে এলাম। মনের মধ্যে অনেক ছবি উঁকি মেরে চলে যায়। আমি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'যাক গে ওসব কথা, আপনার কাছ থেকে এখন কিছু সহরের কথা শোনা যাক।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিকটা হালকা গলায় বললাম, 'কি আর শুনবেন, সহরটা এখন পুরণো জরাজীর্ণ বাড়ির মতন যে-কোনদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে।' আমি হাসছিলাম।

পণ্ডিতমশায় আমার কথা শুনে যেন ভড়কে গেলেন। অবাক হওয়ার গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই নাকি ?'

'ঠিক তাই, সহরটায় এখন লোকে লোকারণ্য। ঠেলা ঠেলি। ধস্তাধস্তি লেগেই আছে। হই হট্টগোলে ভরা। সব সময়ই গিজ গিজ করছে। কেউ কারো কথা শুনতে চায় না। ভাবতে চায় না।'

'ওখানে নাকি বাসে-ট্রামে ছেলেমেয়েরা ঠাসাঠাসি করে চলাফেরা করে!'

'কি আর করবে, যা ভিড়।'

'আমি কখনো কলকাতা সহর দেখি নি।'

'চলুন একবার আমার সঙ্গে।'

'আপনি যেন কোন্ জায়গায় থাকেন ?'

'শ্যামবাজার।'

পণ্ডিতমশায় হেসে ফেললেন। খুবই আগ্রহ নিয়ে শুধোলেন, 'আচ্ছা, শ্যামবাজার নাম হল কেন ?' গলায় কৌতূহল।

'অত সব বলতে পারব না।' আমিও মৃদু মৃদু হেসে আবার বলি, 'জানেন, চোরবাগান, বউবাজার, আরো সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম আছে।'

'ভারী মজার মজার নাম তো।'

'প্রথম শুনলে তাই মনে হয়।' আমি তখনো অল্প অল্প হাসছি।

'ওখানে তো সব বড় বড় বাড়ি, না ?'

আমি মৃদু হেসে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম, 'তা কেন, বড় ছোট সবই আছে। অনেক বস্তী বাড়িও আছে ওখানে।'

পণ্ডিতমশায় সামান্যক্ষণ নীরব থেকে ফের বললেন, 'আমার একসময় ধারণা ছিল সহরে সবাই বড়লোক, গরীবরা কেউ থাকে না।'

'ওটা কিন্তু আপনার ভুল ধারণা, গরীবের সংখ্যাই তো ওখানে বেশী। গরীব না হলে আমিই বা এতদূরে আসব কেন বলতে পারেন ?'

'কিন্তু এখানকার লোকেরা আরো গরীব, এদের অভাব আরো অনেক বেশী। বেশীর ভাগই ভূমিহীন ভাগচাষী। মহাজনের দয়ার ওপর কোন রকমে বেঁচে থাকে। আপনি কিছুদিন এখানে থাকলেই বুঝতে পারবেন।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'গরীবরা চিরকালই সংসারে মার খেয়েছে, মার খাচ্ছে! আমাদের বোধ-বুদ্ধিগুলো মার খেতে খেতে কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে।'

পণ্ডিতমশায় চুপ করে কি যেন ভাবেন! আমাকে কয়েকবার দেখলেন। আমার কথায় তিনি যেন কেমন উৎসাহ বোধ করলেন। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে একটু দৃঢ় গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন তো, চিরকালই কি এভাবে ভোঁতা হয়ে থাকবে?'

আমিও প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছি। এ বড় শক্ত প্রশ্ন। আমি এর কি জবাব দেব! ওঁর কণ্ঠস্বর কেমন দৃপ্ত, একটু তির্যক। আমি যতটুকু বুঝেছি বললাম, 'কিছুই চিরকাল একভাবে থাকে না পণ্ডিতমশায়, সব সময়ই পাল্টায়। আজ দেখছি ভোঁতা, কিন্তু কাল যে তা ধারাল হবে না কে বলতে পারে!'

'আমার তো সেরকমই মনে হয়।'

'এটা ঠিক, লোকের মনে দিন দিনই অসন্তোষ বাড়ছে। দিন দিনই লোকের চোখ ফুটছে।

'শুনলে অবাক হবেন, এখানেও লোকে এখন একটু একটু করে বুঝতে পারছে। চাষীদের মনেও নতুন নতুন বহু প্রশ্ন জাগছে। সেদিন আমাকে আমাদেরই এক ছাত্রের বাবা গোবর্ধন গায়েন, সাপখালিতে থাকে, বলছিল: কি গো পণ্ডিতদাদা, একটা কথা আমায় বুঝাউঠ, গায়ের রক্ত জল কইর‍্যা ফসল ফলাইঠি, আর আমানে সব না খাইয়া মরব, কেনি? ফসলকে জিগ্‌সউ তো, ফসল তুমি কার গো? যে ফলায়ঠে তার, না যে লুঠ কইর‍্যা গোলায় ভরেঠে, তার? আমানে আর না খাইয়া মরব নি।' কথাটা বলে

পণ্ডিতমশায় চুপ করে থাকলেন একটু সময়। পরে বললেন, 'আমিও কইয়া দিলি, কথাটা চাষীদের ভাল কইর‍্যা বুঝাঠে।'

পণ্ডিতমশায়কে আমার এই মুহূর্তে খুব সহৃদয়, বলিষ্ঠ মনে হল। আমার এখন ভাবতে খুব ভাল লাগছে, সহর থেকে এতদূরে থেকেও একজন মানুষ মানুষের জন্যে কিরকম করে ভাবছে। ওঁর বুকের ভেতরেও বঞ্চিত অপমানিত অবহেলিতের জন্যে গভীর এক কষ্ট, দরদ আর ভালবাসা। ওঁর সঙ্গে আমারও একটা মিল খুঁজে পেলাম। আমার নিঃসঙ্গতা যেন খানিকটা কেটে যাচ্ছে। আমার মনে হল, আমাকে বুঝতে পারবে এমন একজন মানুষ এখানেও আছে। আমি একা নই।

পণ্ডিতমশায় যেন কেমন এক আবেগ বোধ করছিলেন। একটু পরে বললেন, 'বুঝলেন, আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারি না। এই জন্যেই কি আমরা একদিন সংগ্রাম করেছিলাম? কি চেয়েছিলাম, আর কি হল!'

মুহূর্তে আমার চোখ-মুখেও এক উত্তাপ ছড়িয়ে গেল। গলায় সামান্য জোর দিয়ে বললাম, 'হতাশ হওয়ার মতন কিছু নেই। হতাশ হয়ে লাভও নেই। অভিজ্ঞতাই আমাদের পথ।'

'জানেন, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে আমি এখানে প্রথম আসি। আমার নামে সেদিন ওয়ারেণ্ট ছিল। দেশ স্বাধীন করার নেশায় তখন মত্ত। আমিও কি সেদিন ইংরেজের হাতে কম নির্যাতন সয়েছি!' একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে পণ্ডিতমশায়ের। সেদিনের সেই কথা মনে করে আবার যেন ওঁর চোখ-মুখ দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে তিনি একধরনের উত্তেজনা বোধ করছেন। কিন্তু দেখতে দেখতে মুখের ওপর আবার যেন কেমন মলিন ছায়া নেমে আসে। হয়ত যেমনটি তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তা আর দেখা হল না। সেদিনের সেই স্বপ্ন বুঝি ভোজবাজির মতন কোথায় মিলিয়ে গেল!

আমার এই মুহূর্তে কেন জানি বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা মনে পড়ছিল। আমি বললাম, 'রহিম সেখ বা রামা কৈবর্ত এদের যদি উন্নতি না হল, তাহলে কখনই বলব না দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।'

আমার বলার ধরন দেখে পণ্ডিতমশায় হেসে ফেলেছেন। বললেন, 'ঠিক তাই।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বললেন, 'ওদের না হোক, কারো কারো তো যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে!'

'নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু তাতে আপনার আমার কি!'

'কিছুই নয়।' পণ্ডিতমশায়ের মুখে ম্লান এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল। তারপর গম্ভীর হলেন একসময়। বললেন, 'দেশের সব মানুষ যদি খেয়ে-পরেই না বাঁচল, তবে আর বড় বড় কথায় কি হবে! কথায় তো খিদে মরে না। পেট ভরে না!'

আমি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম একটু সময়, বললাম, 'একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন সাধারণ মানুষের অভাব, অশান্তি এগুলো আরো বাড়ছে।'

'বাড়ুক, আরো বাড়ুক। দেখবেন গরীব চাষীরাও একদিন মাথা তুলে ফোঁস করবে।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি, 'আপনার কথা শুনে খুব ভাল লাগছে পণ্ডিতমশায়। গাঁয়ের মানুষ যে এরকম করে আজ ভাবছে আমার ধারণাই ছিল না।'

'গাঁয়ের মানুষকে আর তত বোকা ভাববেন না। ওদেরও এখন চোখ ফুটেছে। ওরাও ভালমন্দ বুঝতে পারে।'

'এটাই তো আশার কথা।'

পণ্ডিতমশায় কি যেন ভাবেন। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, সহরের মানুষ কি আমাদের কথা ভাবে?'

'যারা আপনার আমার মতন তারাই ভাবে। অভাবী, বঞ্চিত মানুষের কাছে কি গ্রাম সহর বলে কোন কথা আছে? তা নেই পণ্ডিতমশায়। সহরে কলে-কারখানায় যে মানুষ মজুর, শ্রমিক,

গাঁয়ে ক্ষেত-খামারে সেই মানুষই চাষী। শ্রমিক আর চাষীর মধ্যে তফাৎ কিছুই নেই পণ্ডিতমশায়। শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার দু জায়গাতেই সমান। সহরে মালিক আর গাঁয়ে মহাজন। বরং আমার একটা জিনিস মনে হয়, গাঁয়ের এই অবহেলিত মানুষগুলো যতদিন না মাথা তুলছে, ততদিন কিছু হওয়ার নয়।'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'এটাকে অবশ্য কেউ ভাল চোখে দেখবে না। সেজন্যে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধে ওদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

'কি রকম ?' আমি ওর চোখে চোখে তাকাই।

'এই ধরুন, জমিদারী প্রথাটা লোপ করে দিয়েছে। মহাজনী প্রথাও আইনত অকেজো। তাছাড়া ভূমিহীন চাষীদের জন্যে কিছু কিছু আশ্বাস-টাশ্বাস দিচ্ছে। ভাবখানা যেন এই যে দেখ বাপু, তোমরা নিজেরা বেশী ঝামেলা-টামেলা করো না। আমরাই তো তোমাদের জন্যে ভাবছি।'

'কিন্তু তাতে কি কিছু ফল হয়েছে, ওদের কষ্ট কি এতে আগের চেয়ে একটুও কমেছে ?'

'মোটেই না।'

'তবে আর কি হল।'

'কি আবার হবে, কিছুই না ?' পণ্ডিতমশায় একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন, 'আইন যেমন আছে, আইনের ফাঁকও তেমনি আছে।'

'ওখানেই তো মজা। ওই ফাঁক দিয়েই তো সব গলে যায়।'

পণ্ডিতমশায় আবেগের গলায় বললেন, 'যাবেই। আইন করল, একজন নিজের নামে এখন পঁচিশ একরের বেশী জমি রাখতে পারবে না। ভাল কথা, নিজের নামে রাখল না, বেনামীতে সব ভাগ করে রাখল। ক্ষতি কিছুই নেই। মহাজনরাও নতুন নতুন পথ বের করে

ওদের রক্ত শুষে নিচ্ছে। আপনি কি মনে করেন, রাতারাতি এদের চরিত্র পাল্টে গেছে, না পাল্টে যায়?'

'কি করে পাল্টাবে, এ কি আর ভেলকিবাজি? লোকের ভেতরের ভালবাসা মমতাই যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে কি আইন করে আর তা ফিরিয়ে আনা যায়? যায় না। দিন দিনই মানুষগুলো যেন কিরকম হৃদয়হীন হয়ে যাচ্ছে। শুধু নিজের ভোগ আর সুখের জন্যেই যেন মারামারি, কাটাকাটি।'

পণ্ডিতমশায়ের চোখে তখনো আবছা ঘোর। ধীরে ধীরে বললেন, 'তবে এরাও এখন একটু একটু করে মাথা তুলতে শুরু করেছে।'

আমি চুপ করে থাকি। পণ্ডিতমশায়ও নীরব। সন্ধ্যের ছায়া ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। শালিখ, কাদাখোঁচা পাখিরাও একসময় উড়ে গেল। ছেলেরা খেলা শেষ করে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হঠাৎ খেয়াল হল, সেই আবছা ধুপছায়ার ভেতর দিয়ে কে যেন হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে।

পণ্ডিতমশায় আমাকে ফিস ফিস করে বললেন, 'কেষ্টবাবু, ওর সামনে এসব কথা কিছু বলবেন না।'

কেষ্টবাবু কাছে এসে হেসে হেসে বললেন, 'নমস্কার মাস্টামশায়।'

'নমস্কার।'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'ইনিই কেষ্টবাবু, কৃষ্ণপ্রসাদ গায়েন।'

কেষ্টবাবু একটা চেয়ার টেনে নিলেন। হাসি মুখে বললেন, 'আমি শুনেছি আপনি এসেছেন। সুদর্শন আমাকে সব বলেছে। আজ সকালা গুণধরের একটা হাতচিঠি পেলাম। জায়গাটা আপনার কেমন লাগছে?'

'এমনি তো ভালই। তবে একটু দূর, আর ওই নদী।'

'ও নদীর জন্যে ভয় পাবেন না। কদিন গেলেই দেখবেন আরো ভাল লাগছে।'

কেষ্টবাবু একটা সিগারেট ধরান। নাম্বার টেন-এর প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দেন, 'নিন।'

আমি একটা সিগারেট বের করে নিলাম। পণ্ডিতমশায়ও নিলেন। আমরা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়লাম।

কেষ্টবাবু বললেন, 'কোন অসুবিধা হলে আমায় বলবেন।'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'দুটো বালিশ আর মশারি লাগবে।'

'অনিলটাকে আমার কাছে পাঠিব, লিয়াইস্‌বে।' পরে আমার দিকে চেয়ে কেষ্টবাবু সিগারেট টানতে টানতে জিজ্ঞেস করেন, 'মাস্টামশায় কবে আসবেন কিছু বলেছেন?'

'আজকালের মধ্যেই আসবেন।'

'আমাদের এখন আর দুজন মাস্টামশায় হলেই চলে যায়।' কেষ্টবাবুকে বেশ খুশি খুশি মনে হলো।

ছেলেরা কেউ কেউ হ্যারিকেন ধরিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কেউ কেউ পুকুরপাড়ে তখনো কথা বলছে। পণ্ডিতমশায় গুরু-গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, 'কিরে, কখন তন্নে পড়তে বসবু?'

ছেলেরা আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে চলে গেল।

কেষ্টবাবু পায়ের ওপর পা তুলে শরীর দোলাচ্ছেন। সিগারেটে টান মেরে জোরে জোরে বললেন, 'আরে এঠি কে আছু রে?'

একটি ছেলে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছে!

কেষ্টবাবু বললেন, 'তিনটে চা লিয়ায়। ভবকে আমার কথা কইবু।'

ছেলেটি চলে গেল।

কেষ্টবাবু আবার বললেন, 'এখানকার টকাগুলা বড় ভাল।'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। আমার সিগারেটটা ছোট হয়ে এসেছে।

কেষ্টবাবু কি যেন ভাবেন। পরে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'বুঝছ পণ্ডিত?'

'কি।' পণ্ডিতমশায়ের গলায় খানিকটা ধোঁয়া চলে গেছে, তিনি কাশলেন কয়েকবার।

'স্কুল বিল্ডিংয়ের টাকা আসছে।' ভীষণ খুশি কেষ্টবাবু।

'কত টাকা?'

'মোটা টাকাই হবে।' পা নাচাতে থাকেন কেষ্টবাবু। মনে মনে কি যেন একবার হিসেব করেন। বললেন, 'ভাবছু বিল্ডিং আর কোয়ার্টারটা এক সাথে আরম্ভ কইর‍্যা দিব।' কথার মধ্যে এমন একটা ভাব যেন তিনিই স্কুলের সর্বে সর্বা।

ছেলেটি একটি থালায় করে তিনটে চায়ের গ্লাস নিয়ে এসেছে।

আমরা তিনজনে তিনটে গ্লাস তুলে নিলাম।

চায়ে চুমুক দিয়ে কেষ্টবাবু আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছেন। আর আমাদের সিগারেটও শেষ হয়ে এসেছে। আমি আরো কটা টান মেরে টুকরোটা ফেলে দিলাম।

চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে সিগারেটে টান দিচ্ছেন কেষ্টবাবু। এক ফাঁকে বললেন, 'কাল একবার ডায়মণ্ডহারবার যাবু।'

'কেনি?' পণ্ডিতমশায় ওঁর মুখের দিকে তাকান।

'সাপখালির জমির গণ্ডগোল তো আইজও মিট্‌ল নি।'

পণ্ডিতমশায় একবার আমার দিকে তাকালেন। কি ভেবে যেন হাসলেন সামান্য, বললেন, 'অত সহজে কি জমির গণ্ডগোল মিটবে?' ওঁর হাসিটার মধ্যে যেন একটা অর্থ আছে। আমার অন্তত সেরকমই মনে হল।

কেষ্টবাবু সিগারেটে টান দিয়ে কি যেন গভীরভাবে ভাবলেন একটু। মুখের হাসিটা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। চোখ দুটো ছোট ছোট হয়ে এল। তাঁর মুখের ওপর একটা কুটিল ছায়া পড়েছে। অনেকটা স্বগতোক্তির মতন তিনি বললেন, 'গোবর্ধনটা একদিন মরবু, বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করছু।' আস্তে আস্তে কথাটা

বললেন কেষ্টবাবু। হয়ত এই নিয়েই তিনি কিছু একটা ভাবছেন। উত্তেজিত, সামান্য অন্যমনস্ক মনে হল তাঁকে।

'কেনি গো, ও আবার কি করলু ?'

'মুখে যা আইসেঠে, তাই কয়ঠে। শালা যেমন ঢেমনা, একদিন তো খাইতে পাইত নি। কত হাতে-পায়ে ধরছু, তবে তো জমি চাষ করতে দিচি! আর অখন কিনা ছাড়বু নি!'

'ও কয়ঠে কি ? পণ্ডিতমশায় কৌতুক বোধ করছিলেন।

'কি আর কয়ঠে, আমি কি না খাইয়া মরবু ? তুই শালা তা মরবু কি বাঁচবু, তার আমি কি জানি রে, শালা ঢেমনা ?' তারপর আমার দিকে চেয়ে একগাল হেসে মোলায়েম গলায় বললেন, 'বুঝলেন, এই ফালতু ঝামেলা এরা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে।'

হঠাৎ বোধহয় কেষ্টবাবুর খেয়াল হল, আমার সামনে প্রথম সাক্ষাতেই এতটা বেআব্রু হাওয়া উচিত নয়। চা খেয়ে গ্লাসটা তিনি একপাশে রেখে দিলেন। আমাদেরও তখন চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

এমন সময় ভীম এসে বাঁশের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে পণ্ডিতমশায়কে বলল, 'মুরগী লিয়াসছু।'

ভীম আমাদের পাচক। আবার ও স্কুলেরও ঘণ্টা বাজায়। কলসীতে জলও ভরে রাখে। আবার কখনো কখনো নাকি নোটিশ-বইও ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিয়ে আনে। এ সবই পণ্ডিতমশায়ের কাছে আমার শোনা। তবে বড় তাড়াতাড়ি করে কথা বলে। ওর কথা আমার বুঝতে একটু অসুবিধে হয়।

কেষ্টবাবু প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন, বললেন, 'কত দাম লিলরে ভীম ?'

'পাঁচ টাকা মাগছিল, আমি চার টাকা দিয়া আসচি।'

'দেখ, নূতন লোক, দেখাশুনা কইর‍্যা খাবিবু-টাবিবু।'

ভীম হাসে।

কেষ্টবাবু আবার বলেন, 'দেখবুরে, বেশী ঝাল-টাল আবার ছুবু নি।'

'না না, ঝাল ছুব কেনি?'

আমি মুচকি হাসলাম। কিছু বললাম না।

কেষ্টবাবু আমার দিকে তাকালেন। অমায়িকভাবে হাসলেন সামান্য, বললেন, 'আগে এখানে খাওয়া-দাওয়ার আরো সুখ ছিল। সেসব দিন আর আসবে না।'

আরো খানিকক্ষণ বসে থেকে কেষ্টবাবু উঠে পড়লেন, 'কাইরে অনিল, আমার সাথে আয়।'

আমি বললাম, 'আজ না হয় থাক, কাল সকালেই গিয়ে নিয়ে আসবে।'

'থাউ তবে।' কেষ্টবাবু চলে গেলেন।

পণ্ডিতমশায় বুড়ো আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন, 'বাঁকা কেষ্ট এবার বড় জব্দ!'

আমি কিন্তু এত রাগের কারণটা বুঝতে পারলাম না।

'ও আপনি বুঝবেন না।' পণ্ডিতমশায় নিজের মনেই হাসলেন কিছুক্ষণ। হাসি শেষ করে একসময় বললেন, 'স্কুলের নামে অনেক বিঘে জমি আছে, সেই জমির আয়ও বছরে কম নয়। জমিগুলো প্রতি বছরেই চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়। এই কেষ্টবাবুই আজ বেশ কবছর ধরে এ-কাজটা করছেন। তিনি দেখে দেখে নিজের পছন্দ-করা লোকের মধ্যে এগুলো বিলি করেন। অবশ্য তার বিনিময়ে বেশ কিছু নিজেও করে নিচ্ছেন।' পণ্ডিতমশায় চুপ করলেন।

আমি ক্রমশ যেন অবাক হয়ে যাচ্ছি। এদিকে স্কুলে কাজ করছেন, তার ওপর আবার এসব কারচুপি!

পণ্ডিতমশায় আমার দিকে মুখ করে বললেন, 'গোবর্ধনের সঙ্গে লাগল কোথায় বলতে পারেন?'

'না!'

'কেষ্টবাবুর চালাকিটা ও ফাঁস করে দিয়েছে। সেজন্যেই এত গোঁসা। ওই বাঁকা কেষ্ট ধুরন্ধর কি কম! চাষীদের সঙ্গে গোপনে বখরা করে ফসল কম করে দেখাত। এতে বছরে একটা মোটা আয়। এসব কাজে কি বিশ্বাসী লোক না হলে চলে! কারো ওপর চটে গেলে বা আরো কিছু বেশী পাওয়া যাবে, এই লোভে একজনের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে অন্যজনকে দিত। গোবর্ধনের কাছ থেকেও জমিটা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। গোবর্ধন ছাড়বে না। ছাড়লে খাবে কি! সে তো যা ন্যায্য, তা দিতেই চাইছে। তবু বাঁকা কেষ্টার মন ওঠে না। গোবর্ধনও আসল কথাটা বলে দিয়েছে। ও ঠিকই করেছে।' পণ্ডিতমশায় ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে গেলেন।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'এত কাণ্ড?'

'এ তো গেল একটা দিক। আরো অনেক আছে। লোকটিকে অত সহজ ভাববেন না।'

'এমনিতে তো খুব বিনয়ী মনে হয়।'

'বিনয় ওর মুখেই। ভেতরে অন্য জিনিস।' পণ্ডিতমশায় যেন ভীষণ চটে গেছেন। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'উঃ, স্কুলের পয়সাটা কি নয় ছয়ই না করছে। কাল হয়ত নিজের কাজে যাবে, আর খরচা দেখাবে স্কুলের নামে! বিল্ডিং হওয়ার নামে কিরকম ফুর্তিটা একবার দেখলেন তো! এসব নিয়েই তো ধীরেনবাবুর সঙ্গে লেগেছে! কমিটির লোকগুলোও হয়েছে তেমনি, যা কিছু, সবই কেষ্টকাকা!' পণ্ডিতমশায় শেষের শব্দটা গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যাত্রা করার ভঙ্গিতে বললেন।

আমি এক চোট হাসলাম।

পণ্ডিতমশায় উঠে পড়েছেন। বললেন, 'এবার কোঁকর বাবাজীর ব্যবস্থাটা করি গে। ওরে অনিল, সুরেন, লস্কর লিয়া নিচে আইস্‌বু।'

আমিও উঠে পড়েছি। এভাবে এই অন্ধকারে একা একা বসে থেকে কি হবে। আমার মনে হল, বাতাসের শব্দ যেন আরো বেড়েছে। কান পাতলে নদীর গোঙানীও হয়ত শোনা যায়। আকাশে অজস্র নক্ষত্র। খইয়ের মতন ফুটছে তো ফুটছেই। আমি আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এলাম। ছেলেগুলো পড়ছে। ওদের সঙ্গে কথা বললেও ভাল লাগবে।

ছয়

ছেলেরা যে যার লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে সবে পড়তে বসেছে। সব কিছুই ওদের আলাদা। বিছানা থালা গ্লাস সবই। বিছানা-পত্তরেও কোন বাহার বা বাড়াবাড়ি নেই। খুবই সামান্য, যেটুকু না হলে নয়, ঠিক তাই। একটা চাটাই বা মাদুর, একটা কাঁথা, বড় জোর, তার ওপর একটা সস্তার চাদর, বালিশ আর মশারি। কলাই করা থালা আর গ্লাস। বাড়ি থেকে আসার সময় ওরা টিন ভরতি মুড়ি নিয়ে আসে। মুড়িই ওদের সকাল সন্ধ্যের জলখাবার। এছাড়া খাওয়ার মতন এখানে আর কিই বা আছে! ভবর চায়ের দোকান, সেখানে সস্তাদরের বিস্কুট, চা। শশিকান্তেরও একটা চায়ের দোকান আছে। সেটা আবার হাটবারের দিন ছাড়া খোলে না। কারণ আর কিছুই নয়, খদ্দের নেই। ভিড়টা ভবর দোকানেই। হাটবারে কলা-টলা বা সামান্য অন্য ফল-পাকড়ও পাওয়া যায়। তেলেভাজার দোকান বসে কয়েকটা। এক মিঠাই অলাও আসে। গরম গরম জিলিপি ভাজে। এসব খাওয়ার মতন পয়সাও থাকে না সকলের। সবার অবস্থা তো আর সমান নয়। কজনেরই বা সচ্ছলতা আছে! বোর্ডিংয়ে ছেলেকে রেখে পড়ানোর ক্ষমতা তো সবার নেই! যারা এখানে আসে, তাদের মধ্যেও অনেকের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। নিজেরা অনেক কষ্ট করে ছেলেকে এখানে পড়াচ্ছে। যদি ছেলেটা একটু লেখাপড়া শিখতে পারে! অনেকের দূরে দূরে বাড়ি। রোজ চার-পাঁচ মাইল পথ হাঁটাহাঁটি পড়ে! এতে আর কতটুকু পড়াশুনো হয়! পড়তে বসেই

ঘুম আসে। ঘরে থাকলেই একটা না একটা কাজ থাকে। বাপ-মার ধারণা, এখানে রাখতে পারলে ছেলেটা মাষ্টামশায়দের চোখে চোখে থাকতে পারবে। পড়াশুনোর সময় পাবে। যারা দুষ্টু, তাদের দুষ্টুমিও এতে কমবে। আগের দিনকাল তো আর নেই। দিন খুব তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে। আজকালের দিনে একটু পড়াশুনো না থাকলে চলে!

অরবিন্দ ছেলেটা বেশ নম্র; লাজুক। পড়াশুনোয় মাথা ভাল। বুদ্ধিমান। ওর বাবা একজন ভাগচাষী। সংসারে ওদের অভাব অনটন লেগেই আছে। ওরা অনেকগুলো ভাইবোন। থাকেও দূরে। মুড়িগঙ্গা ছাড়িয়ে একেবারে বড় বাঁধের কাছাকাছি। রোজ যেতে আসতে অনেকটা পথ। সময়ও যায় অনেক। তবু ছেলেটার উৎসাহ কমে না। এই কষ্টের ভেতর দিয়েই ও এগার ক্লাসে উঠেছে। পরীক্ষার ফলও ভাল। এবছরটা বোর্ডিংয়ে থাকতে পারলে ওরই মঙ্গল। পড়াশুনোর সময় পাবে। মাষ্টামশায়রাও দেখিয়ে-টেখিয়ে দিতে পারবেন। ওর বাবা অনেক কষ্ট মেনে নিয়েই শেষপর্যন্ত ওকে বোর্ডিংয়ে দিল। অরবিন্দও যে এটা না বোঝে তা নয়। পরীক্ষায় তাকে ভাল ফল করতেই হবে। তার জেদ বেড়ে যায়। পণ্ডিতমশায় বলেছেন, মাঝে মাঝে ওর টাকা পয়সা বাকি পড়ে যায়। তখন ও ভীষণ মনমরা হয়ে থাকে। ওর চোখ-মুখ গভীর এক দুঃখে যেন ভেজা থাকে। পণ্ডিতমশায় ওকে খুবই স্নেহ করেন। ওর নম্র সরল ব্যবহার আমাকেও মুগ্ধ করেছে। এরা সবাই বড় সরল। এদের সবাইকেই আমার ভাল লাগে।

হিমাংশু ছেলেটাও পড়াশুনোয় মন্দ নয়। ওর ব্যবহারও মিষ্টি। ওরা এখানে থাকে না। ওর বাবা লোহাচরায় থাকে। ওটাও একটা ছোটমতন দ্বীপ। ওখানেও কিছু লোকজন আছে। চাষবাস করে। নৌকোয় যাতায়াত করতে হয়। সম্বলমাত্র সামান্য জমি। একসময় নাকি ওদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। এখন খুবই

খারাপ। বছরের ফসলও ঘরে ওঠে না। একটু একটু করে নদী গ্রাস করছে। অনেক জমিই ওই রাক্ষুসে নদীটার পেটে গেছে। এখনো যেন লোভ কমে না। যাদের অবস্থা ভাল, তারা সাগরে কিংবা কাকদ্বীপে বাড়িঘর করেছে। এ জায়গার ওপর আর ভরসা নেই। একদিন সবটাই জলের তলায় চলে যাবে। লোকজন ক্রমশই পালাচ্ছে। ঝড় জলের দিনে ভয়ে বুকের ভেতরটা ঠকঠক করতে থাকে। নদীর জল একবার ফোঁস ফোঁস করলে নাকি ওদের চোখে আর ঘুম থাকে না। গায়ের রক্ত জল হয়ে আসে। ওর বাবা এই জমিটুকুর লোভে এখনও ওখানে পড়ে আছে। এটুকুও চলে গেলে কি যে হবে বুঝতে পারে না! মাঝে মাঝে খেয়া পেরিয়ে ছেলেকে দেখতে আসে। খরচপত্তর দিয়ে চলে যায়। ওখানে কোন স্কুলও নেই।

এখন যারা এখানে আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কানাই। ওদের অবস্থা ভাল। ওর বাবার অনেক জমিজমা। কিন্তু অবস্থা ভাল হলে হবে কি, ঘরে কোন শান্তি নেই। মারামারি লাঠালাঠি লেগেই আছে। ওর বাবার স্বভাব-চরিত্রও খুব একটা নাকি ভাল নয়। প্রায় দিনই মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। কোন কোন দিন ফেরেও না। পয়সা দিয়ে কচুবেড়ের কাছাকাছি কোন এক মেয়েছেলে এনে রেখেছে। ওর কাছেই বেশীর ভাগ রাত কাটে। এদিকে যে পায়ের নিচে থেকে কখন মাটি সরতে শুরু করেছে, টেরও পায় নি। ঘরের ভেতরেই ঘুন ধরেছে। একদিন কানাইয়ের মা তার এক ভাসুর-পোর সঙ্গে পালিয়ে গেল। কোথায় গেল কেউ এখনো জানে না। ছেলেটাকে দেখার মতন ঘরে আর কেউ নেই। ছেলেটা সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ওর চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। কিছুই সে বলতে পারে না। পণ্ডিতমশায় একে একে সবারই পরিচয় দিয়েছেন। কানাইয়ের মুখের দিকে চাইতে আমারও বড় মায়া হয়। ছেলেটা বড় দুঃখী। এরকমও যে কেউ

করতে পারে, আমার জানা ছিল না। এসব ঘটনা যেন এখানে নতুন কোন ব্যাপার নয়। আগে আগে নাকি এসব নিয়ে কেউ মাথাই ঘামাত না। আজকাল একটু-আধটু কথা-টথা হয়। এখনকার ছেলে ছোকরারা যারা একটু লেখাপড়া শিখেছে, এটাকে খুব একটা ভাল চোখে দেখছে না। এসব অনাচার অবিচার আর কতদিন চলবে!

অনেকের বাড়ি থেকে আবার চাল আসে। এতে খরচ অনেকটা কম পড়ে। যাদের আসে না, তাদের স্বভাবতই একটু বেশী পড়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকের ঘরে আমরা থাকি। ডান দিকের ঘরে ছেলেরা! আমাদের ঘরটা একটু ছোট। মাটির দোতলা ঘর। শক্ত, পুরুষ্টু মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে। মাথার ওপর টালির ছাদ! হু হু করে বাতাস ছুটলে ঘরটা যেন টলতে থাকে। আমার ভয় করে। এরকম যে বাড়ি হতে পারে, না দেখলে ভাবা যায় না। ডান দিকের ঘরটায় ষোল জনের মতন থাকার ব্যবস্থা আছে। আমাদের ঘরেও দরকার হলে দু-চারজন থাকতে পারে।

এখন এখানে সাকুল্যে দশজন ছাত্র। পরে নাকি আরো বাড়বে। অনেক সময় কমেও যায়। হিসেবপত্তর পণ্ডিতমশায়ই রাখেন। তিনিই এদের দেখাশুনো করেন। তাঁর ওপরই সব দায়িত্ব। পণ্ডিতমশায়কে অনেক ভেবেচিন্তে, টিপেটুপে খরচ করতে হয়। এ না করে উপায়ও নেই। খাওয়া-দাওয়ার বেশী ঘটা করলে অসুবিধে গরীব ছেলেগুলোরই। খরচটা সবার ওপরই ভাগাভাগি হয়ে যায়।

অনিল পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে মুরগী কাটার কাজে লেগে গেছে। একজন বাড়ি গেছে। এখনো ও ফেরে নি। ছেলেগুলো মুড়ি খেতে খেতে পড়ছিল। কেউ শব্দ করে করে, কেউ বিড় বিড় করে। আমাকে দেখে ওরা খুব খুশি হল। হিমাংশু বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'এখানে বসুন স্যার।' বলেই মাদুরটা ঝেড়ে দিল। সরে বসল।

আমি ওর পাশেই বসলাম। কারো গলা দিয়ে আর কোন শব্দ বেরোচ্ছে না। সব চুপচাপ। আমাকে অপলকে দেখছে। মুখ টিপে টিপে হাসছে। আমি মৃদু হেসে বললাম, 'সব যে চুপ করে গেলে!'

অরবিন্দ লাজুক-চোখে দেখছিল। সবার ওপর দিয়েই এক পলক চোখ বুলিয়ে নিলাম।

সরোজ বলল, 'আপনাকে স্যার আমাদের খুব ভাল লেগে গেছে।'

আমি ওর চোখে চোখে তাকালাম। হেসে হেসে বললাম, 'আমারও কি আর খারাপ লেগেছে তোমাদের, তা নয়, তবে—'

কথাটা শেষ না করায় ওরা আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে আছে। আমার এই বলার মধ্যে দ্বিধা, অস্পষ্টতা ছিল। হয়ত মনে মনে এই মুহূর্তে আমার সম্পর্কে ওরা কোন একটা ধারণা করে নিয়েছে। ওদের মুখের হাসি যেন মুহূর্তে মলিন রঙ ধরেছে। আমি বুঝতে পারলাম, এভাবে বলাটা আমার উচিত হয় নি।

নারায়ণ বলল, 'আপনিও কি স্যার আমাদের ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন?' ওর গলার স্বরটা যেন একটু ভাঙা ভাঙা শোনাল।

'আমাদের দুঃখটা একবারও কেউ ভাবে না।' হিমাংশু বলল।

'বাইরে থেকে যাঁরা আসেন, তাঁরা একদিন-দুদিন থেকেই চলে যান।'

অরবিন্দরও মন খারাপ হয়ে গেছে। ও মুখ নিচু করে বেজার মুখে বসে আছে।

'আপনি চলে গেলে খুব দুঃখ পাব স্যার।' অর্ধেন্দু বলল।

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, 'আরে না, আমি এখনই যাচ্ছি না।'

অরবিন্দ এবার হাসি মুখে বলল, 'আপনাকে স্যার আমরা যেতেই দেব না!'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ স্যার, আপনাকে আমরা যেতে দেব না।' ওদের মুখে আবার সেই হাসিখুশি।

একটু চুপ করে থেকে মুচকি হেসে বললাম, 'যাই বল, সাপকে ভাই আমার ভীষণ ভয়।'

নারায়ণ বলল, 'সাপকে স্যার সবারই ভয়।'

বলরাম বলল, 'সেদিন আপনার ক্লাসে যে সাপটা ঢুকে পড়েছিল, ওটা স্যার জলের সাপ। কামড়ায় না, কামড়ালেও বিষ নেই।'

আমি শরীর ঝাড়া দিয়ে বললাম, 'তখন আর ওসব কথা মনে থাকে না।'

সরোজ বলল, 'আগে তো স্যার এখানে আরো অনেক সাপ ছিল। কবছর ধরে একটু কমেছে। সাপ-কাটিতে আগে অনেক লোক মরত, এখন কম মরে।'

'সে কি?' আমার গলায় সামান্য বিস্ময়।

'হ্যাঁ স্যার, এখন তো সাপের ওষুধ বেরিয়ে গেছে! সময় মতন হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে বেঁচে যায়।' অর্ধেন্দু খুব সরল গলায় বলে গেল।

'তার ওপর ও যা নদী!'. আমার মুখ শুকিয়ে গেল।

বলরাম বলল, 'আজ কবছর ধরে এখানে নতুন ধরনের একটা সাপ এসেছে।'

'কি রকম?' আমি ওর চোখে চোখে চেয়ে থাকলাম একটু সময়।

অরবিন্দ বলরামের মুখের দিকে চেয়ে একটু ধমকের গলায় বলল, 'চুপ কর তো, তোকে আর অত সাপের গপ্প কইতে হবু নি।'

বলরাম আমার মুখের দিকে চেয়ে শুধলো, 'বলব স্যার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল না। বেশ ভাল লাগছে শুনতে।'

'সাপটার নাম স্যার, শিয়র চাঁদা। হাত দেড়েক লম্বা হয়। মাথাটা চ্যাপ্টা। ফণা তুলতে পারে না। খুব ঢিমে তালে চলে। তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে না।'

আমি কৌতূহলের গলায় বললাম, 'সাপটা আমাকে একবার দেখিও তো, তোমাদের সবার মুখেই এই সাপটার কথা শুনছি।'

অর্ধেন্দু বলল, 'শিয়র চাঁদা কামড়ালে আর বাঁচে না কেউ।'

নারায়ণ বলল, 'কেউটে বা বোড়া কামড়ালে অনেক সময় বেঁচে যায়, কিন্তু শিয়র চাঁদা কামড়ালে আর আশা নেই।'

'আমার দাদাকে কামড়ে ছিল। বাঁচে নি।' হিমাংশু বলল।

'এ সাপটা স্যার ঘাম খেতে আসে।' নারায়ণ মুখ টিপে হাসছে।

'ঘাম খেতে?' আমি ওদের চোখে চোখে চেয়ে থাকি।

'হ্যাঁ স্যার।' বলরাম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বিছানা-টিছানা ওরা খুব পছন্দ করে।'

অরবিন্দ হালকা গলায় বলল, 'তা নয় স্যার, আসলে, গরীব মানুষ, মেঝেয়-টেঝেয় শুয়ে থাকে। অত খেয়াল থাকে না।'

সরোজ হাসতে হাসতে বলল, 'আমাদের মধ্যে বলরামের ভীষণ সাহস, সাপ একবার ওর চোখে পড়লেই হল।'

অর্ধেন্দুও হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'হবে না কেন স্যার, ওদেরই পূর্বপুরুষ সাপের ওঝা ছিল। এখনো স্যার ওদের বাড়িতে মনসার ঘট আছে। ওরা এখন এসব ছেড়ে দিয়েছে।'

আমি শুধোলাম, 'ছাড়ল কেন?'

বলরাম সহাস্যে বলল, 'এখন লোকের বিশ্বাস কমে গেছে। ভয়ডরও আর তেমন করে না।'

আমি ওর বলার ধরণ দেখে হেসে ফেললাম, 'তা যা বলেছ।'

বলরাম হাসল না এবার। ওর মুখ-চোখ মুহূর্তে অন্যরকম হয়ে গেল। একটু অন্যমনস্ক। মনে মনে কি যেন একটা সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুখের ওপর একধরনের অস্থিরতা ফুটে ফুটে উঠছে। এসব ভাবলে যেন ওর খুব কষ্ট হয়। মনে হল, ওর চোখের সামনে যেন কোন অস্ফুট শৈশবের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনা একটু

একটু করে ভেসে উঠছে, আবার পরমুহূর্তেই হারিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়েও পড়ে না। বিষধর সাপ নিয়ে খেলা কি সোজা কথা! তার পূর্বপুরুষরা একদিন সাপ নিয়ে ব্যবসা করেছে। কত রকমের সব সাপ! সাপ বশ করার মন্ত্র জানত তারা। শিকড়-বাকড়ের গুণই আলাদা। তেমন তেমন শিকড়ও আছে, একবার মুখের সামনে ধরলেই ভয়ঙ্কর সাপও নেতিয়ে পড়ে। কত কি তারা জানত। কিছুই রেখে গেল না। একটা মন্ত্রও শিখিয়ে দিয়ে গেল না। ওর যেন এতে রাগ হয়! কথাটা মিথ্যে নয়, এখনো ওদের বাড়িতে মা-মনসার ঘট আছে। সেটা কাউকে ছুঁতে দেয় না ওর বাবা। মাঝে মাঝে সাপের ফোঁস ফোঁসানি শোনা যায়। এখনো ওরা আসে, খেলা করে। ওর বাপ-মা ভয়ে মরে। বলরামের কিন্তু ভয়ডর নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে ও ওখানে চলে যায়। সাপ দেখলে তেড়ে যায়। এ বাড়িতে সাপ মারা নিষেধ। ও এসব কথার ধার ধারে না। একদিন তো মরতে মরতেই বেঁচে গেছে! দিন দিনই ওর দুষ্টামি বাড়ছে। গর্তের মধ্যে যখন তখন হাত ঢুকিয়ে দেয়। সেজন্যেই নাকি ওর বাবা ওকে এখানে দিয়েছে। ওর এসব শিখতে ভীষণ ইচ্ছে করে। কিন্তু এখন ওদের কেউ আর এ ব্যবসা করে না। তার বাবা অন্যের জমিজমা চাষ করে, মাছ-টাছ ধরে। কোন রকমে দিন চলে যায়। ওর জন্যেই বাপ-মার ভাবনা। একসময় ওদের নাকি এখানে খুব খাতির-যত্ন ছিল। নাম-যশ ছিল। আজ আর কিছুই নেই। আবছাভাবে কখনো কখনো ঠাকুর্দার কথা তার মনে পড়ে। এখনো পুরনো দিনের যারা বেঁচে আছে, তারা ঠাকুর্দার নাম করে। কপালে হাত ঠেকায় ভক্তিতে। ঠাকুর্দা যেন জাদু জানত। ঠাকুর্দার মন্ত্রের গুণ ছিল। কত যে সাপের বিষ নামিয়ে দিয়েছে! কত মানুষ বাঁচিয়েছে। এখনো লোকের মুখে মুখে অনেক গল্প গেঁথে আছে। বাবার কাছে ও অনেক গল্প শুনেছে। এসব কথা মনে পড়লে এখনো তার বুকের ভেতরটা গর্বে, আনন্দে

তোলপাড় করতে থাকে। মাঝে মাঝে ঠাকুর্দা নাকি কোথায় উধাও হয়ে যেত। পাহাড় জঙ্গল ঘুরে ঘুরে শিকড়, গাছের ছাল, আরো কত কি টোটকা-টাটকা নিয়ে ফিরে আসত। সেও যদি এরকম কিছু একটা শিখতে পারত ! তার কাছেও যদি এরকম কোন শিকড়-টিকড় থাকত ! সেও তাই ঘরের আনাচে কানাচে মাঝে মাঝে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। সাপকে সে আদৌ ভয় করে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলরাম আমার মুখের দিকে তাকাল। কি যেন ভাবল। পরে আস্তে আস্তে বলল, 'তবে স্যার, এখনো মন্ত্রের গুণ আছে। সেরকম ওঝার পাল্লায় পড়লে, যেখানেই সাপ লুকিয়ে থাকুক না, তাকে ছুটে আসতেই হবে। কিছুতেই পালাতে পারবে না।'

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'আমিও এরকম শুনেছি, চোখে কখনো দেখি নি।

'আপনি স্যার বিশ্বাস করছেন না।' বলরাম একটু হাসল আমার মুখের দিকে চেয়ে। পরে আবার বলল, 'আমার ঠাকুর্দা তো সাপের বিষ নামাতে পারত।' ওর বলার মধ্যে কোন সংশয় ছিল না, বরং এক গর্ব ছিল। একটু সময় চুপ করে থেকে আবার বলল, 'এর জন্যে স্যার, অনেক নিয়ম-টিয়ম নাকি মেনে চলতে হয়। তা না হলে কোন কাজ হয় না, উল্টে নিজের ক্ষতি। ভীষণ নাকি আচার নিষ্ঠা।' কথা বলতে বলতে ও আবার যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কি একটা যেন মনে করার চেষ্টা করছে। খানিকক্ষণ পরে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকাল। একটু দম নিয়ে ও বলল, 'আমার বাবার মুখে শোনা, একবার রাতদুপুরে কতগুলো লোক এল আমার ঠাকুর্দাকে নিয়ে যেতে। সাপ-কাটির কথা শুনলে তো আর ঘরে থাকা যায় না। যেতেই হবে। আট-দশ মাইল পথ। বাবাও ঠাকুর্দার সঙ্গে গেল। ওখানে যখন ওরা পৌঁছাল, তখন সকাল হয়ে গেছে। বাড়িতে কান্নাকাটি। খবর পেয়ে গাঁয়ের লোক আসতে শুরু করল। সাত সকালেই হাটবারের ভিড়।

ঠাকুর্দা ঝোলা থেকে গেরুয়া রঙের একটা আলখাল্লা বের করে পরে নিল। গলায় হাড়ের একটা মালা পরল। শিকড়-বাকড় বের করল। ততক্ষণে মাটির সরা, কাঁচা দুধ এসে গেছে। একটা নতুন মাটির সরাতে দুধ কলা রাখল। ঠাকুর্দা মন্ত্র পড়তে লাগল। চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক জোয়ান। সারা শরীর নীল হয়ে গেছে। মুখে ফেনা। ঠাকুর্দা ঝুড়ি থেকে আরো কিছু শিকড়-বাকড় বের করে নেয়। ওর নাকের কাছে নিয়ে যায়, ঝাড়-ফুঁক করে, মন্ত্র আউড়ায়। এই করতে করতে বিকেল হয়ে গেল। ঠাকুর্দার চেহারা তখন অন্যরকম। চোখ দুটো নাকি জ্বলছে। জবা ফুলের মতন টকটকে লাল। শরীর টলছে। সাপ আর কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে! শোঁ শোঁ শব্দ করতে করতে সাপ ছুটে এল। সবাই ভয়ে পথ ছেড়ে দিল। হেলেদুলে সাপ ফণা তুলছে। আবার লেতিয়ে পড়ছে। বিরাট কাল-কেউটে। মন্ত্রের ঠেলায় শেষে ওর গায়ে ছোবল মারে। ঠাকুর্দার এক হাতে দুধের মালসা। ওটা এগিয়ে দেয়। পালাবার উপায় নেই। আর এক হাতে কি একটা শিকড়। দুধ নীল হয়ে যায়। এরকমভাবে কিছুক্ষণ চলল। দুধটা একবারে কালো হয়ে গেল। জোয়ান লোকটা যেন নড়ে উঠল। ও বেঁচে গেল। সাপটার নড়বার আর শক্তি নেই। আস্তে আস্তে সাপ নিস্তেজ হয়ে এল। ওটা আর বাঁচে নি।' বলরাম কথাগুলো শেষ করে চুপচাপ বসে থাকল। ওর সারা শরীর যেন শিরশির করে ওঠে। দৃষ্টি খানিকটা ঘোলাটে, উদাস।

আমাদেরও কারো মুখ দিয়ে আর কথা বেরোচ্ছে না। মুহূর্তে সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন অন্যরকম হয়ে গেল। গল্পটা আমাদের সবাইকেই যেন অনেক দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে থেকে ছবিটা সরাতেই পারছি না।

অরবিন্দ হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। কানাইয়ের চোখে-মুখে কিসের যেন ভয়। নারায়ণ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসা।

হিমাংশুও যেন কি ভাবছে গভীরভাবে।

একটু পরে সরোজ আমতা আমতা করে বলল, 'ও ঠিকই বলছে স্যার, আমিও আমার বাবার মুখে ওর ঠাকুর্দার একটা দারুণ গল্প শুনেছি। সেটা স্যার আরো মারাত্মক।'

'তাই নাকি?' আমার চোখে-মুখে কৌতূহল। আমি বড় বড় চোখ করে ওর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলাম।

সরোজ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যা স্যার।'

এখন সরোজের ওপরই সকলের দৃষ্টি। সেই মারাত্মক গল্প শোনার জন্যে আমাদের সকলের ভেতরেই চাপা এক অধীরতা।

বলরামের চোখ-মুখ সহসা যেন দীপ্ত হয়ে উঠল। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

সরোজ বলল, 'বলরামই বলুক না স্যার!'

'না, তুই-ই বল।' বলরাম বলল।

আমরা আবার নড়েচড়ে বসলাম।

সরোজ বলল, 'এখানে স্যার, সাগর মেলা হয় জানেন তো?'

'হ্যাঁ।'

সরোজ গলা খাঁকারি দিল বারকয়েক। কি যেন ভেবে নিল একটু সময়। খানিক পরে বলতে শুরু করল, 'সে অনেকদিন আগের কথা। মেলায় তখনো অনেক ভিড় হয়। দূর দূরান্তর থেকে কত সাধু সন্ত, ফকির, লোক-লস্কর সব আসত। অনেক ওঝা-টোঝাও আসত, কদিন ধরেই মেলা চলত। একবার এরকমই এক মেলায় নামজাদা এক ওঝা এল। সাপের খেলা দেখাবে। মেলায় ঢেরা পিটিয়ে তা জানিয়ে দেওয়া হল। আর যায় কোথায়! দেখতে দেখতে লোকের ভিড় বাড়তে লাগল। লোকের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। ওঝা একটা গণ্ডি টেনে দিয়েছে। এর মধ্যে বাইরের কেউ ঢুকতে পারবে না। ওঝা আর ওঝার দুই চেলা। ওঝার সামনে কটা বেতের ঝাঁপি। তার ভেতরে নাকি

নানান জায়গার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সাপ আছে। সেই সাপের খেলা দেখান হবে। ওঝা কিসব মন্ত্র আউড়াল। লোক হাঁ করে চেয়ে আছে। চোখের আর পলক পড়ে না যেন। ঝাঁপির মুখটা সবে সামান্য ফাঁক করেছে ওঝা, সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেমন টলে গেল। মুখটা ওর সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাসে, কালিবর্ণ হয়ে গেল। চোখ বড় বড় হল। চিৎকার করে হঠাৎ ও বলতে শুরু করল, এখানে যে আমার এই খেলায় বাধা দিচ্ছে, সে নিজের ভাল চাইলে এক্ষুনি যেন এখান থেকে চলে যায়। তা না হলে ঘোর বিপদ আছে।

শুনে তো সব লোক থ। বলে কি! কারো মুখে আর কোন কথা নেই। ওঝা তখন পাগলের মতন অন্য একটা ঝাঁপির কাছে ছুটে গেল। ডালাটা খুলতেই সেই এক দৃশ্য। এবার যেন ওঝা রাগে আরো ফেটে পড়ল। চিৎকার করে করে বলল, এখনও সাবধান করে দিচ্ছি, যে এখানে আমার খেলায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, সে যেন এই মুহূর্তে এ জায়গা ছেড়ে চলে যায়। বলেই ওঝা আবার অন্য ঝাঁপিটার কাছে ছুটে গেল। এবার ওঝার শরীর থর থর করে কাঁপছে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

লোকের ভিড় আরো বেড়ে গেল। ওঝা রাগে গজগজ করে বলতে লাগল, আমার কোন দোষ নেবেন না গো বাবুমশায়রা। আমি মা-মনসার বেটা। এবার চালাকি আমি বের করব।

চেলাদের মুখও শুকিয়ে কাঠ। কারো মুখে আর কথা নেই।' সরোজ গল্পটা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল।

আমরা যেন হোঁচট খেলাম। বলরাম অন্যমনস্ক। সরোজ চুপ করে কি যেন ভেবে নিল। গল্পটা আমাদেরও কেমন নেশাগ্রস্ত করে দিচ্ছে।

সরোজ আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার শুরু করে, 'তারপর সেই ওঝা কি করল জানেন, অন্য একটা বেতের টুকরি থেকে তিনটে বড় বড় দা বের করল। লোক দুজনকে কি যেন ইশারা করল। সাপের

ঝাঁপিগুলো ওরা ওঝার সামনে এনে রেখে দিল। ঝাঁপির ভেতর থেকে এক একটা করে সাপ বের করল, সব মরা। বটিতে কুচি কুচি করে সাপগুলো কাটল। তিনটে ডেকচিতে সেগুলো রাখল। তিনটে উনুন করা হল। লোক দুজন কাঠ আনতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ওরা কাঠ নিয়ে ফিরে এল। ডেকচি তিনটে উনুনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। ফুটছে তো ফুটছেই। ওঝা বিড়বিড় করে মন্ত্র আউড়াচ্ছে। আর মাঝে মাঝে চিৎকার করছে, এখনও সময় আছে। তা না হলে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

লোকেরা যেন মজা পেয়ে গেছে। ভিড়টা আরো বাড়তে লাগল। তার কিছুক্ষণ পরই যা হল না স্যার!' সরোজ মাঝ-পথেই কথাটা থামিয়ে দিয়ে বারকয়েক কাশল। দম নিল একটু সময়। মনে মনে আবার সাজিয়ে নিল কথাগুলো।

আমাদের চোখে-মুখেও তখন অধীর আগ্রহ। বলরামের চোখেও যেন কিসের এক ঘোর।

পরক্ষণই সরোজ বলতে আরম্ভ করে, 'একটু পরেই সাংঘাতিক এক ব্যাপার ঘটে গেল। তিনটে ডেকচি থেকে তিনটে বিরাট বিরাট সাপ বেরিয়ে এল। হিস হিস করে ছুটে আসছে। এবার লোকে পড়িমরি করে পালাতে শুরু করল। ওঝা তখন পাগলের মতন কিসব মন্ত্র পড়ছে। দেখতে দেখতে লোক ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু একজন লোক তখনো বালির ওপর হাঁটু মুড়ে বসে আছে। সাপ তিনটে ওর দিকেই ছুটে আসছিল। কাছাকাছি চলে এসেছে। ফণা তুলেছে। সেই লোকটা হঠাৎ কি যেন মন্ত্র পড়ল। তিনটে তুড়ি দিল। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে তিনটে পাখি ছুটে এল। নিমেষে সাপ তিনটে মুখে নিয়ে পালাল।

এতক্ষণে ওঝা বুঝতে পারল। ওর পা টলছে। মাথা ঘুরছে। টলতে টলতে ওর পায়ের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এবার আর রাগ নয়। রীতিমতন ভয়। পায়ে হাত রেখে ওঝা কাতর

গলায় বলতে লাগল, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি আরো বড় গুনিন, আরো বড় ওস্তাদ। আপনি আমাকে বাঁচান।

ওঝা দেখল বালির ওপর তিনটে পাখি আঁকা।

সেই লোকটি ধীরে ধীরে বলল, বাঁচাবার মালিক তো সেই ওপরঅলা। আমি আজই এটা পরীক্ষা করলাম। অনেককাল আগে পাহাড়ে জঙ্গলে যখন ঘুরছি তখন এক বড় গুনিনের সঙ্গে ভাগ্যগুণে দেখা হয়ে যায়। আমাকে এটা শিখিয়ে দিল। আমিও ভাই অবাক হয়ে যাচ্ছি। বলে হাত কপালে ঠেকিয়ে কাকে যেন অন্তরের শ্রদ্ধা জানায় লোকটি। পরে ওঝার দিকে চেয়ে ফের বলে, তুমিও ভাই বড় ওস্তাদ। এবার তুমি তোমার খেলা দেখাও। দেখ গিয়ে ঝাঁপিতে তোমার সব সাপই জ্যান্ত আছে। ঠিক তাই।' সরোজ এ পর্যন্ত বলে চুপ করে থাকল।

আমরা হতবাক। স্তম্ভিত।

একটু পরে সরোজ আবার বলল, 'ওই লোকটিই হল বলরামের ঠাকুর্দা।'

আমার গায়েও কাঁটা দিল। আমি চুপ করে থাকলাম। পণ্ডিতমশায় আমাকে ওর কথা বলতে গিয়ে ওর ঠাকুর্দার কথাও বলেছিল। সাপের ওঝা হিসেবে ওর ঠাকুর্দার একসময় খুব নামডাক ছিল। কিন্তু পরের দিকে নাকি ওর বেশ দুর্নামও হয়েছিল। কোন্ এক মেয়েছেলের পাল্লায় পড়েছিল। মদে ডুবে থাকত। মন্ত্রের গুণই নষ্ট হয়ে গেল! এসব কথা হয়ত বলরাম জানে না। ওর কথা আমিও পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারি না। গাছ-গাছালি, মন্ত্রের গুণের কথা আমিই আর কতটুকু জানি! এ হতেই পারে। সহানুভূতির গলায় বললাম, 'এটাকে তোমাদের ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয় নি।'

বলরাম ম্লানভাবে হাসল, 'ঠাকুর্দা যে নিজেই সব ছেড়ে দিয়ে গেল।'

'বড় অদ্ভুত তো!'

বলরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে বেজার, আহত গলায় বলল, 'আসলে ঠাকুর্দারই একদিন মাথা খারাপ হয়ে গেল।'

'ইস্।' আমি অবাক চোখে চেয়ে থাকলাম ওর দিকে।

'হ্যাঁ স্যার, আমার এক জ্যাঠামশায় ছিল। জ্যাঠামশায় একটু একটু করে সব শিখে নিচ্ছিল। সেই জ্যাঠামশায়কেই একদিন সাপে কাটল। ঠাকুর্দা কত কি করল। ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র, শিকড়-বাকড়। কিছুই হল না। শেষে নিজের হাতে ছেলেকে সাজিয়ে কলার মান্দাস জলে ভাসিয়ে দিল। ঠাকুর্দা হেরে গেল। যে মানুষ অন্য লোক বাঁচিয়েছে, সেই মানুষ তার ছেলেকে বাঁচাতে পারল না। তারপর থেকেই ঠাকুর্দার মাথা খারাপ হয়ে গেল। মাস কয়েকের ভেতরেই ঠাকুর্দাও মরে গেল।' বলরামকে এই মুহূর্তে বড় ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। এ যেন তার কাছেও এক ধাঁধাঁ। নিজের ছেলের বেলায় ঠাকুর্দার কোন মন্ত্রই আর কাজে লাগল না কেন? তাহলে কি কোথাও বড় রকমের কোন অনিয়ম হয়েছিল? ঠাকুর্দা কি তা জানত না? ঠাকুর্দাই তো বলত, নিয়ম নিষ্ঠায় সামান্য ভুলচুক হলেও কোন ক্ষমা নেই। এসব কাজের বিপদ অনেক।

কিছুক্ষণ আমাদের কারো মুখেই আর কোন কথা নেই।

অর্ধেন্দু আমার মুখের দিকে তাকাল। পরে সরল মনে শুধলো, 'আপনাদের ওখানে সাপ-টাপ নেই?'

'ওখানে সাপ থাকবে কি করে! সব সময়ই তো লোক। বাস ট্রাম লরি ট্যাক্সি রিক্সা ঠেলার ভিড়। ওদের প্রাণের ভয় নেই!'

অরবিন্দ হালকা গলায় বলল, 'পাড়াগাঁয়ে তো একটু সাপ-টাপ থাকবেই স্যার।'

আমি এবার হেসে ফেললাম। বললাম, 'সেই তো, ও বেচারারাই বা যাবে কোথায়, ওদেরও তো থাকতে হবে।'

আমার কথা শুনে ওরা হেসে ফেলল।

তখনো ওরা হাত গুটিয়ে বসে আছে। আমার সামনে মুড়ি খেতেও যেন ওদের লজ্জা। বললাম, 'আরে, খাচ্ছ না কেন, খাও।'

নারায়ণ বলল, 'আপনিও স্যার একটু মুড়ি খান।'

'আরে না।'

'আমরা শুনবই না।' বলরাম উঠে পড়ল। একটা থালায় মুড়ি নিল। পরে থালাটা এগিয়ে দিল।

'এত কি হবে, আরো কমিয়ে দাও।'

অর্ধেন্দু বলরামের দিকে তাকাল, বলল, 'কম কইর‍্যা দুবু।'

আমি হেসে ওর চোখে চোখে তাকালাম, 'কি বললে ?'

'ও স্যার আমাদের গাঁওয়ালি ভাষা। আপনিও পরে শিখে যাবেন।'

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, অরবিন্দর পেছনে চুপচাপ করে কানাই বসে আছে। ও একটাও কথা বলে নি। আমাদের কথা শুনে গেছে শুধু। আমি বললাম, 'কানাই তো, সেই থেকে একটাও কথা বলছে না।'

কানাই লজ্জায় মুখ নিচু করে আছে।

আমি ওর দিকে চেয়ে থাকলাম একটু সময়। কি বলব ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি জানি, ওর বুকের মধ্যে একটা কাঁটা ফুটে আছে। কাঁটাটা ও কিছুতেই খুলতে পারে না। যন্ত্রণায় ছটফট করে। ওকে খুব দুঃখী, মনমরা দেখায়। ও প্রায় সময়ই চুপ করে থাকে। কিছুই যেন ভাল লাগে না ওর। অনেক সময়ই একা একা ঘুরে বেড়ায়। খোলা জানলা দিয়ে দূরের মাঠ প্রান্তর আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কি দেখে ওই জানে। কত কি ভাবে। ভাবতে ভাবতে বুকের ভেতরটা ওর একসময় ভারী হয়ে আসে। চোখের পাতা ভিজে ওঠে। কথা বলতে গিয়ে ও কেঁদে ফেলে। স্নেহ মমতার রাজ্য থেকে ছেলেটা এরই মধ্যে যেন নির্বাসিত। শনিবার এলে প্রায় সবাই ঘরে যায়। এজন্যে পণ্ডিতমশায়ের কাছে আগে থাকতেই ওরা

দরবার করে। তাড়াতাড়ি করে ঘর পালায়। কিন্তু ওর সেরকম কোন আর্জি নেই। ও এখানেই থাকে। ঘরে যেতে ওর ইচ্ছে করে না। লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল মোছে। এরমধ্যে একদিন ওর বাবা এসেছিল। ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ও যায় নি। কার কাছে ও যাবে? ওর বাবাও কি আর ঘরে থাকে! ও মুখ ফুটে কাউকেই ওর কষ্টের কথাটা বলতে পারে না। ভেতরে ভেতরে ও কেবলই পুড়ছে আর পুড়ছে। আমি হাসি হাসি মুখে ওকে বললাম, 'তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় চল কানাই।'

কানাই কোনরকম উৎসাহ দেখাল না। একপলক তাকিয়েই ও চোখ নামিয়ে নিয়েছে। মুখের ওপর সেই বিষণ্ণ ছায়া তির তির করছে!

কলকাতার কথা শুনে ওরা খুব উৎসাহ দেখাল। বলরাম বলল, 'আমি যাব স্যার আপনার সঙ্গে।'

নারায়ণ খুশি খুশি গলায় বলল, 'কলকাতায় স্যার অনেক কিছু দেখার আছে, না?'

'তা তো থাকবেই।'

সরোজ বলল, 'আমি স্যার একবার বাবার সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিলাম। কি বড় বড় বাড়ি, তাকালে মাথা ঘুরে যায়। ট্রামেও চড়েছি। কত সিনেমা, খাবারের দোকান। দেখে দেখে আর শেষ করা যায় না।'

হিমাংশু মুড়ি খেতে খেতে বলল, 'আমি তো স্যার এখনো ডায়মণ্ডহারবারেই যাই নি। রেলগাড়িই দেখি নি।'

'সে কি?' আমি ওর মুখের দিকে তাকাই।

অর্ধেন্দু বলল, 'ও স্যার ঠিকই বলছে। এখানের অনেকেই রেলগাড়ি দেখে নি।'

বলরাম বলল, 'আপনাদের স্যার বেশ মজা।'

আমি হাসলাম, 'না, যা ভাবছ ঠিক তা নয়।'

অরবিন্দ বলল, 'কেন, ওখানে তো স্যার, সবাই যেখানে খুশি যেতে পারে, যা খুশি খেতে পারে। সিনেমা সার্কাস কত কি!'

আমি হেসে ফেললাম, 'এসব করতে হলে অনেক পয়সা চাই রে ভাই, অনেক পয়সা চাই।'

'পয়সা তো আছেই, পয়সা না হলে কি আর কেউ সহরে থাকতে পারে।'

'এই যা একখানা বলেছ না।' আমি হালকা গলায় হেসে উঠলাম। ওদের এরকমই ধারণা। দোষও নেই। শুনে-টুনে মনের মতন ওরা এরকমই একটা ছবি তৈরী করে নিয়েছে। যারা নিজের এলাকা ছেড়ে আজো এক পা বাইরে যায় নি, তাদের কাছে এটা তো স্বপ্নের মতন। অদেখা রহস্যময়ী এই সহরও বুঝি ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। ওরাও এখানে আসতে চায়, ছটফট করে। কিন্তু আসতে পারে না। বুকের ভেতরে এক কষ্ট জমে থাকে। এ যেন কোন স্বপ্নের রাজপুরী। কিন্তু ওদের ধারণা ভুল, মস্ত ভুল। সহরের সবটাই সুখের ছবি নয়। এখানে যারা থাকে, তারা সবাই রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর নয়। এই রঙচঙের আড়ালে মলিন দীনবেশও লুকিয়ে আছে। ওরা এই খবরটাই তো জানে না। হয়ত জানতেও চায় না। শুধু হাসি নয়, চোখের জলও আছে অনেক। সহরের সবাই যদি সুখী হত, তবে তো কথাই ছিল না। ইচ্ছে হলেই কি সবাই সব কিছু খেতে পরতে পারে? পারে না। যখন যেখানে খুশি বেড়াতেও পারে না। এমনি কত ইচ্ছে বুকে নিয়েই মানুষকে চলে যেতে হয়! তার হিসেব তো কেউ রাখে না! আমার কেন যেন মনে মনে বলতে ইচ্ছে হয়ঃ তোমরা যা ভেবেছ তা ঠিক নয়, ঠিক নয়। তোমরা আমার সব কিছু জান না। জানলে বুঝতে, আমরাও তোমাদেরই মতন গরীব। তোমাদেরই গোত্রের। তা না হলে কি এতদূরে ছুটে আসি?

আমারও মুখের ওপর বিষণ্ণ ছায়া নেমে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস

বেরিয়ে আসে। আস্তে আস্তে বললাম, 'প্রদীপের নিচেই তো অন্ধকারটা বেশী। সহরের আলোটাই সব নয়, অন্ধকারও আছে, সে বড় ভয়াবহ অন্ধকার।'

ওরা কি বুঝল, জানি না। কেউ আর কোন কথা বলল না। এমন সময় অনিল সুরেন ওপরে ওঠে এল। আমিও উঠে পড়েছি। এই মুহূর্তে আমার বাড়ির কথা মনে পড়ল। মার মলিন মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। একে একে আরো অনেকের কথাই মনে পড়ছিল। স্বাতী কি ঠিক ঠিক মতন আমার চিঠি পাবে? পেলেও ও কি উত্তর দেবে চিঠির? বুকের ভেতরটা কেন যেন টনটন করে উঠল।

সাত

আজ অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি। আমার ভালই লেগেছে। ছেলেমেয়েগুলো বড় সরল, গরীব। অনেক দূর থেকে ওরা হেঁটে আসে। ওদের সঙ্গে কথা বলে, এটুকু বুঝেছি, এসময়টায় ওরা অনেকেই দুবেলা পেট ভরে খেতেও পারেনা। রিলিফ-এর ওপর ওদের ভরসা করে থাকতে হয়। অনেকেরই ভাল জামা-প্যাণ্ট নেই। যদি এমন হত যে খালি গায়েও স্কুলে আসা যাবে, তাহলে বোধহয় অনেক ছেলে, ছোট ছোট মেয়েরাও উদোম গায়েই ক্লাসে আসত।

আজো কেষ্টবাবু যে আসবেন না, এটা কালই শুনেছিলাম। সকালে একটি ছেলেকে দিয়ে আমার জন্যে বালিশ আর মশারি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখান থেকে আর কাউকে যেতে হয় নি। কেষ্টবাবুকে না দেখে ধীরেনবাবু আজো বিরক্ত হয়েছেন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছেন, 'স্কুলটা-তো কারো কারো কাছে জমিদারী! যখন খুশি এল গেল, অথচ কিছু বলা যাবে না।'

কার্তিকবাবু হেসে হেসে বলেছেন, 'কাল থেকে আমরাও আর রোজ রোজ আসব না। একজন দিনের পর দিন না এসে টাকা নেবে, আর আমরা গাধার মতন খাটব, কেন? আমরাও এবার থেকে কামাই করব।'

ধীরেনবাবু বলেছেন, 'তাই করুন তো। তবে যদি মাথায় কিছু যায়।'

অনাদিবাবু বিড়ি টানতে টানতে খুব মিষ্টি মিষ্টি করে আমাকে বলেছেন, 'কাল মাস্টারমশায় খুব ভয় পেয়েছিলেন, তাই না?'

অনাদিবাবুর কথাগুলো আমার কাছে কেমন যেন হেঁয়ালির মতন মনে হয়। কথা বলেন, আবার মিট মিট করে হাসেন। ভীষণ বিনয়ী যেন। সব সময়ই যেন হাত জোড় করে আছেন। আমিও হেসে বললাম, 'না, ভয়ের কি আছে!'

'এই তো মাস্টারমশায়ের সাহস এসে গেছে! যাক, আমরা তাহলে একজনকে পার্মানেন্টলি এখানে পেলাম! থাকুন, থাকুন। থাকতে থাকতে আরো ভাল লাগবে দেখবেন।' বলতে বলতে হেঁ হেঁ করে হাসেন অনাদিবাবু। ওঁর দেখাদেখি কালিপদবাবুও কি ভেবে যেন হাসতে থাকেন।

আশুতোষবাবু মিহি করে হেসে বলেন, 'গাঁয়ে তো সাপ-টাপ একটু থাকবেই মাস্টারমশায়, তা বলে ভয় করলে চলবে কেন!'

অনাদিবাবুর মুখে আবার সেই মিষ্টি হাসি। চোখ পিট পিট করে বলেন, 'ঠিক কথা, তাছাড়া কবি তো বলেছেন, আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।'

আমি বললাম, 'কবি বোধহয় সাপের মুখে পড়েন নি কখনো, পড়লে নাচাটা বেরিয়ে যেত!'

সবাই হেসে উঠলেন।

বিমলবাবু বললেন, 'এঠিকে ওই গাঙ আর সাপ-টাপের ভয়ে কেউ আসতে চায় নি।'

'এরিতরে টকাছানার ত পড়াশুনোর ক্ষতি।' বিষ্ণুবাবু হাই তুললেন।

বিমলবাবু কি ভাবলেন যেন একটু সময়। বললেন, 'আর ত কটা বছর, আমান্‌কের এই টকাগুলা, পাস-টাস কইর‍্যা একবার বারিলে হয়। তখন আর অন্‌কে নেই হইলেও চলবে।'

কার্তিকবাবু ভুরু কোঁচকালেন, 'থাকলে তাড়ি ডুবু নাকি?'

বিমলবাবু রেগে গেলেন, 'আপনি বড় বাঁকা বাঁকা কথা কও!'

কার্তিকবাবু হাসলেন, 'বারে, আমি তো আপনার মনের কথাটাই কইলি।'

কালিপদবাবু টিপ্পনী কাটলেন, 'আপনি কি আজকাল মনের চর্চা করেন নাকি?'

আশুতোষবাবু বললেন, 'আহা, থাক না ওসব।'

অনাদিবাবু হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'এখানে ঝড় জলের সময়ই বেশী ভয়।'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'বেচারা ভয় না পেলেও, অনাদিবাবু ওঁকে ভয় পাওয়াবেনই।'

নির্মলবাবু সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'অনেক হয়েছে, এবার সাপ-টাপের গল্প থামান।' একসময় স্কুল ছুটি হল। একে একে সবাই চলে গেল।

আশুতোষবাবু মুড়িগঙ্গার দিকে থাকেন। ওখানে পোষ্ট-অফিস। স্কুল ছুটির পর ওঁর হাতে আমি চিঠিগুলো ডাকে ফেলার জন্য দিলাম।

আজ দুপুরে খুব ঘুমিয়েছি। ঘুম ভাঙল সেই বিকেলে। ছেলেরা ততক্ষণে খেলতে চলে গেছে। জানালা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাতাস ঢুকছে। শোঁ শোঁ শব্দ। শুয়ে শুয়েই একফালি আকাশ দেখতে পাচ্ছি। সেখানে এখন ধূসর মেঘ। বহু মানুষের গুম গুম একটা আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে যেন শোনা যাচ্ছে। কানের কাছে গুঞ্জনের মতন সমানে বেজে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি না কিছু। আমি অবাক চোখে পণ্ডিতমশায়ের দিকে তাকালাম।

তিনিও আমার দিকে তাকালেন। আমার মনের কথাটা যেন টের পেয়েছেন। মুচকি হেসে বললেন, 'আজ বামনখালির হাটবার তো, হাটুরেদের চেঁচামেচি।'

আমি উঠে পড়েছি। বেশ উৎসাহ বোধ করছিলাম। হাট মানে তো অনেক লোক। আশপাশের গাঁ থেকে কত লোক এখানে

কেনাকাটা করতে আসবে। অনেক মানুষ-জন দেখা যাবে। আমি উৎসাহ ভরে বললাম, 'চলুন হাটে যাই।'

'ঘর থেকে নিচে নামলেই তো হাট।'

আমি একগ্লাস জল খেলাম। পাজামা আর হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবীটা পরে নিলাম। চুল আঁচড়ে নিলাম।

'পণ্ডিতমশায় আছেন নাকি?' বলতে বলতে কে যেন উপরে উঠে আসছে।

নির্মলবাবু। ওঁকে এখন দেখতে পাব ভাবি নি। আমার খুব ভাল লাগছিল। আমি হেসে হেসে বললাম, 'বসুন।'

নির্মলবাবু বললেন, 'এখনও এখানে বসে আছেন? বেরিয়ে জায়গাটা একবার দেখুন-টেখুন!'

'এই তো বেরোচ্ছিলাম!'

নির্মলবাবু হাসলেন। হেসে হেসে বললেন, 'নাঃ, পণ্ডিতমশায়ও দেখছি কিছু করছেন না। ওকে আপনাদের জায়গাটা একটু ঘুরিয়ে-টুরিয়ে দেখান।'

পণ্ডিতমশায় হাসি মুখ করে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, দেখবেন বই কি! সবই দেখবেন, আবার দেখলেই হবে না, বুঝতেও হবে। এখানকার সমস্যাগুলো যদি না-ই বুঝলেন—তবে আর হল কি।' পণ্ডিতমশায়ের কথার ভেতরে আরো এক গভীর অর্থ যেন লুকিয়ে আছে। তিনি অপলকে তাকিয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ।

'সে তো অনেক জটিল ব্যাপার পণ্ডিতমশায়।'

'কিচ্ছু জটিল না।'

'ঠিক আছে, সেগুলো ওকে পরে বোঝাবেন।' নির্মলবাবু আমার মুখের দিকে এবার চাইলেন, বললেন, 'সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে, চলুন যাই।'

পণ্ডিতমশায় হেসে হেসে বললেন, 'যান, ঘুরে আসুন ওঁর সঙ্গে। আমি একজনের সঙ্গে কথা বলে পরে যাচ্ছি।'

আমরা নিচে নামলাম। সত্যিই, স্কুলের বারান্দা পর্যন্ত দোকান

চলে এসেছে। এদিকটায় গামছা আর জামা-কাপড়ের দোকানই বেশী।

হাট বেশ জমজমাট। লোকের চিৎকার, চেঁচামেচি। অনেকের হাতেই লাঠি, দুটো তিনটে করে বোতল, আর একটা করে ঝুড়ি।

আমি বললাম, 'এসব লাঠি-ফাঠি কেন?'

নির্মলবাবু বললেন, 'ভয়ের কিছুই নেই। রাত-বিরেতে পথ চলতে কত বিপদ আপদ। বড় বড় সাপ-টাপও রাস্তার ওপর অনেক সময় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। সেজন্যেই হাতে কিছু একটা রাখা। আর ওই যে বোতল দেখছেন, ওতে করে ওরা কেরোসিন কি সরষের তেল-টেল নিয়ে যাবে।'

আমি দেখলাম, কেউ কেউ কেনাকাটা সেরে এরই মধ্যে ঘরের পথ ধরেছে। অনেক দূরে দূরে যেতে হবে ওদের। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা এই অন্ধকারে যেতে পারবে?'

নির্মলবাবু হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'না গিয়ে উপায় কি! তাছাড়া এই অন্ধকার ওদের সয়ে গেছে।'

'এখানকার অন্ধকারটাও কিরকম জমকালো, আমার তো ভীষণ ভয় করে।'

'আমারও করে। আমিও তো রাতে টর্চ ছাড়া এখানে এক পা-ও চলি না।'

'ওরাও তো আলো-টালো নিয়ে চলতে পারে!'

নির্মলবাবু আমার এই কৌতূহল দেখে ফের হাসলেন, বললেন, 'তা কেউ কেউ তো চলেই। তবে বেশীর ভাগই এখানে অন্ধকারে চলাফেরা করে। শুধু চলাফেরা কি, অনেকের তেল কেনার পয়সাও থাকে না। অনেকেই এখানে সন্ধ্যের মুখে মুখেই খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়ে। অন্ধকারের মধ্যেই ওদের দীর্ঘ রাত কেটে যায়।'

'আমি তো ভাবতেই পারছি না।'

'প্রথমে আমিও ভাবতে পারি নি। এখন চোখে দেখছি। যার

আছে তার প্রচুর, যার নেই কিছুই নেই।'

আমাকে এখন এখানে অনেকে অবাক হয়ে দেখছে। এদিকটায় অর্থাৎ স্কুলের উত্তর দিকে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা জুড়ে এই হাট। এক কোণায় একটা টিউবওয়েল। একপাশে কতগুলো দোচালা ঘর। দোকানীরা সেখানে হরেক রকম সওদা নিয়ে বসেছে। আবার খোলা জায়গায়ও অনেকে দোকান সাজিয়েছে। একটা জায়গায় তেলে ভাজার ভিড়। পাশ দিয়ে ছোট মতন একটা খাল বয়ে গেছে। একটু উঁচু জায়গায় খুঁটিতে একটা খাসি বাঁধা রয়েছে। ওর সামনে কিছু ঘাস। বেচারা ভীষণ রকম ভয় পেয়েছে। ও কিছুই খাচ্ছে না। থেকে থেকে চিৎকার করছে। আর কয়েকজন কেনার লোক পেলেই ওটাকে জবাই দেওয়া হবে। ওই ভয়ে আধমরা জীবটা পাণ্ডুর চোখে তাকাচ্ছে।

সেদিন আমি ভাল করে জায়গাটা দেখতে পারি নি। দেখার মতন মনের অবস্থাও ছিল না। আজ দেখলাম ভাল করে। ওই টিউবওয়েলটা ছাড়িয়ে গেলেই কতগুলো দোকান ঘর।

নির্মলবাবু আমাকে চিনিয়ে দিচ্ছিলেন, 'ওই যে চায়ের দোকানটা দেখছেন, ওটা ভবর চায়ের দোকান। ওপাশে আরো একটা চায়ের দোকান আছে, ওটা আবার হাটবার ছাড়া খোলে না।'

আমি দেখলাম ভবর দোকানের সামনে দুটো বেঞ্চ পাতা। সেখানে লোকের ভিড়।

নির্মলবাবু বললেন, 'ভবর দোকানের এপাশে বনবিহারী সাউয়ের টেলারিং দোকান। ওপাশে মুদি দোকান, তারই লাগোয়া ওষুধের ডিস্পেন্সারী। তবে এখানে কোন পাস করা ডাক্তার-বদ্যি নেই।'

আমি বিস্মিত। ডাক্তার নেই, সে তো এক ভয়াবহ ব্যাপার! লোকের তো তাহলে দুর্গতির আর শেষ নেই! কত রকমের আধি-ব্যাধি। আজকের দিনে ধারে-কাছে চলনসই এক-আধজন ডাক্তার না থাকলে চলে? লোকে এভাবে দিনের পর দিন থাকে কি

করে? আমি সভয়ে বললাম, 'কাছে-ফিতে কোন ডাক্তার না থাকলে তো খুবই ভয়ের কথা।'

'ভয়ের কথা হলেও কিছু করবার নেই। তবে এখান থেকে মাইল সাত-আটেক দূরে, রুদ্রনগরে অবশ্য হালে একটা হেলথ-সেণ্টার হয়েছে। সেখানে দু-একজন নার্স আর ডাক্তার আছে। বিনি পয়সার ব্যাপার তো, ফলে কিছুই হয় না।'

'তবু রক্ষে।'

'হ্যাঁ, প্রথম ঠেকাটা চলে।'

আমি আবার শুধোই, 'কঠিন কোন রোগ-টোগ হলে লোকে তাহলে কি করে?'

প্রশ্ন শুনে নির্মলবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। হাসতে হাসতে কেমন নির্বিকার গলায় বলেন, 'কি আর করবে, মরে। সামর্থ্য থাকলে নদীর ওপারে কাকদ্বীপ, কি সহরে নিয়ে যাওয়া হয়।'

'সে তো আরো ঝকমারি ব্যাপার!'

নির্মলবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'একটা অবশ্য মজার ব্যাপার আছে। কাকদ্বীপ থেকে একজন ডাক্তারবাবু এখানে আসেন। তবে মাসের মধ্যে দুদিন, বড় জোর তিনদিন।

'এ আসা না আসা তো সমান।'

'তা বললে কি হয়, তবু লোকের ভিড় কমে না। ডাক্তারবাবু কি আর এখানে বিনা প্রয়োজনে আসেন, মোটেই তা নয়। এখানে ওঁর প্রচুর জমিজমা আছে। এলে জমি-টমিটাও দেখা হল, আবার কিছু পয়সাও পাওয়া গেল। এক কাজে দু-কাজ!'

'এ যে দেখছি রথও দেখা হল, কলাও বেচা হল, সেরকম গোছের ব্যাপার।'

'ঠিক তাই।' নির্মলবাবু হেসে উঠলেন হো হো করে।

আমিও হাসলাম। আমাদের এই হাসিতে অনেকেই সচকিত হল। কেউ কেউ আমাদের জুলজুল করে দেখছিল। কেউ কেউ

অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

নির্মলবাবু বললেন, 'মহাদেবদা ওখানে ওষুধ বিক্রী করেন। চলুন, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। লোকে আসলে ওঁকেই ডাক্তার বলে ভাবে। কিছু হলে ওঁর কাছেই আসে। প্রথম জীবনে নাকি একজন ডাক্তারের কাছে মহাদেবদা কিছুদিন কাজ করেছিলেন। ওই অভিজ্ঞতাটাই নাকি ওঁর জীবনে মোক্ষম কাজে লেগে গেছে।'

আমরা হাটে একবার চক্কর মেরে একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। নির্মলবাবু সেখান থেকে সিগারেট কিনলেন। টর্চের ব্যাটারি কিনলেন।

ওখান থেকে চলে আসতে আসতে বললেন, 'এই যে দোকানটা দেখলেন, এটা সুধীর জানার দোকান। একসময় ওরা নাকি খুবই গরীব ছিল, দুবেলা পেট ভরে খেতেও পেত না। আর এখন, প্রচুর টাকা। অনেক জমিজমা। কপাল ফিরে গেছে। ওর বাবা ধান-চালের কারবার করত। আসলে, বন্যার পরই নাকি ওদের দিনকাল পাল্টে গেল।' নির্মলবাবু এ পর্যন্ত বলে থামলেন। সিগারেট ধরালেন। দম নিলেন একটু সময়।

আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বন্যার পরে কি করে কপাল ফিরল?'

ধোঁয়া ছেড়ে নির্মলবাবু হাসলেন সামান্য, বললেন, 'হ্যাঁ, প্রায় কুড়ি বছর আগে এখানটায় এক ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল। দু-তিন দিন আগে থেকেই নাকি বৃষ্টি বাতাস সমানে চলছিল। বাতাসের মতিগতি বোঝা দায়। বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। নদীর জল ফুলছে! ফোঁস ফোঁস শব্দ ছুটে আসছে। একদিন গভীর রাতে বাঁধ ভেঙে গেল। তারপর জোয়ারের জল হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে গেল। চিৎকার চেঁচামেচি কান্নাকাটি। এক বীভৎস ব্যাপার। অনেক লোক সেবার মরেছিল। সেই বন্যার কদিন আগে থাকতেই ওর বাপ 'পঞ্চানন জানা, বুদ্ধি করে মাটির

নিচে ধান-চাল লুকিয়ে রেখেছিল। দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় চাপলে যা হয়। তারপ্রর জল যখন একসময় সরে গেল, লোকের তখন আর কিছুই নেই। রাস্তার ওপর, ক্ষেতে খানা খন্দে অনেকেই মরে পড়ে আছে। অনেককে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! কারো কারো টাকা-কড়ি লোকজন সবই গেছে। মাথায় হাত দিয়ে বসল। সর্বনাশ হয়ে গেছে। জমিতেও নোনা জল ঢুকে সেবারের ফসল নষ্ট করে ফেলেছে। ঠিক সেই সময়ই পঞ্চানন লোকের বিপদ বুঝে সামান্য ধান-চালের বিনিময়ে অনেকের কাছ থেকেই জমিজমা লিখিয়ে নিয়েছে। এই হল ওদের অবস্থা ফেরাবার ইতিহাস।' নির্মলবাবু সিগারেট টানতে টানতে আস্তে আস্তে কথাগুলো বলে গেলেন। কি ভেবে যেন নিজের মনেই হাসেন একটু।

আমি বললাম, 'এ যে দেখছি ভয়ঙ্কর লোক।'

'বড় লোক কি আর এমনিতেই হওয়া যায় অরুণাংশুবাবু, হওয়া যায় না। কারো সর্বনাশ করতেই হবে।' নির্মলবাবু এবার জোরে জোরে হাসলেন। হাসিটা কেমন তির্যক মনে হল আমার কাছে। ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছিলেন। একটু পরে তিনি আবার বললেন, 'তবে মরবার সময় লোকটা নাকি হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে মরেছে। শেষের দিকে মাথারও ঠিক ছিল না।'

আমি চুপ করে আছি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দূরে চাপ-চাপ অন্ধকার। আকাশে মেঘও রয়েছে। ফাঁকা জায়গায় বাতাস যেন আরো দামাল। দূরের প্রান্তরে গাঢ় অন্ধকার। আমি একবার পেছনে তাকালাম। এখানে ওখানে বাতি জ্বলছে; গ্যাস বাতি, লম্ফ, হ্যাজাক। কার্বাইডের গন্ধ নাকে আসছে। বেশ দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে পাঁচমিশেলি এক গন্ধ মগজে ঢুকে যাচ্ছে। আমাদের দেখে বনহারী হাঁক দিল, 'এদিকে একবাব আসবেন নির্মলদা।'

নির্মলবাবু দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বললেন, 'মহাদেবদার ওখানে বসছি, এস।'

বনবিহারী তবু ছাড়বে না। এগিয়ে এল, বলল, 'আজ স্কুলে নাকি দারুন ব্যাপার হইচে? ধীরেনবাবু খুব চেঁচামেচি করেঠে। আচ্ছা, কেষ্টবাবু ভেবেচেটা কি, ভাল না লাগলে ছাড়িয়া দিলে হয়।' এক নিশ্বাসে বনবিহারী কথাগুলো বলে গেল। একটু দম নিয়ে ফের বলল, 'না না, এভাবে তো অনেকদিন চলেঠে। 'এবার আর তা চলতে দেওয়া হবে নি। স্কুলের জমিজমার ভার কেষ্টবাবুর ওপরই বা থাকবে কেনি? গোবর্ধন তো কিছু কিছু আমাদের কইচে।'

নির্মলবাবু সামান্য হাসেন। হাসতে হাসতে বলেন, 'ওই লোকটির তোমরা কিছুই করেত পারবে না। ও আমার বোঝা হয়ে গেছে।'

'দেখবেন পারি কিনা।' বনবিহারী এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রথম দিনেই আপনার ক্লাসে সাপ ঢুকেছিল শুনেছি।'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'আপনারাও শুনে ফেলেছেন?'

'আমাদের কানে সবই চলে আসে মাস্টারমশায়। ওদের মধ্যে কয়েকটি যা ঘুঘু আছে না! একটু সাবধানে মিশবেন। নির্মলদা সব জানেন।'

নির্মলবাবু বললেন, 'মহাদেবদার ওখানে বসছি, পার তো এস।'

'একটু চা খাবেন না? নতুন মাস্টারমশায়ের সঙ্গেও তেমন আলাপ হল না!'

'হবে। উনি থাকবেন এখানে।' নির্মলবাবু হেসে ফেলেন।

আমরা চলে এলাম ওখান থেকে। আমার কাছে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লেগেছে। স্কুল সম্পর্কে এরা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় কৌতূহলী। ওরা সব খবরই রাখে। আমার ক্লাসে সাপ ঢুকেছিল, এটাও এখানকার মস্ত এক খবর। ধীরেনবাবু কি নিয়ে চেঁচামেচি করেছেন, তাও দেখলাম এদের জানা। আমি নির্মলবাবুকে বললাম,

'আজ সকালে যা ঘটেছে, এরা দেখছি সেই খবরও রাখে।'

'একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকা, খালি ঘোঁট পাকানো।'

আমরা এসে মহাদেববাবুর দোকানে দাঁড়ালাম। ভিড় ছিল। একটা টুলের ওপর হ্যাজাক বাতিটা বসানো। কিছু পোকা আলোটার চারদিকে ভন ভন করে ঘুরছে। মহাদেববাবুর মুখে পান। আমাদের দেখে পানের পিক ফেলে হাসতে হাসতে বললেন, 'বসুন।' দুটো চেয়ার এগিয়ে দেন।

নির্মলবাবু আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মহাদেবেবাবু বললেন, 'আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। সেদিন তো এদিক দিয়েই গেলেন।' পরে একটা ছোট ছেলেকে বললেন, 'এই, ভবকে কইবু ত, তিনটা চা দিতে।' আমাদের দিকে চেয়ে আবার হাসলেন। বললেন, 'আপনারা গল্প করুন, আমি আছি। আগে লোকগুলোকে ছেড়ে দিই নির্মলবাবু।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের আগে ছাড়ুন।'

মহাদেববাবু একজন বুড়ো মতন লোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, গো গাঁও বুড়ো, তোর আবার কি হইল?'

'বাবু, পেটে বড় কষ্ট।'

'কির্‌কম কষ্ট?'

'পেটের ভিত্‌রে বইস্যা, কে যেন খালি খাম্‌চি মারেঠে।'

'অত তাড়ি-ফাড়ি আর খাবু নি।'

'না ত বাবু, আর খাই নি।'

মহাদেববাবু একটা ব্যারালগন ট্যাবলেট দিলেন, 'চার আনা।'

বুড়ো পয়সা দিল। বড়ি নিয়ে চলে গেল।

আর একজন মাঝ-বয়সী লোক এগিয়ে এল। একটা হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরেছে। ভীষণ যন্ত্রণা। কাতর গলায় বলল, 'ডাক্তারদা, আমার খুব মাথা ধরেচে, শীগ্‌গীর একটা কিছু কর।'

মহাদেববাবু ওকে দুটো এনাসিন বড়ি দিলেন।

'তোমার?' মহাদেববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'অনেকক্ষণ ধইর‍্যা গা গুলিচে।'

মহাদেববাবু ওকে একটা সিকুইল বড়ি দিয়ে বললেন, 'ঘরে যায়া -ায়া লুবু।'

'দাম কত?'

'চার আনা দে।'

আমি সবই লক্ষ্য করছিলাম। লোকগুলো পরম বিশ্বাসে ওষুধ নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে। কারো জ্বর-জ্বর, মাথা ব্যথা, তাকে কোসাভিল কি নোভালজিন্। কারো হয়ত সর্দি, ফাঁচ ফ্যাঁচ হাঁচি, তাকে ফরিস্টল, কাউকে ক্রোসিন; এমনি করে ওষুধ দিয়ে গেলেন মহাদেববাবু।

চা নিয়ে এল একসময়। আমরা আবার সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। সিগারেট টেনে টেনে আস্তে আস্তে চা খাচ্ছিলাম। মহাদেববাবু ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছিলেন।

এমন সময় অনাদিবাবু সেখানে এলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে হাত তুলে মিট মিট করে হেসে বললেন, 'নমস্কার মাস্টারমশাইদ্বয়।'

আমিও হাত তুলে বললাম, 'নমস্কার।'

'আরে, অনাদিবাবু যে, আসুন।' নির্মলবাবু একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

'না, আমি অনেকক্ষণ বেরিয়েছি, বসব না আর।'

'আপনি তো সব সময়ই ব্যস্ত।'

অনাদিবাবু তেমনি মিহিভাবে হাসতে হাসতে হাত কচলাতে কচলাতে বলেন, 'তা আমাদের তো মাস্টারমশায় বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করতে হয়, কত্তরকম সমস্যা। কি ভাবে কি করব, এসব অনেক চিন্তা-ভাবনা মাথায়। ও আপনি বুঝবেন না।'

'কেন, শ্বশুর বাড়ি আছি বলে বুঝব না ?'

'হেঁ হেঁ, কি যে বলেন।' পরে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমাদের হাট দেখলেন তো ?'

আমি কিছু না বলে হেসে ফেললাম।

অনাদিবাবু বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'এবার ফিরে গিয়ে গপ্প করবেন তো, গাঁয়ের চাষাভূষো কিছু লোক দেখে এলাম।'

আমি মৃদু গলায় বললাম, 'আমার সম্পর্কে হঠাৎ আপনার এমন একটা ধারণা হল কেন ?' আমি ওঁর চোখে চোখে চেয়ে আছি!

অনাদিবাবু বুঝেছেন, আমি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছি ওর প্রশ্নে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, 'রাগ করবেন না মাস্টারমশায়, রাগ করবেন না। এটা তো ঠিক কথা, আপনারা এসে আমাদের না হোক, আমাদের ছেলেগুলোর অনেক উপকার করেছেন। আপনাদের কদর এরা না বুঝুক, আমরা তো বুঝি।' অনাদিবাবু হেঁ হেঁ করে হাসেন।

নির্মলবাবু বললেন, 'একটা কথা বলব অনাদিবাবু, রাগ করবেন না ?'

'আরে রাম রাম, মোট্টেও রাগ করব না, বলুন মাস্টারমশায়, বলুন।'

'বলি কি, আপনার নামটা এবার পাল্টে ফেলুন।' নির্মলবাবু মুচকি মুচকি হাসেন।

'যাঃ, এটা আবার কি বলছেন আপনি!'

নির্মলবাবু আলতোভাবে ঘাড় কাত করে বলেন, 'ঠিকই বলছি, আপনার নাম হওয়া উচিত শ্রী বিনয়ভূষণ খাঁড়া।'

আমি হেসে ফেলেছি। ওদিক থেকে মহাদেববাবু হো হো করে হাসলেন।

অনাদিবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বললেন, 'এই দেখুন মাস্টারমশায়, আপনাদের সঙ্গে কথা বলে বলে কতটা রাত হয়ে গেল।' এগিয়ে

গিয়ে মহাদেববাবুর কাছে বললেন, 'চারটা এন্টারোকুইনল দিন তো।'

অনাদিবাবু তেমনি বিনয়ের ভঙ্গিতে হেসে চলে গেলেন।

মহাদেববাবু এবার জোরে জোরে হেসে উঠেছেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'খুব জোর বলেছেন নির্মলবাবু। মুখে ওই রকম মিষ্টি, আর বাইরে, বিদেশী মাস্টারমশায়দের নামে যা তা বলে। খুব বাজে লোক।'

একসময় নির্মলবাবুও উঠে পড়লেন। রাত হয়েছে। হাট আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে এল। আলোগুলো অন্ধকারে নাচতে নাচতে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি ঘরে ফিরে এলাম।

আট

আমি নিজেই চলে এলাম ভবর চায়ের দোকানে। আজ জায়গাটা ফাঁকা। দোকানেও ভিড় নেই। বাইরের বেঞ্চে দুজন মাত্র লোক চা খাচ্ছে। ওরা কথা বলছিল। আমাকে বারবার দেখছিল। আমাকে ওরা চেনে না। কিন্তু আমার চেহারা, পোষাক-আসাক ওদের কাছে একেবারে নতুন। ওদের চোখে খানিকটা বিস্ময়। আমি ওদের ঠিক চিনতে পারলাম না। আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। উঠে পড়লাম। সুধীর জানার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সিগারেট আর দেশলাই কিনে নিলাম। একপাশে কজন মাঝারী বয়েসের লোক বিড়ি বাঁধছে। কপা এগিয়ে গিয়ে মহাদেববাবুর ডিস্‌পেন্সসারীতে একবার উঁকি মারি। বন্ধ। বনবিহারীবাবুর দোকানও তখন পর্যন্ত খোলে নি।

আবার ভবর দোকানে এলাম। অনেকক্ষণ চা খাওয়া হয় নি। ভব নেই। অল্প বয়েসী একটি ছেলে। আমাকে দেখে হাসি হাসি লাজুক মুখে ছেলেটি বলল, 'আসুন স্যার।'

ওই দুজন লোকও সরে বসেছে। আমি ওদের পাশেই বললাম। ওদের মধ্যে একজন আমাকে বলল, 'মাস্টারমশায়কে আগে দেখি নি তো!'

'না, আমি কদিন হল এসেছি।'

'মাস্টারমশায়ের দেশ কুন্‌ঠি থাইল?' অন্যজন আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শুধোয়।

'আমি কলকাতা থেকে আসছি।' বলতে বলতে সিগারেট

ধরিয়ে নিই। কয়েকটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করি, 'তুমি আমাদের স্কুলে পড় না?'

ছেলেটি হেসে হেসে মাথা নাড়ে।

'তোমার নামটা যেন কি?'

'গোপাল।'

আমি খানিক পরে ফের বললাম, 'একটা চা, আর তোমার ওই একটা লাঠি-বিস্কুট দাও।' আমি চুপচাপ করে সিগারেট টানছি। আর ভাবছি, এই একরত্তি ছেলের ওপর দোকানটা ফেলে রেখে ওর বাবা কোথায় যেন গেছে। ছেলেটিও বেশ নিপুণ হাতে কাজ করে যাচ্ছে। কোন অসুবিধে হচ্ছে না। মনে হচ্ছিল, এসব কাজে ও বেশ অভ্যস্ত। আমি শুধোলাম, 'তোমার বাবা কোথায়?'

'আজ মুড়িগঙ্গার হাট ত, হাটে গেছু।'

আমার কেন যেন মনে হল, পড়াশুনোটা ওদের মুখ্য ব্যাপার নয়। কাজ সেরে-সুরে পরে লেখাপড়া। হয়ত এছাড়া কোন উপায়ও নেই।

আবার দুজন লোক এল। ওদের মুখ-চোখে উদ্বেগ। তাড়াতাড়ি করে দুটো চা দিতে বলল। ওরা বিড়ি টানতে টানতে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। চাষবাসের কথা।

ওদের একজনের নাম গৌরহরি কামিলা, অন্যজনের নাম অধর গুঁড়িয়া। ওদের চোখে-মুখে একধরনের অস্থিরতা। এখনো ঠিক ঠিক মতন চাষের কাজ আরম্ভ করতে পারে নি বলে ওদের মনে তেমন সুখ নেই। অধর গুঁড়িয়া ফুক ফুক করে বিড়ি টানছে। মাঝে মাঝে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। একসময় জিজ্ঞেস করল, 'কি হে গৌরহরিদা, চাষের কত্‌টা আগিচ?'

'কি আর আগিব রে ভাই, এই ত কদিন হইল জল হইচে। দিন কতক আগু কাখ্‌রি ফেলচি। তারপরে ত আদু জল-টল হয় নি। ওই ত সেদিন্যা কাখ্‌রিতলা অভাব পড়বে দেখ্যা, মন দুই হবে

খানের প্যাঁচকা পেলিলি। তারপরে ভাই আগুয়াচালা আরম্ভ করচি।' গৌরহরি আস্তে আস্তে বিড়ি টানে।

অধর যেন সামান্য অবাক হয়। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'আইজ মু কি আগুয়াচালা করবু গৌরহরিদা। জমিনে যে রুস্থুনিয়া পড়ে, আর পকার দৌরাত্ম্য বাড়ে। অত্ত তুঁতিয়া আর ঔষুধ কিনতে পইসা কাই পাবু। যত সব ভেল কোম্পানীর কারবার।'

আমি ওদের সব কথার অর্থ ধরতে পারছি না। ওদের মুখের দিকে অবাক হওয়ার চোখে তাকিয়ে আছি। আমি আবার সিগারেটে টান দিলাম। আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ছিলাম। ওরা আমার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল। একসময় গৌরহরি আমার চোখের দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, 'আপনাকে ত চিনলাম নি বাবু। এঠি যেন লয়া লয়া লাগচে?'

'হ্যাঁ, আমি এখানে নতুন এসেছি। এই স্কুলের টিচার।'

অধর গুঁড়িয়া আমার দিকে অপলকে চেয়ে আছে। আমার পরিচয় জেনে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'মাস্টারমশায় থাকব ত?'

আমি হেসে ফেললাম। আগের দুজন লোক উঠে পড়ল। ওদের অনেক তাড়া। ধোঁয়া ছাড়তে ছড়েতে বললাম, 'হ্যাঁ থাকব।'

'কাইবাবু বিশ্বাস হঠে নি মোটে। কত মাস্টার আইল আর কত যাইল।' অধর বলল।

গৌরহরি জিজ্ঞেস করল, 'মাস্টারবাবুর ঘর কুন জায়গায় গো?'

'কলকাতা।'

গৌরহরি চা খেতে খেতে বলল, 'বাবু তুমানে ত সহরের লোক, এঠি কি আর ভাল লাগবে? না আছে রাস্তাঘাট, না যাতায়াতের সুবিধা।'

আমি মৃদু হাসলাম। সিগারেট দু আঙুলের ফাঁকে ধরে রেখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলাম। 'আপনারা এখানে কোথায় থাকেন?'

'আমান্‌কের কথা কওঠ ত মাস্টারবাবু! আপনার স্কুলের পাশের গাঁয়ে। এই চাঁপাতলা সাপখালি।'

আমি চুপ করে থাকলাম। আস্তে আস্তে চা খাচ্ছি। ওরা আবার নিজেদের মধ্যে কথা শুরু করল। অধর বিড়িটা অনেক ছোট করে এনেছে। আরো কয়েকটা টান মেরে গৌরহরিকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এ বছর জমিতে কি সার দুব ঠিক করচ?'

গৌরহরি একটু সময় চুপ করে কি যেন ভাবল। পরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'ভাই কবছর ত পরপর ইউরিয়া সুফলা দিয়া দেখ্‌লি। প্রথমে ত গাছগুলা হালি মক্‌মক্ করর‍্যা লম্ফ ঝম্ফ দিয়া প্রচুর ফসল ফলি দিল। আর অখন দেখিঠি, পরপর ফসল কমিয়া আইসেঠে। তাউ ভাবচি, এবছর গোবর সারের উপ্‌রে নির্ভর করব। যা বল ভাই, গোবর সারের মতন অতবড় উৎকৃষ্ট সার অখনো তৈরী হয় নি।'

অধর বিড়িটা ফেলে দিল। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিল। মুচকি হেসে বলল, 'তবে তুমি গোমাই সার দাও, আর যাই দাও, ফসলটা একসাথে বার্‌কি লিতে হইলে, থোড়্‌ আসার আট-দশ দিন আগে আন্দাজ মত কিছু কিছু সুফলা ছড়ি দিতে হবে। তাইলে দেখবু, ফলনটা ভাল পাব।'

গৌরহরি কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না, বলল, 'তাউ করলে হবে।'

অধর গুঁড়িয়া আমার দিকে আবার তাকাল। হাসল একটু। আমার চোখে-মুখে ওদের কথা শোনার আগ্রহ দেখে ও জিজ্ঞেস করে, 'কি শুনঠ গো মাস্টারবাবু!'

গৌরহরিও হাসল, 'আমান্‌কের চাষ আবাদের কথা শুনেঠে।'

আমিও হাসতে হাসতে বললাম, 'শুনতে খুব ভাল লাগছে।'

গৌরহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চুপ করে কি ভাবল একটুক্ষণ। মুখের ওপর মলিন একটু ছায়া। আস্তে আস্তে বলল,

'ভাল আর লাগবে কি মাস্টারবাবু। আগে এই সমস্ত জায়গায় কি প্রচুর ফলন ফল্‌ত। দশ মন বার মন ধান ত হাসতে হাসতে পাইতি বাবু। আর অখন আড়াই মন তিন মনের বেশী হয় নি বাবু।'

অধরেরও পুরনো দিনের কথা যেন মনে পড়ে যায়। মুখের ওপর পাতলা এক বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে। তারও বুকের গভীরে যেন এক দীর্ঘশ্বাস জমে আছে। একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'সেই আগেকার দিনগুলা হঠাৎ কাই যে দেখতে দেখতে মিলি গেল, বুঝতেই পারি নি। খাল বিল পুকুর মাছে মাছে ভরতি, ঘরে ধান, দুধও থাইল তত, কোথায় যে সেসব দিন চলিয়াল, সেইসব কথা কইলে মাস্টারবাবু ভাববেন, গপ্প শুনাঠে।'

গৌরহরি বিড়িটা টান দিতে গিয়ে দেখে নিবে গেছে। টুকরোটা ফেলে দিল। খানিকটা চা খেয়ে ওকে সমর্থন করে সে বলল, 'ও যা বলেঠে, ঠিক কথা কঠে মাস্টারবাবু। অতটুকু বাড়্‌ই কয় নি। অখন সেইজন্য লোকের মন-মেজাজ ভাল নেই। খাইতেও কতকগুলা হইচে এখ এখ ঘরে। বাজার মূল্যও বাড়িচে। এতে আর মন-মেজাজ কি ভাল থাকবে মাস্টারবাবু।'

অধরের চোখে-মুখে যেন দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনায়। একটু বিষণ্ণ গলায় বলল, 'তারপর চাষবাসের জায়গাগুলা চারধার নু পরপর ছোট হয়্যা আইসেঠে, প্রতিবছর যদি গাঙ ধারের বাঁধ লাড়া হয়, একশ দেড়শ বিঘা কর‍্যা চাষের জায়গা গাঙ খাইতে থাকে, তা হইলে আর লোকে বাঁচবে কি কর‍্যা!'

গৌরহরি চা খাওয়া শেষ করে গ্লাসটা একপাশে সরিয়ে রাখল। তার চোখে-মুখেও একধরনের দুশ্চিন্তা। বেজার গলায় বলল, 'আগের বছর ত জল হইথল নি বল্যা ইন্দ্র পূজা করলি, এবছর আর তত জল হইল কাই, যেত্‌কি কি তেত্‌কি।'

'ইন্দ্র পূজা কেন!' আমার কণ্ঠস্বরে সামান্য বিস্ময়। আমি ওদের মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম খানিকক্ষণ। এ সম্পর্কে আমার

কোনরকম অভিজ্ঞতাই নেই। আমার চোখের সামনে যেন একে একে অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জমিই ওদের প্রাণ। জমিতে ফসল না হলে এদের মনে কোন সুখ নেই, শান্তি নেই। এই এদের স্বপ্ন।

গৌরহরি আবার বলল, 'আমান্‌কের দেশে চলন আছে, জল নেই হইলে আগেকার লোক সব ইন্দ্র পূজা করত। ঐ ঠাকুরকে পূজা করলে নাকি দেশ ব্যাপিয়া প্রচুর বর্ষা হয়।'

অধর বলল, 'ও পূজা ত আর এক-আধ জনের দ্বারা সম্ভব নয়। দশ-বারখানা গাঁয়ের সমস্ত গরীব দুঃখী বড়লোক, মাস্টার পণ্ডিত যাই যত আছে, সক্কলের কাছ নু কমের কম, বেশীর বেশী চাঁদা লিয়া এই পূজা হয়। পূজায় প্রচুর খরচা। একশখানা লাঙল, সতীর ছেলে আগেই লাঙল ধরবে। সেই লাঙল চালিলে তবে ত পেছনের হালগুলা চলবে। একশটা গাই একসাথে দুইতে হবে। একশটা আইবুড়ো মায়্যা-ঝি একসাথে শাঁখ বাজিবে। সে আর কি কইব মাস্টারবাবু। বামুন ঠাকুরের কাছে ফর্দ করলেই চক্ষু চড়ক গাছ।'

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল ওরা। আবার বিড়ি ধরিয়ে নিল। চা খাওয়া হয়ে গেছে। ওদের আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। এখন সময়ের ভীষণ কদর। এখন আর ওদের কোন দিকে তাকাবার অবসর নেই। চাষের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের চোখে ঘুম নেই। কত রকমের ঝামেলা। চিন্তায় চিন্তায় মাথাটা যেন ভারী হয়ে থাকে। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অধর বলল, 'কি আর কইব বাবু, অখন আমানে ত প্রায় রিলিফ-মুখো হয়্যা পড়্‌চি। তাউ আবার রিলিফ লিতে হইলে মেম্বারবাবু-মন্‌কে পায়েও ধরতে হয়। ঘুষও দিতে হয়। উলুখড়ের দড়িটা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হইত। তার উপ্‌রে ফাউ আরো কত কি আছে!

'এখানেও ঘুষ!'

গৌরহরির মুখে ম্লান একটু হাসি ফুটল। বলল, 'নেই ঘুষ দিলে যাচিয়া কে রিলিফ দিবে বাবু! তাউ দিয়াও অনেকের বেলায় ফাঁকা।'

আমি শেষ কটা টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলাম। আমার গলায় কৌতূহল। শুধোলাম, 'কি কি দেয় রিলিফে?'

'আগে আগে চার কেজি গম বা আটা দিত। টকাছানাগুলাকে জামা-প্যাণ্ট আর কাউকে ধুতি শাড়ি দিত। তবে ওদের ভিত্‌রে মেম্বারগুলাই বেশী মার‍্যা লিত। তার জন্য কত কেস্‌ কাচারি হইচে মেম্বারবাবুদের নামে!'

অধর বলল, 'সে অনেক ব্যাপার মাস্টারবাবু।'

ওরা আবার নিজেদের কথায় মন দিল।

গৌরহরি বলল, 'এই সন প্যাঁচ্‌কা বেন্‌টা ভাল হইচে নি!'

'তুমার ত দাদা কিছু হইচে, আমার ত গটাটা পকায় খাইচে।'

'কিনতে হবে আর কি!'

'সে ত কিনতেই হবে। কিন্তু এ বছর ত খুব দাম বাড়ছে।'

আমি ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্যাঁচকা কি?'

ওরা আমার কথা শুনে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'মাস্টার-মশায়, এ আমাদের চাষবাসের কথা গো। বুঝবেন না। কাদা জমিতে গজাধান বুনলে যে চারা হয়, তাকে কয় প্যাঁচকা বেন্‌, আর শুকনো জমিতে আস্তধান বুন্‌লে হয় কাখ্‌রি বেন্‌। এগুলাই জমিতে রুইতে হয়।'

ওরা বেলার দিকে তাকাল। তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ল। অধর বলল, 'দূর্‌, কথায় কথায় বেলা অনেক হইচে। বিকাল বেলায় একটা প্যাঁচ্‌কাতলা ফেলিতে হবে।'

'আমাকেও ভাই ওবেলা কচুবেড়িয়ার হাট যাইতে হবে, কিছু পুঁইখাড়া আর খেসারি ডাল লিয়াস্‌তে হবে। চাষের লোকগুলাকে খাইতে দিতে হবে ত।'

'আর বুস্‌ব নি বাবু, অনেক কাজ।' বলতে বলতে উঠে পড়েছে ওরা।

অধর বলল, 'দামটা লেখিয়া রাখবু, বুঝ্‌চু?'

গোপাল মাথা নাড়ে।

ওরা খানিকটা মাথা নুইয়ে হাত জোড় করে বলল, 'আজ যাই মাস্টারবাবু।' আর দাঁড়াল না ওরা।

গোপাল আমাকে চা আর বিস্কুট দিল।

এমন সময় সুদর্শনবাবু এল। আমার দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে শুধোয়, 'মাস্টারমশায় যে, ভাল আছেন?'

'আরে আসুন, আসুন। আপনি তো আর এলেনই না!'

সুদর্শনবাবু আমার পাশে বসল। হেসে হেসে বলল, 'সময় পাই নি।'

'চা খান।' পরমুহূর্তেই গোপালের চোখে চোখে চেয়ে বললাম, 'আরো একটা চা আর বিস্কুট দাও।'

'না, বিস্কুট লাগবে নি, শুধু চা।' সুদর্শনবাবু তাকাল একবার।

আমি বললাম, 'নিন, সিগারেট নিন।'

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুদর্শনবাবু বলল, 'আপনার ক্লাসে প্রথম দিনেই সাপ ঢুকেছিল?'

আমি চা খেতে খেতে মৃদুভাবে হাসলাম। বললাম, 'খবরটা দেখছি খুব রটে গেছে?'

'তা, গাঁয়ের সবাই জেনে গেছে।'

'বলুন, আমি একদিনেই খুব বিখ্যাত হয়ে গেছি!' আমি হাসছিলাম।

গোপাল চায়ের গ্লাসটা এগিয়ে দিল।

সুদর্শনবাবু চা খেতে খেতে বলল, 'এখন আর সাপ কি, সাপ ছিল আগে। তখন সাপ-কাটিতে এখানে অনেক লোক মরত।'

'সাপকে আমার ভীষণ ভয়।'

'আমাদেরও ভয় করে; তবে ওরাও আমাদের ভয় পায়।' সুদর্শনবাবু খল খল করে হাসে। ফুক ফুক করে সিগারেট টানে। ধোঁয়া ছাড়ে। চায়ের গ্লাসে চুমুক দেয়। মনে মনে কি যেন ভাবে। তারপর আমার দিকে চেয়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলে, 'সাপের কথা যখন উঠল, তখন একটা গল্প শুনুন।'

'বলুন, আপনার সেই মজার গল্পই তো এখনও শোনা হল না।'

সুদর্শনবাবু, আরো খানিকটা চা খেয়ে বলতে শুরু করল, 'তখন এসব জায়গা পুরোপুরি জঙ্গল, জঙ্গল মানে ভয়ঙ্কর জঙ্গল। একটু একটু করে পরিষ্কার করা চলছে। আমার ঠাকুর্দা সেই দলে ছিল। ঠাকুর্দার মুখেই আমার এসব শোনা।' সুদর্শনবাবু আমার দিকে তাকায় একবার। কি ভেবে ম্লান একটু হাসে। সিগারেট টানে। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করে, 'সকালে খেয়ে-টেয়ে রোজ যেমন বেরোয়, সেদিনও ঠাকুর্দারা জঙ্গল সাফ করতে বেরিয়েছে। সেই দলে তখন আরো কজন নতুন লোক এসেছে। সবার হাতেই বড় বড় দাউলি। ওরা জঙ্গল কাটছিল। নজর সব সময়ই সজাগ। যখন তখন বিপদ লাফিয়ে পড়তে পারে। ওদের মধ্যে হঠাৎ একজন চেল্লাতে শুরু করল। কি ব্যাপার! সবাই কেমন ভয় পেয়ে গেল। দারুণ ভয়! চেয়ে দেখে বিরাট এক সাপ। তারিণী সাউ সাপটার খুব কাছে। বিশাল ফণা তুলে ওদের তাক করছে। হেলছে দুলছে। বুকের রক্ত জল হয়ে যাওয়ার দশা। ওরা যে-যার মতন দাঁড়িয়ে গেছে। একটু নড়লেই তারিণীকে ছোবল বসাবে। হঠাৎ তারিণী বুদ্ধি করে—।' সুদর্শনবাবু আমার দিকে চেয়ে হাসল। গ্লাসের বাকি চা-টুকু শেষ করল। গ্লাসটা রেখে দিয়ে মনের সুখে সিগারেট টানল। আমার চোখে-মুখে বিস্ময়। শোনার তীব্র আগ্রহ। আমার মনে হল, আমি যেন দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখছি।

সুদর্শনবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে আবার বলতে শুরু করে, 'বুঝলেন,

ওদের সাহসই ছিল বেশী। আমরা তো ভাবতেও পারতাম না। ঠিক সেই অবস্থায় তারিণী আচমকা সাপটার লেজের দিকে দাউলিটা ছুড়ে মারল। পলকে সাপটা ঘুরে গেল। প্রচণ্ড আক্রোশে ওই দাউলির গায়ে ছোবল মারল সাপটা। ফোঁস ফোঁস শব্দে বুকের ভেতরে কাঁপুনি ধরে। সে সাপও কি সোজা সাপ! আমার ঠাকুর্দারা হতবাক। কিন্তু তার আগেই চোখের নিমেষে তারিণী ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষিপ্র গতিতে ডান হাত দিয়ে কি করে যেন সাপটার মুখের কাছটা ধরে ফেলেছে। সবাই হই হই করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাপটাও ওর হাত জড়িয়ে ফেলে চাপ দিচ্ছে। তারিণীর চোখ বড় বড় হয়ে এল। চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরিয়ে আসবে। সাপটা কেবল মোচড় দিচ্ছে। বাঁ হাত দিয়ে পাক খুলবার চেষ্টা করছে। পারছে না। ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। অথচ ছাড়াও যাবে না। আমার ঠাকুর্দারা যেন হঠাৎ চেতনা ফিরে পেল। টেনে টেনে তারিণী সাউ ওদের বলল, 'তুমানে চুপ কইর‍্যা আছঠ কেনি? প্যাঁচটা খুলবু ত।' ওদের যেন হুঁস হল। ও প্যাঁচ কি আর সহজে খোলা যায়!'

সুদর্শনবাবু এ পর্যন্ত বলে আবার দম নিল কিছুক্ষণ। সিগারেটটা শেষ করে ফেলে দিল! আমাকে দেখল একটুক্ষণ। কি ভেবে হাসল! পা দোলানি তখনো ওর থামে নি।

আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। সিগারেটের কথাটা আমি যেন ভুলে গেছি। ওটা আমার দু আঙুলের ফাঁকে পুড়ছিল। হঠাৎ খেয়াল হল। টুকরোটা আমিও ফেলে দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কি হল?'

'তারপর আর কি হবে, অনেক কষ্টে ওর প্যাঁচ খুলেছে। একজন এসে গলার কাছটা দাউলি দিয়ে কেটে ফেলল! কিন্তু তারিণী সাউ সে-হাত নিয়ে নাকি অনেকদিন ভুগেছিল।'

'সাহস আছে বলতে হবে!'

'সাহস না থাকলে কি আর এখানে এসে ওরা এভাবে জঙ্গল

কাটে।' সুদর্শনবাবু সামান্য সময় চুপ করে থেকে আবার বলে, 'সাহস না দেখিয়েই বা ওরা কি করবে! এখানে একবার এসে পড়লে কি আর কেউ ফিরে যেতে পারত? পারত না। হয় জঙ্গল সাফ কর, করতে গিয়ে মর, না হয় খেতে না পেয়ে মর। পালাবার কোন রাস্তা নেই। সুতরাং, বাঁচা এবং মরা দুটোই সেদিন ওদের কাছে সমান ছিল।'

আমি অবাক হয়ে শুধোই, 'কেন, পালাতে পারত না কেন? ইচ্ছে না থাকলেও এখানে থেকে মরতে হত?'

'তাছাড়া কি, মরা ছাড়া সেদিন আর কোন পথ ওদের সামনে খোলা ছিল না। জঙ্গলে কত রকমের জন্তু-জানোয়ার সব ঘুরে বেড়াচ্ছে! জলে কুমীর, কামট। ডাঙ্গায় বাঘ বরা, বুনো মোষ। সাপ-টাপ তো আছেই। কখন যে কার কবলে কে পড়বে, কেউ জানে না। এসব দেখে-টেখে ভয় পেয়ে কেউ যে পালাবে, তারও উপায় নেই। জমিদারের নায়েবের জিম্মায় থাকত সব নৌকো। একবার টের পেলে আর রক্ষা নেই। পাইক বরকন্দাজ দু টুকরো করে জলে ফেলে দেবে, টেরও পাবে না কেউ।' সুদর্শনবাবু সেদিনের কথা বলতে গিয়ে নিজেও যেন রোমাঞ্চ বোধ করছে। একদিন কিভাবে যে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোকে তার অতীত বংশধররা বশে এনে প্রথম জনপদ তৈরী করেছিল, সেসব কথা মনে করে, আজও যেন ওর বুকের ভেতরটা কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। কত লোক যে সেদিন এখানে মরেছে! সেসব কথা মনে হলে তারও কেমন কষ্ট হয়। যারা জীবন দিয়ে এসব দুর্ভেদ্য জঙ্গল কেটে একদিন এই বসত তৈরী করল, তাদের কথা আজ সবাই ভুলে গেছে। এই-ই হয়। পুরনো দিনকে কেই বা আর ধরে রাখতে চায়। লাভই বা কি! এগিয়ে চলাই তো জীবন। দিনে দিনে কত কি পাল্টে গেল, পাল্টে যাচ্ছে। একদিন এখানে স্কুল ছিল না, স্কুল হয়েছে। দেশ বিদেশ থেকে এখন কত শিক্ষিত লোকজন আসছে। টিউবওয়েল ছিল না, হয়েছে।

রাস্তাও পাকা করা হচ্ছে। একদিন এখানে বাস চলবে। আলো আসবে। আরো কত কি! এসব ভাবতে ভাবতে বুকের ভেতরটা ওর আবেগে ভরে ওঠে।

আমি ওকে আবার একটা সিগারেট দিলাম। নিজেও একটা ধরিয়ে নিই।

সুদর্শনবাবু সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে টানতে টানতে বলল, 'আর ওই যে বটতলার নদী দেখলেন, সেদিনের তুলনায় এটা নাকি এখন একটা খাল। সাঁতরে যে ওপারে পালিয়ে যাবে তারও উপায় ছিল না। নায়েবের কাছে কাকুতি মিনতি করেও কোন লাভ হত না।' সুদর্শনবাবু চুপ করে কি যন ভাবে একটু সময়। সামান্য অন্যমনস্ক দেখায়। সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছে! একটা দীর্ঘশ্বাস ফলে খানিকক্ষণ পরে আমার দিকে তাকাল। ম্লান হেসে বলল, 'যারা মরল, তারা তো মরলই, আর যারা বেঁচে থাকল, তারাও জমি পেল না শেষপর্যন্ত। ওই নায়েবই সব গ্রাস করল। টাকা খেয়ে খেয়ে নতুন লোক নিয়ে এল। চড়া দরে জমি বিক্রী করল।' আবার চুপ করে থাকে সুদর্শন। তার মুখের ওপর বিষণ্ণ এক টুকরো ছায়া। ওর ভেতরে কিসের এক দুঃখ যেন ঘন, ভারী হয়ে উঠছে। খানিকক্ষণ পরে ফের বলল, 'বুঝলেন, আমার ঠাকুর্দাও এখানে একদিন ভাগ্যের খোঁজে এসে পড়েছিল। দেশের বাড়িতে বেঁচে থাকার মতনও কিছু ছিল না। বাপের ভিটেছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে এসেছিল। এখানে এসে বুঝেছিল, বেঁচে থাকাটা কত কঠিন ব্যাপার। ঠাকুর্দার মুখে এসব শুনতে শুনতে আমার ভয় হত। অবাক হয়ে যেতাম। আমার ঠাকুর্দার ভীষণ সাহস ছিল!' সুদর্শনবাবু সিগারেটে টান দেয়।

ভাবতে ভাবতে আমার চোখেও যেন কেমন এক ঘোর নেমে এসেছে। সত্যিই, সেদিনের সেই দিনগুলো কী ভয়েরই না ছিল! একবার এখানে এসে পড়েছ কি, ফিরে যাওয়ার আর পথ নেই! সামনে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি। এগোতেই হবে। আশ্চর্য,

এই মানুষের কাছেই একদিন আদিম অরণ্য মাথা নোয়াল, পরাজয় স্বীকার করল। আজো হয়ত, এই অরণ্য-দোসর সমুদ্র নদী ফোঁস ফোঁস করে সেদিনের প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু মানুষের সঙ্কল্প আরো দুর্জয়। আমার কেন যেন মনে হয়, সেদিনের এই জীবন-ব্রতই অরণ্যের অন্ধকারকে শেষপর্যন্ত জয় করতে পেরেছে। কিন্তু মানুষ, মানুষের নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা জয় করতে পারল না। তা না হলে, যে ক্ষুধিত সংগ্রামী মানুষের দল এখানে একদিন নতুন জনপদের গোড়া-পত্তন করল, তারাই আজ সবচেয়ে বঞ্চিত, নিঃস্ব আর লাঞ্ছিত!

সুদর্শনবাবু যেন এখনও সেই অতীতের অস্পষ্ট আলো-আঁধারির মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। সেসব দিনের কথা বলতে তার কোনরকম ক্লান্তি নেই। সিগারেটে টান দিয়ে একটু নড়েচড়ে বসে মৃদু হেসে বলল, 'একবার নাকি একটা ঘটনা ঘটেছিল। তখন এদিকটার জঙ্গল কাটা চলছে। ঠাকুর্দা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ-ঘটনাটা ভুলতে পারে নি। কতবার যে সে-গল্প আমাদের শুনিয়েছে! কুঞ্জ ধাওয়া হাওড়া আমতা-টামতার দিকের লোক। নায়েবেরই লোকজন গাঁয়ে-গঞ্জে ঘোরাঘুরি করত। সুযোগ বুঝে লোকজন ধরে ধরে এখানে নিয়ে আসত। এমনি করেই লোকটা নাকি একদিন এখানেএসে পড়েছিল। দেশে ওর বাপ মা, বউ, ছেলেমেয়ে ছিল। এখানে এসে আর ওর মন টেকে না। ঘরের জন্যে বুকের ভেতরটা খালি হু হু করে। এখানে ওর ভাল লাগে না। এ সে কোথায় এল, এই ভাবনাতেই সবসময় ওর মন বেজার হয়ে থাকে। জঙ্গল কাটায় মন বসে না। মনের মধ্যে ভয় জমে থাকে। আমার ঠাকুর্দার কাছে কান্নাকাটি করে। কিন্তু কি হবে! বেরোবার পথ বন্ধ।' সুদর্শনবাবু বলতে বলতে থেমে যায়। এ কাহিনী শোনাতে গিয়ে সেও যেন কষ্ট বোধ করছে। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে ধীরে ধীরে সে বলল, 'জানেন, ঠাকুর্দার মুখে যতবার এ-গল্প শুনেছি, ততবারই দেখেছি ঠাকুর্দার গলা ধরে এসেছে, চোখ ছল ছল করেছে। আমাদেরও মন খারাপ হয়ে যেত।'

আবার চুপ। আমার চোখে-মুখে অদম্য এক কৌতূহল। উদগ্রীব হয়ে আছি।

সুদর্শনবাবু মলিনভাবে হাসল একবার, বলল, 'ওর নিয়তিই ওকে এখানে টেনে এনেছিল। দেশে ওর বউ ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে সে কি কাকুতি! কত হাতে পায়ে ধরা। কিন্তু সেই পাষাণ মন কি আর সহজে গলে! গলল না। ভীষণ এক অসহায় অবস্থা। আমার ঠাকুর্দা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করত। ও কি আর তা বোঝে? একদিন মরীয়া হয়ে ও এক অসম্ভব কাজ করে বসল!' সুদর্শনবাবু সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। ভেতরে ভেতরে সেও যেন এক অস্বস্তি বোধ করছে। কপালে ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা। মুখের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিল।

আমি দেখলাম গোপালও হাঁ করে কথা শুনছে। উনুনে সোঁ সোঁ করে জল ফুটছে। সেদিকে ওর কোন খেয়াল নেই।

সুদর্শনবাবু ওর দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছে, 'কিরে গোপ্‌লা, খুব মজা, না?'

গোপাল লজ্জা পেয়েছে। সে উঠে এসে কেটলিতে আরো খানিকটা কাঁচা জল ঢেলে দিল। গ্লাসগুলো নিয়ে গিয়ে গরম জলে ধুয়ে নিল।

সুদর্শনবাবু একটা হাই তোলে। কিছুক্ষণ পর আবার যেন একটু গম্ভীর হয়ে একসময় বলতে শুরু করল, 'বুঝলেন মাস্টারমশায়, লোকটা সেদিন আর কাজে গেল না। কারো সঙ্গে কোন কথা বলল না। সন্ধ্যের পর কাজ-টাজ সেরে এসে আগুন জ্বালিয়ে আমার ঠাকুর্দারা অনেকক্ষণ গল্প গুজব করল। খাওয়া সেরে ওরা একসময় ঘুমোতে গেল। কিন্তু ওই লোকটার চোখে ঘুম এল না। দেখতে দেখতে রাত বাড়ে। সারাদিন ওরকম কাজের পর ওরা তখন অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। মানুষের আর কোন সাড়া শব্দ নেই। দূরে জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের হুংকার ভেসে যায়। ঘরের আশেপাশে রাতের বিভীষিকরা ঘুরে

বেড়ায়। আকাশে তখন বোধহয় অগুনতি তারা মিট মিট করে জ্বলছে। ওই লোকটা একসময় বাইরে এল, হাতে একটা দাউলি। পা টিপে টিপে যেখানে নৌকোগুলো আছে সেখানে এল। অন্ধকারে চেনা যায় না। ও একটা নৌকো বের করে নিয়ে এল। খাল ধরে অনেকটা গেলে তবে বড় নদী। সবে খানিকটা গেছে, অমনি বুকফাটা এক চিৎকার, আরো অনেকগুলো নৌকো নিয়ে কারা যেন ছপ ছপ শব্দ করতে করতে এগিয়ে যায়। বাতাসে গলা ভেসে আসে, কে পালায়, কে পালায়! মশাল জ্বলে ওঠে। কুকুরের ঘেউ ঘেউ চিৎকার। বনের সব পাখি পশুরাও তখন জেগে গেছে। ছোটাছুটি, পাখির ঝটপটানি। একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। আমার ঠাকুর্দারাও তখন জেগেছে। কুঞ্জ ধাওয়া শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে গেল। আর একটুখানি গেলেই ও বড় নদীটায় পড়ে যেত, তখন আর ওকে ধরতে পারত না কেউ। স্রোতের টানে ভেসে চলে যেত। কিন্তু—।' সুদর্শনবাবু যেন সামান্য ক্লান্তি বোধ করছে। একটানা অনেকক্ষণ বলে গেছে। আরো একটুক্ষণ জিরিয়ে নিল। পরে বলল, 'সবই নিয়তি, বুঝলেন মাস্টারমশায়।. এখানকার মাটি ওকে ছাড়ল না! বাতাসে আর্তনাদ ভেসে বেড়াল। সে-রাত্রেই ওই নায়েবের লোক ওকে টুকরো টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দিল। পরের দিন সকাল হলে ওরা বলল, 'আহা রে, পালাতে গিয়ে বেচারা কুমীরের পেটে গেছে।'

আমি আর্তনাদ করে উঠেছি। গলার স্বরটা আমার কেমন বেসুরো হয়ে গেল। আমি অস্ফুট গলায় বললাম, 'শেষে মেরে ফেলল লোকটাকে?'

সুদর্শনবাবু কেমন ঠাট্টার গলায় বলল, 'ওদের কাছে এসব জীবনের কি দাম? কোন দাম নেই! এ আর কি একটা ঘটনা, এমনি আরো কত ঘটনা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমরা আর কটা জানি।'

আমার মুখে আর কোন কথা নেই। এইমুহূর্তে কেন যেন

আমার বার বার মনে হচ্ছিল, এমনি করেই কি যুগে যুগে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে! গুমরে গুমরে মরে! এই অবিচারের কি শেষ হবে না কোন কালে? আমার বুকের ভেতরটা গুম গুম করতে থাকে।

আমরা আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। আমার কানে যেন এখনো সেই গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। আর্তনাদ ছোটাছুটি করছে। থেকে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

সুদর্শনবাবুকে ক্লান্ত, বেদনার্ত দেখাচ্ছে।

এলোমেলো বাতাস বয়ে যাচ্ছে! আকাশের এক কোণায় কালো হয়ে মেঘ জমেছে।

সুদর্শনবাবু ধীরে ধীরে নিজেকে একসময় সেই অতীত থেকে বর্তমানে ফিরিয়ে এনেছে। আবার স্বাভাবিক হয়ে এল যেন। আমার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'দিন, একটা সিগারেট দিন। খেয়ে চলে যাই। মনে হচ্ছে, আজ আবার বৃষ্টি আসবে, ঠাকুর কোণায় যেরকম মেঘ করেছে।'

আমি সিগারেট দিলাম।

সুদর্শনবাবু সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আজ উঠি মাস্টারমশায়, পরে আরো শুনবেন।' একটু চুপ করে থেকে সিগারেট টানতে টানতে ধোঁয়া ছাড়ে। পরে ফের বলল, 'এখন তো চাষের কাজ শুরু হবে, কিছুদিন ব্যস্ত থাকব। আর আপনাদের স্কুলও তো এখন মাস খানেক চাষের বন্ধ থাকবে!'

আমি অবাক চোখে চেয়ে থাকি।

সুদর্শনবাবু হাসে, 'হ্যাঁ মাস্টারমশায়, এখানে চাষের জন্যে ছুটি থাকে।' আর অপেক্ষা না করে সুদর্শনবাবু চলে গেল।

আমিও চায়ের দাম দিয়ে উঠে পড়ি। আজ আমার কাছেও যেন এক নতুন পৃথিবী ধরা দিল। ওই লোকটার জন্যে আমারও এখন খুব কষ্ট হচ্ছিল। এ জায়গার সঙ্গে কি এক রহস্য যেন আজো

জড়িয়ে আছে। আজো কি বিপদ-আপদ এখানে কিছু কম! তবু মানুষগুলোর বুকে যেন কোন ভয়ডর নেই। আমিও একটু একটু করে এ জায়গাকে ভালবাসতে শুরু করেছি। এখন আর আমার খারাপ লাগছে না।

নয়

ঘুম ভাঙতে আমার একটু দেরিই হল আজ। পণ্ডিতমশায় আমাকে ডেকে তুললেন। স্কুল বসার সময় হয়ে গেছে। আমি ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। খোলা জানলা দিয়ে ভেজা স্যাঁত-স্যাঁতে বাতাস ঢুকছে ঘরে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিচে নেমে এলাম। আকাশ দেখে ধরার উপায় নেই বেলা কত হয়েছে। আকাশের রঙ কালচে। তখনো ধূসর মেঘের ছুটোছুটি। শোঁ শোঁ করে চটকা বাতাস ছুটে যাচ্ছে। বেশ জল হয়েছে। স্কুলের লাগোয়া যে ঢালু জমি, সেখানে জল। মাঠ ক্ষেত সব জলে ভরা। কদিন থেকেই চাষের কাজ শুরু হয়ে গেছে । এখন যেন পুরোদমে আরম্ভ হল! ছপ ছপ শব্দ। ছেলে বুড়ো জোয়ান সবাই মাঠে নেমে পড়েছে। বউ ঝি-রাও বাদ নেই। এ যেন এক নতুন ছবি! আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকলাম। এত বৃষ্টি কখন হল! গতকাল সন্ধ্যের পর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। প্রথমে খুব জোরে! পরে ঝির ঝির করে। আবার তোড়ে। এমনি করেই সারারাত ধরে আকাশ গলে গলে পড়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিয়েছিলাম। অন্ধকারের মধ্যে বাদলার বাতাস গোঁ গোঁ শব্দে ছুটে বেড়াচ্ছিল। এর মধ্যেই একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হেড-মাস্টারমশায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। আমাকে দেখে একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই উঠলেন নাকি?'

আমি সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। মৃদু হেসে বললাম, 'বুঝতেই পারি নি যে এত বেলা হয়ে গেছে।'

'বুঝবেন আর কি করে। আকাশ তো কাল থেকেই মেঘে

ঢাকা পড়ে আছে। ভোরের দিকেও তো খুব একচোট বৃষ্টি হয়েছে।'

'কিছুই টের পাই নি।'

'ঠিক আছে, আপনার এত তাড়াহুড়োর দরকার নেই। চা-টা খেয়ে ধীরে সুস্থে এলেই হবে। আজ বোধহয় আর ক্লাস-টাস হবে না। এখনো তো একটাও ছেলেমেয়ে আসে নি।'

'এই জলে কাদায় ওরা আসবে কি করে মাস্টারমশায়!'

হেড-মাস্টারমশায় আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'জলে কাদায় ওদের কোন অসুবিধে হয় না। আসলে, চাষের কাজ শুরু হয়ে গেছে তো! এখন এমনিতেও আর ওরা খুব একটা স্কুলে আসবে না।'

আমি হেড-মাস্টারমশায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম একটু সময়। হয়ত আমার মুখে-চোখে কোন প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। এর আগেও সুদর্শনবাবু আমায় বলেছে, এখানে চাষের সময় স্কুল ছুটি থাকে। লম্বা ছুটি। আমি তখন কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারি নি। আসলে এখানে যারা পড়তে আসে, তারা অধিকাংশই গরীব ঘরের ছেলেমেয়ে। ওদের রুজি-রোজগার, আশা-আকাঙ্খা ওই জমিটুকু ঘিরে। ওখানেই ওদের স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ। এটাই ওদের কাছে সবচেয়ে বড়। এর জন্যে এরা সব কিছুই ছাড়তে পারে। সারা বছরের মধ্যে এসময়টা ওদের কাছে খুবই জরুরী। এখানে কোন রকম অবহেলা চলবে না। ছেলেমেয়েদেরও চাষের কাজে নামতে হয়। কতরকমের কাজ থাকে।

হেড-মাস্টারমশায় বললেন, 'এখানে প্রায় একমাস চাষের ছুটি থাকে।'

মুচকি হেসে বললাম, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু তখন ঠিক বুঝি নি।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হেড-মাস্টারমশায় ফের বললেন, 'এবার বর্ষাটা যেন একটু আগেই এখানে শুরু হয়ে গেল।'

আমি চুপ করে থাকলাম। এসব হিসেব আমার জানা নেই। কলকাতায় কখনই বর্ষার এই সমারোহ আমার চোখে পড়ে নি। পড়ার কথাও নয়। গুমোট গরমের পর হঠাৎ হঠাৎ করে বর্ষা নামে। রাস্তায় জল জমে যায়। নালা নর্দমা একাকার। বাস ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকের দুর্গতির আর শেষ নেই। নোংরা জলের ওপর দিয়েই হাঁটা-চলা করতে হয়। গা ঘিন ঘিন করে। কখনো কখনো গলির মুখের জল আর সরতেই চায় না। রাস্তা ঘাটের আর শ্রী-ছাঁদ থাকে না। আবার সেই ভ্যাপসা গুমোট। সেই ছটফটানি। বৃষ্টি আসে। আবার সেই দুর্ভোগ। এমনি করতে করতেই বর্ষা যে কখন শেষ হয়ে যায়, টেরও পাই না। কলকাতায় ঋতুচক্রের এই খেলা বড় অদ্ভুত। কেমন খেপাটে ধরনের। এখানে কিন্তু বর্ষার অন্য চেহারা। বিশাল দিগন্ত বিস্তার আকাশ। কখনো ধূসর, কখনো ঘন কালো। কখনো কখনো আকাশটা যেন মাটির কাছাকাছি নেমে আসে। অন্ধকার ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। ঝন ঝন করে বজ্রপাত হয়। অঝোরে বৃষ্টি পড়ে। শোঁ শোঁ করে বাতাস ছুটে যায়। মেঘে মেঘে মৃদংগ বাজে। মাঠে মাঠে চাষের কাজ শুরু হয়। ভিজতে ভিজতে ওরা গান গায়। একটার পর একটা গল্প বলে যায়, কত রকমের সব গল্প। ওদের বুকের ভেতরে একটু একটু করে স্বপ্ন তৈরী হয়।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। এরই মধ্যে আকাশটা যেন আরো ঝুঁকে এসেছে। জলের ধারে ধারে কিছু বক দেখা যাচ্ছে। চিলগুলো আরো নিচে নেমে এসে চক্রাকারে ঘুরছে। ব্যাঙ ডাকছে। চোখ সরিয়ে এনে আমি হেড-মাস্টারমশায়ের মুখের দিকে তাকালাম। শুধোলাম, 'আপনি তো ছুটির সময় এখানেই থাকবেন ?'

'হ্যাঁ, এবার আর যাব না, এই তো কদিন আগে কলকাতা থেকে

ঘুরে এলাম। বোর্ডে কাজ ছিল, ইণ্টারভিউটাও সেরে এলাম।'

'এখন তাহলে নতুন টিচার কেউ আসছেন না?'

'না, সেই ছুটির পরে। দুজনকে তো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট-লেটার পাঠিয়ে দিলাম। কবে ওরা জয়েন করবে, তাও লিখে দিয়েছি। এখন এলে হয়!'

'ওরা কি মাস্টারমশায় জানে যে এখানে এরকম একটা নদী আছে, নদীটা ওদের পেরোতে হবে?'

'না, তা আর লিখি নি।' আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন তিনি।

'আমি তো নদী দেখে ভীষণ ভয়ই পেয়ে গেলাম। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল।'

'এই সময়টাই এখানে একটু খারাপ। নদী ঝড় জল সাপ-টাপের একটু ভয়। শীতকালটা কিন্তু খুব ভাল।'

আমি একটা ঢোক গিলে বললাম, 'নৌকোটা মাস্টারমশায় যেভাবে একটা দিকে হেলে পড়েছিল, আর একটু হলেই উল্টে যেত।'

আমার চোখ-মুখ দেখে হেড-মাস্টারমশায় হেসে ফেললেন, বললেন, 'আরে না। পাল খাটালে নৌকো একদিকে কাত হবেই। এতে নৌকোর গতি আরো বেড়ে যায়।'

'আমার তখন মুখ শুকিয়ে গেছে। রীতিমতন মাথা ঘুরছে৷ ওরে বাপস্, কি ঢেউ, কি ঢেউ।'

'প্রথম প্রথম এরকম একটু হয়ই। আমাদেরও হয়েছিল। এখন আর সেরকম ভয় করে না। থাকতে থাকতে আপনারও সয়ে যাবে।'

কথাটা হেড-মাস্টারমশায় মিথ্যে বলেন নি। প্রথম দিন তো আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চোখ ফেটে প্রায় জল চলে আসে। এ আমি কোথায় এলাম! শেষে কপালে এই ছিল! শেষপর্যন্ত দ্বীপান্তর বাস! চারপাশে নদীর ফোঁস ফোঁস শব্দ।

আমার কাছে এ একেবারে আলাদা জগৎ। বিচ্ছিন্ন, লুপ্ত কোন ভূখণ্ডের অধিবাসী। কিন্তু কদিন যেতে না যেতেই আবার সব ঠিক হয়ে গেল। নিঃসঙ্গতা কাটল। ভয়টাও এরই মধ্যে অনেক কমেছে। যেটুকু আছে, সেটুকু সাপের। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আচ্ছা মাস্টারমশায়, এই ঝড়-টড়ের দিনে নদীর জলও তো বাড়তে বাড়তে একসময় এখানে ঢুকে যেতে পারে।'

'পারে সবই। কিন্তু আমি তো এত বছরের মধ্যে এরকম দুর্ঘটনা একবারও ঘটতে দেখলাম না। শুনেছি, অনেককাল আগে নাকি এখানে একবার ভীষণ ফ্লাড হয়েছিল। জোয়ারের জল বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়েছিল। সে নাকি এক ভয়াবহ ব্যাপার। এর কদিন আগে থাকতেই ভীষণ ঝড়-জল হচ্ছিল। তবে বেশীক্ষণ জল দাঁড়ায় নি। ভাঁটার সময় আবার জল সরে গেল। তখন অনেক লোক মরেছিল। অনেক গরু বাছুর ভেসে গিয়েছিল।'

'এসব শুনলেই যে বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করে।'

'এ নিয়ে এত মাথা ঘামাবেন না তো!' হেড-মাস্টারমশায় আমার চোখে চোখে চেয়ে আবার হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখুন, দুর্ঘটনার কথা কি কেউ আর আগে থাকতে বলতে পারে? পারে না। কলকাতায়ও কি অ্যাকসিডেণ্ট কিছু কম! রোজই তো সেখানে কিছু না কিছু লোক ট্রাম বাস লরির তলায় চাপা পড়ছে, মরছে। বাসে বাসে ধাক্কা লাগছে। বাস উল্টে যাচ্ছে, ট্রাম রাস্তার ওপর উঠে যাচ্ছে। আকছার লোক মরছে। তার ওপর ছুরি বোমা, আরো কত কি! সে তুলনায় এখানে তো কিছুই নয়। যা কপালে আছে তা ঘটবেই।'

আমি মুচকি হাসলাম, 'অ্যাকসিডেণ্টের ব্যাপারে শহরের লোকের কিন্তু কোন হুঁস নেই। আসলে সারাক্ষণই উদ্দাম এক নেশা মানুষকে তাড়া করে ফিরছে। সামনে নানা রকমের প্রলোভন, বাধা। তাই আগে থাকতে কিছু বোঝা যায় না।'

'এখানে ঠিক তার উল্টোটা। সেরকম মনের খোরাক এখানে পাবেন না। এ ব্যাপারে আমার কিছু বলারও নেই। কেউ নিরিবিলি জায়গা পছন্দ করে, কেউ করে না। আমি যেমন কলকাতায় গিয়ে দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কোনরকমে কাজটা সেরেই পালিয়ে আসি। কারো আবার এই নির্জনতাই হয়ত অসহ্য মনে হতে পারে! কিন্তু নদী-টদীর ভয় ওসব বাজে কথা। ভয়ের কারণই নেই।'

'কেন, নদীতে কখনো নৌকো-টৌকো উল্টে যায় না?'

'সে কালেভদ্রে। আমার তো মনে পড়ে না, এর মধ্যে এরকম কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ, বছর দশ-বার আগে একবার একটা যাত্রী বোঝাই ডিঙ্গি-নৌকো উল্টে গিয়েছিল।' যেন কিছুই নয় এরকম অনাড়ষ্ট, নিশঙ্ক ভঙ্গি।

'লোক মরেছিল?' আমি চোখে চোখে চেয়ে থাকলাম।

হেড-মাস্টারমশায় মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ—, মরেছিল। মরবেই।' তিনি চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন একটু সময়। ওঁর মুখের ওপর ছিটেফোঁটাও ভয়ের চিহ্ন নেই। এ নিয়ে যেন খুব একটা ভাববারও কিছু নেই। এ ঘটনার কথা তো তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। কথায় কথায় আবার মনে পড়ল।

আমি কিন্তু এতটা নিস্পৃহ হতে পারলাম না। সপ্রশ্ন চোখে চেয়েই থাকলাম। হেড-মাস্টারমশায় আমার চোখে চোখে চেয়ে হাসলেন। পরে ধীরে ধীরে বললেন, 'দোষ আসলে লোকগুলোরই। ঝড়-জলের দিন। নদী তখন ফুলছে। সকাল থেকেই খেয়া বন্ধ। লোকগুলো কিছুতেই কথা শুনবে না। ওপারে ওদের যেতেই হবে। মামলার দিন পড়েছে। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে শেষপর্যন্ত লোকগুলো একটা ডিঙি-নৌকো ভাড়া করল। সেদিন আর ফেরার দরকারটা কি ছিল! কাকদ্বীপে থেকে গেলেই হত। সন্ধ্যের মুখে মুখে বৃষ্টিটা একটু কমেছে। বাতাসের পাগলামোও খানিকটা থেমেছে।

লোকগুলো আবার সেই ডিঙিতে উঠল। সবে মাঝামাঝি এসেছে। ব্যাস, অমনি একটা ঝড় উঠল। টাল সামলাতে পারল না মাঝি। ডিঙি উল্টে গেল। কেউই বাঁচল না, কোথায় যে ওরা ভেসে গেল!' কথা শেষ করে হেড-মাস্টারমশায় ঘড়ি দেখলেন। বেশ বেলা হয়েছে, আর কতক্ষণ তিনি অপেক্ষা করবেন! আশপাশের কয়েকটি ছেলে-মেয়ে এসেছে। মাস্টারমশায়রাও অনেকেই তখনো আসেন নি।

আমার চোখের সামনে তখন ওই ছবিটাই ভাসছে। নদীর কথা মনে হলে আমারও বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে। কি বিশাল নদী! নৌকো ডুবি-টুবি হলে আর রক্ষে নেই। কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে! হেড-মাস্টারমশায় আমার মুখ দেখে হয়ত কিছু একটা আন্দাজ করলেন। শেষে বললেন, 'এরকম দিনে না বেরোলেই হয়! অত সাহস দেখানর দরকারটা কি!'

আমি চুপ করে থাকলাম। পণ্ডিতমশায় কাছে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'আজ আর ক্লাস-টাস হবে না।'

'না, কি করে আর হবে।' হেড-মাস্টারমশায় ভীমকে ডাকলেন। ও কাছে এলে বললেন, 'এবার ঘণ্টাটা বাজিয়ে দাও।'

'আচ্ছা।' ভীম মাথা নেড়ে চলে গেল। একটু পরেই ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল।

'আমি যাচ্ছি।' হেড-মাস্টারমশায় চলে গেলেন। ক্লাসগুলো একবার করে ঘুরে এলেন। আবার ঘণ্টা পড়ল। ছুটি।

আকাশটা যেন দেখতে দেখতে আরো নিচে নেমে এসেছে। এবার বুঝি ধপাস করে পড়ে যাবে। মেঘে ঠাসাঠাসি। দূরে মাঠের দিকে বৃষ্টি নেমেছে। আস্তে আস্তে বৃষ্টিটা এগিয়ে আসছে। অন্ধকারটা যেন ধুয়ে মুছে সরে সরে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকলাম। এরকম ছবি তো এর আগে আর কখনো আমার চোখে পড়ে নি। পণ্ডিতমশায় খুশি খুশি গলায় বললেন, 'চলুন, আজ মাছ ধরব।' বলেই তিনি ওপরে উঠে গেলেন। ছেলেগুলোকে ডাকাডাকি শুরু করলেন।

দেখতে দেখতে বৃষ্টিটা একেবারে নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। থেকে থেকে এলোপাথাড়ি হাওয়াও ছুটে যাচ্ছে। বৃষ্টির ছাঁট এসে আমার গায়ে-মুখে লাগছে! দূর মাঠের মধ্যে লোকগুলো ভিজছে তো ভিজছেই। এতে যেন ওদের কোন কষ্টই হয় না। আশ্চর্য, রোদ ঝড়ে কোনটাতেই এদের ভ্রুক্ষেপ নেই। এমনি করেই ওদের শরীর মন শক্ত, মজবুত হয়েছে। এরা যেন কিছুতেই ভয় পায় না। সংসারের সব রকমের হলাহলই ওরা অম্লান বদনে পান করেছে। রোদে পুড়তে পুড়তে ওদের শরীর কালচে হয়ে গেছে, তবু এরা ক্লান্ত হয় না। দিনের পর দিন জলে ভিজে ভিজেও এরা ধৈর্য হারায় না। এমনি করেই ওরা মাঠের বুকে প্রাণ নিয়ে আসে। সবুজে সবুজে ভরিয়ে দেয়! এ কি সোজা কথা! এ সাধনার কি কোন তুলনা চলে! শিল্পীর তন্ময়তা, স্বপ্ন ওদের চোখে। কি এক নেশায় যেন ওরা বুঁদ হয়ে থাকে। কই, বাইরে থেকে তো বোঝাও যায় না, এতবড় এক মহাযজ্ঞের এরাই এক একজন পুরোহিত! এরাই জানে জীবনের আসল মন্ত্র। কোন প্রলোভন বা বৈভবের কাছে তো এরা ওদের স্বপ্নকে বেচে দেয় না! আমিও তো কখনো এভাবে ওদের দেখি নি, ভাবি নি। ওদের জন্যে এই মুহূর্তে আমারও বুকের ভেতরটা আবেগে, সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। আমি একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। ভিজতে ভিজতেই ওরা কাজ করে যাচ্ছে। এতে ওদের উৎসাহ যেন আরো বেড়ে গেছে। কাজের গতি আরো বেড়েছে। খুশিতে, আহ্লাদে ওরা নাচছে। এখানে এসে যেন আমার ধারণা একটু একটু করে বদলাচ্ছে। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি ওপরে ওঠে এলাম। আজ আর স্কুল হল না!

পণ্ডিতমশায় তখন গায়ে তেল মেখে নিচ্ছেন। ছেলেগুলোর ভেতরেও দারুণ উৎসাহ। খালি গা। কোমরে ওরা গামছা জড়িয়ে নিয়েছে। পণ্ডিতমশায় বললেন, 'আপনিও আমাদের সঙ্গে মাছ

ধরতে চলুন অরুণাংশুবাবু।'

'এই বৃষ্টিতে?'

'বৃষ্টিতেই তো মজা।'

অনিল হাসি হাসি মুখে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, চলুন।'

'ধরবে কি দিয়ে?'

'আগে চলুনই না।'

'ঠিক আছে যাচ্ছি, তার আগে যে আমাকে একটু চা খেতে হবে!'

'আমি যাচ্ছি স্যার ভবদার দোকানে।' অনিল যাওয়ার জন্যে পা তুলেছে।

আমি বাধা দিলাম, 'দাঁড়াও, বৃষ্টিটা আগে একটু ধরুক।'

অনিল হেসে ফেলল, 'আমাদের স্যার ভেজার অভ্যেস আছে।'

'তা হলে ছাতা নিয়ে যেও।'

'ছাতা কি হবে স্যার, ছাতা ফুটান যাবে না।' বলে আর দাঁড়ায় না অনিল!

পণ্ডিতমশায় নিচে নেমে গেলেন! যাওয়ার আগে বললেন, 'চা খেয়ে আপনি আসুন, আমরা যাচ্ছি।'

ছেলেরাও বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়েছে। দুটো কোদাল নিয়ে এসেছে কোত্থেকে।

অনিল বৃষ্টিতে ভিজেই চা আর বিস্কুট নিয়ে এল আমার জন্যে। গা বেয়ে টুপ টুপ করে জল পড়ছে। চা-টা রেখে গামছা দিয়ে ও গা-হাত-পা মুছে নিল। হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি কিন্তু আসবেন স্যার।' ও আর দাঁড়াল না। চলে গেল। ঘরে এখন আর কেউ নেই। এমন কি কানাইও ওদের সঙ্গে গেছে। আমি আস্তে আস্তে চা খেলাম। চা-টা তেমন গরম ছিল না। খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে হু হু করে জলো বাতাস ঢুকছে। বাইরে তখনো মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজলে মন্দ হয় না। ভেতরে

ভেতরে আমিও এক আবেগ বোধ করছিলাম। আমিও গায়ে সামান্য তেল মেখে নিলাম। গামছা জড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। ভিজতে ভিজতে ওদের কাছে এলাম। আমাকে দেখে ওরা খুব খুশি হল। পণ্ডিতমশায় হাসতে হাসতে বললেন, 'এই তো মানিয়েছে এবার।'

বলরাম আরো একটা কোদাল চেয়ে এনেছে। ওরা একটা নালা কাটছে। মাঠে বেশ জল জমেছে। স্কুলের উঠোনেও জল দাঁড়িয়ে গেছে। কখনো অনিল সুরেন, কখনো অর্ধেন্দু নারায়ণ, কখনো সরোজ অরবিন্দ, হিমাংশু এভাবেই ভাগাভাগি করে মাটি কোপাচ্ছে! বলরাম এসে যোগ দিল। কানাই মাটি সরাচ্ছে। পণ্ডিতমশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখিয়ে দিচ্ছেন। সরোজের কাছে এসে বললাম, 'কোদালটা একবার আমাকে দাও তো।'

'না স্যার, আপনি পারবেন না।'

'আরে, দাওই না।' বলে কোদালটা ওর হাত থেকে নিয়ে কয়েকটা কোপ দিলাম মাটিতে। ওরা যেন আরো উৎসাহ পেয়ে গেল। এরই মধ্যে আমি হাঁপিয়ে পড়লাম। পণ্ডিতমশায় হাসছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ও আপনি পারবেন না, চলে আসুন অরুণাংশুবাবু।"

ছেলেগুলোর যেন কোন ক্লান্তি নেই। নালাটা ক্রমশই গভীর হচ্ছে। ঢাল হয়ে নেমে আসছে। মাটি দিয়ে মাঠের জল আটকে রাখা হয়েছে। পুকুরটার কাছাকাছি ওরা চলে এসেছে। আমি তখনো কিছু বুঝতে পারছি না। এ কিরকম মাছ ধরা! এ যে নালা কেটে জল সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। এখানে মাছ আসবে কোত্থেকে! আমি পণ্ডিতমশায়কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি না মাছ ধরবেন বললেন!'

পণ্ডিতমশায় কিছু না বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু রহস্যের হাসি হাসলেন।

অনিল হাসতে হাসতে বলল, 'আর একটু পরেই স্যার দেখতে পাবেন।'

বৃষ্টির তোড়টা এখন কমেছে সামান্য। আকাশের অন্ধকারটা যেন অনেকখানি ধুয়ে গেছে। তখনো চটকা বাতাস গায়ে-মুখে এসে চিমটি কাটছে। ঘাস ফড়িং উড়ছে। বকগুলো এতক্ষণ মটকা-মেরে বসে ছিল। এবার গা ঝাড়া দিল। নিঃশব্দ পায়ে জলের কিনারে কিনারে ওরা হাঁটছে। বৃষ্টিটা কমতে কমতে একসময় একেবারেই থেমে গেল। মেঘ ডাকল। আমি মাথা শরীর মুছে নিলাম। আমার হাতে পায়ে কাদা লেগেছে। কোনরকম অস্বস্তি নেই। আমার খুব ভাল লাগছিল।

পুকুরের পাড়টা সামান্য উঁচু। কোণাটায় একটু ঝোপের মতন; ঝোপটা পরিষ্কার করছিল নারায়ণ। হঠাৎ পায়ের কাছ দিয়ে কি যেন একটা সরসর করে চলে গেল। এক পলক তাকিয়েই ও চিৎকার করে উঠল, 'সাপ!' বলেই ক পা সরে এল।

'সাপ? কাই কাই!' পণ্ডিতমশায় কাছে এগিয়ে গেলেন।

সবাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওরা দৌড়োদৌড়ি করে ঝোপটার কাছে এল। সুরেন ততক্ষণে একটা লাঠি নিয়ে এল কোথেকে। ঝোপটার গায়ে এলোপাথাড়ি লাঠি চালাল খানিকক্ষণ। বলরাম বলল, 'কি সাপ, কাই পালিল?'

নারায়ণের চোখে-মুখে আচমকা ভয়টা যেন তখনো থেমে আছে। বুকের ভেতরটা বুঝি ওর ধক ধক করছে। আর একটু হলেই হয়েছিল! একটু অবশ অবশ গলায় বলল, 'খালি লেজটা দেখতে পাইলি, বেশ মোটা, মিশমিশে কালো।'

'ইস্।' বলরামের মনটাই খারাপ হয়ে গেল। সাপটাকে একবার দেখতে পেলে হত। ভাবটা যেন এই, একবার চোখে পড়লে বাছাধনের আর পালাতে হত না। ওর খুব আফসোস হচ্ছিল। ওরা আবার আগের জায়গায় চলে এল।

আর সামান্য বাকি। পণ্ডিতমশায় খুশি খুশি গলায় সুরেনকে বললেন, 'সব ত হইলু, এখন যে একটা বাঁকি লাগবে!'

সুরেন মাথা চুলকায়। চাঁই সে কোথেকে আনবে! কার কাছে পাওয়া যাবে, তাও সে জানে না! চুপ করে থাকল।

পণ্ডিতমশায় একবার ভেবে নিলেন কোথায় ওকে পাঠান যায়। সোৎসাহে বললেন, 'তুই একবার বনা গায়েনের কাছে যা। আমার কথা কয়া বাঁকিটা চায়া লিয়াস্‌বু। ওখানে না পাইলে শশাঙ্ক মুনিয়ার কাছে গিয়া আমার নাম কইবু। ওর কাছে ঠিক পাবু। যা ত, একদৌড়ে যাবু আর আসবু।'

সুরেন চলে গেল। পেছল মাটির ওপর দিয়ে তর তর করে হাঁটতে ওর যেন কোন কষ্টই হল না। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'ও যে সত্যি সত্যিই দৌড়ে চলে গেল।'

পণ্ডিতমশায়ও হেসে ফেলেছেন। বললেন, 'ও ওরকমই। দেখুন না, চলে এল বলে। পড়াশুনোটাতেই ওর যা উৎসাহ নেই। তাছাড়া সব কাজেই ওর সমান আগ্রহ। রাত-বিরেতেও কোথাও ওকে যেতে বললে, ওর না নেই। ভীষণ সাহস ওর। হবে না কেন, ওর বাপও কি কম সাহসী নাকি!' এটুকু বলে পণ্ডিতমশায় চুপ করে গেলেন।

আমি ওর চোখে চোখে চেয়ে আছি। আমার মনে হল, একমাত্র আমি ছাড়া এখানের সবাই খুব সাহসী। না হয়ে উপায়ই বা কি! বুকে সাহস না থাকলে কি আর কেউ দিনের পর দিন এখানে বসবাস করতে পারে! দ্বীপের মুখটাতেই তো বিশাল সমুদ্র। পুরো জায়গাটা নদী দিয়ে ঘেরা। নদীও তো মাঝে মাঝে অশান্ত, বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যে-কোন সময় এটাকে ডুবিয়ে ফেলতে আর কতক্ষণ! নদীর খেয়ালের কথা আর কে বলতে পারে! মুহূর্তের মধ্যে মানুষের কত কীর্তি সে নাশ করে দেয়। নতুন করে আবার কত কীর্তি তৈরী করে! দ্বীপটা যেন একটা নৌকোর

মতন জলের ওপর ভেসে আছে। ঝড়, সাপ; নৌকো-ডুবি, এমনি আরো কতরকমের বিপদ যে এখানে আছে! কিন্তু কোন বিপদই ওদের কিছু করতে পারে না। পারবেও না। সহজে ওরা যে হার মানে না! ওদের চোখ-মুখে কঠিন এক শপথ, অঙ্গীকার। ওদেরই পূর্ব-পুরুষরা না একদিন এখানে এসেছিল! সে-দিনগুলো তো আরো ভয়ের, আরো অস্থিরতার! কত ভয়, কত বিপদ। কত ছলনা, ষড়যন্ত্র। ধীরে ধীরে সেই উদ্ধত, হিংস্র অরণ্যই একদিন মাথা নোয়াল মানুষের কাছে। সহজে কি আর হার মানতে চায়! এর জন্যে অনেক জীবন খোয়াতে হয়েছে। বেঁচে থাকাটা বোধহয় এরকমই কঠিন এক সংগ্রাম। এদের রক্তের ভেতর দিয়ে যেন ওই সংগ্রামেরই ধারা বয়ে চলেছে। এ লড়াইয়ের আর শেষ নেই। লড়াই করেই বাঁচতে হয়, বাঁচতে হবে। পণ্ডিতমশায়কে চুপ করে থাকতে দেখে শুধোলাম, 'ওর বাপের সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন?'

পণ্ডিতমশায় অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন আমার মুখের দিকে। তিনি যেন ভুলেই গিয়েছিলেন। আবার মনে পড়ল। মৃদু হেসে বললেন, 'বলছিলাম কি, ওর বাপেরও ভীষণ সাহস। ওরা মনসাতলায় থাকে। ওর বাপ মাঝে মাঝেই একটা ডিঙি-নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে বড় জোর আর একজন কি দুজন থাকে। স্রোতের টানে টানে কোথায় যে ওরা চলে যায়। একদিন দুদিন ফেরেই না। কাঠ পাখি মধু-টধু নিয়ে ঘরে ফেরে। কি নেশা বলুন তো!' আমার মুখের ওপর থেকে তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন। কি যেন ভাবলেন একটু সময়!

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই এ এক মস্ত নেশা। কাঠ, পাখি মধুর জন্যে ওরা দূর দূরান্তরে চলে যায়! এরকম লোকও তাহলে আছে!

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'এটাই যে ওদের জীবিকা। নদীর বুকে ছোট বড় এরকম অনেক জঙ্গল আছে। ওসব জায়গায় এখনও

বসত হয় নি। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভরা। নানারকমের পাখি, দামী গাছ পাওয়া যায় ওসব জায়গায়। জঙ্গলের নেশা বড় সাংঘাতিক নেশা। ওই নদীনালা সমুদ্র জঙ্গল যেন ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। বিপদও কি আর এক রকমের! জঙ্গলে ধূর্ত বাঘ, সাপ, জলে কামট। একবার হল কি জানেন? ওরা ফেরার সময় দিক ভুল করল। গভীর সমুদ্রে হারিয়ে গেল। একদিন গেল, দুদিন গেল, এমনি করে দিন কুড়ি পেরিয়ে গেল। আর ফেরে না। ঘরের লোকেরা কান্নাকাটি করল। আমরাও ভেবেছিলাম, ওরা আর ঘরে ফিরবে না কোনদিন। হয়ত সাপে কেটেছে, না হয় বাঘে খেয়েছে। তা না হলে নৌকো-ডুবি হয়েছে। আরো কয়েকটা ডিঙি-নৌকো কাঠ নিয়ে ফিরেছে, ওরাও কোন সঠিক খবর দিতে পারল না। এত দুঃসাহস ভাল নয়।' পণ্ডিতমশায় থামলেন। একটু দম নিয়ে ফের বললেন, 'এর মাস দেড়েক পরে হঠাৎ একদিন এসে ওরা হাজির। ভূত দেখার মতন আমরা তখন চমকে উঠেছি। ব্যাপার কি! ওরা পাখি-টাখি ধরে জোয়ারের মুখে ঠিকই নৌকো ছেড়েছিল। আসতে আসতে হঠাৎ অন্য স্রোতে পড়ে গিয়েছিল। একেবারে গভীর সমুদ্র টেনে নিয়ে গেল ওদের। শুধু জল আর জল। তার ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ওরা চলেছে তো চলেছেই। সঙ্গে যে চাল-ভাজা ছিল তা ফুরিয়ে গেল। মিঠে জলও শেষ হয়ে গেল। হাত পা অবশ, তাকাতে পারে না। দিন বার-তের পরে হঠাৎ ওরা একদিন দেখল, ওরা একটা জায়গায় পৌঁছেছে। কিছুই চেনে না। লোকগুলোর ভাষাও বুঝে না। ওই লোকগুলোই ঘরে নিয়ে গেল ওদের। খাওয়াল, কদিন ওদের কাছে রাখল। সাগর-দ্বীপের কথা, সাগর-মেলার কথা বলল। ওরা কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। ওরা অন্ধ্রপ্রদেশের একটা জায়গায় চলে গিয়েছিল। লোকগুলো খুবই ভাল ছিল। টাকা পয়সা দিয়ে ওরা একদিন এদের পাঠিয়ে দিল। ওই লোকগুলো তীর্থ করতে দু একবার এসেছিল। এদের

খোঁজ নিয়ে এখানে উঠেছিল। ভাষা না বুঝলেও একটা আত্মীয়তা হয়ে গেছে। এরপরও কিন্তু শিক্ষা হল না। এখনো মাঝে মাঝে ভিঙি নিয়ে চলে যায়।' পণ্ডিতমশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তখনো আমি অন্যমনস্ক। মাথাটা আমার ঝিম ঝিম করছে। চোখের সামনে যেন ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। লোকগুলোর কী সাহস! ভাগ্য ভাল ছিল বলেই বেঁচে গেছে। তা না হলে কি এভাবে কেউ বাঁচে! যেভাবেই হোক ওরা বেঁচে গেল। ওদের বুকে কোন ভয়ডর নেই। এখনো ওদের সমুদ্রের নেশা কাটে নি। হয়ত এ জীবনে আর তা কাটবেও না। বড় অদ্ভুত লোক তো ওরা!

এমনসময় অনাদিবাবু এসে আমাদের পাশে দাঁড়ালেন। একটু আগেই তিনি এসেছেন। তায় সই করলেন। হেড-মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হাতে একটা ছাতা। কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত তুলে নিয়েছেন। খালি পা। পায়ে কাদা। আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হেসে বললেন, 'এই বেশ মানিয়েছে মাস্টারমশায়। আপনি তো দেখছি বেশ কাজের লোক আছেন।'

কথাটা ওঁর প্রসংশা না খোঁচা, ঠিক বুঝতে পারলাম না। হালকাভাবে হেসে উঠলাম। একটু রসিকতার গলায় বললাম, 'অনাদিবাবু দেখছি প্রথম থেকেই আমাকে একটা অকম্মার ঢেঁকি ভেবে নিয়েছেন।'

অনাদিবাবু হেঁ হেঁ করে হাসলেন। কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললেন, 'আরে রাম রাম, আমি মোটেই কিন্তু তা বলি নি মাস্টারমশায়। আমি বলছিলাম কি, আপনি বেশ মিশে গেছেন আমাদের সঙ্গে। সহরের লোকের তো আর এসব অভ্যেস-টভ্যেস নেই।'

মুচকি হেসে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম, 'আমি কিছুই করছি না। ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি আর পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে গল্প করছি।'

'এই দাঁড়িয়ে থাকাটাই তো বড় কথা। এই তো চাই মাস্টারমাশয়। না, আপনি পারবেন, পারবেন এখানে থাকতে!' মাথা নেড়ে তিনি কথাগুলো বলে গেলেন। বিড়ি ধরালেন একটা। পণ্ডিতমশায়কেও একটা বিড়ি দিলেন। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে চোখ ছোট করে তিনি পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি অত গপ্প কর্‌থল ?'

'কি আর, সুরেনের বাপের কথা কইথ্‌লি।'

'শুনলেন তো মাস্টারমশায়। এ একেবারে মারে কেষ্ট রাখে কে, রাখে কেষ্ট মারে কে! তবে একটা কথা, সহরের লোকদের মতন আমরা এত ভীতু নই।' আবার সেই হেঁ হেঁ হাসি।

নালা কাটা শেষ। সুরেনও চাঁই নিয়ে হাজির। চাঁইটা জায়গা মতন বসান হল। এবার নালার ওদিকের মুখটা খুলে দেওয়া হয়েছে। তোড়ে জল নামতে লাগল। চাঁইয়ের ভেতর দিয়ে গিয়ে সেই জল পুকুরে পড়ছে। ছোট ছোট মাছ সেখানে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে শুরু করেছে। কাজ শেষ। এবার ঝপাং ঝপাং করে ছেলেগুলো পুকুরে লাফিয়ে পড়ছে।

অনাদিবাবু চলে গেলেন। আকাশটা আবার কালো হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি এল বলে। আমরা স্নান করে নিলাম। বেশ বেলা হয়েছে। খিদেও পেয়েছে। আবার বৃষ্টি নামল। খাওয়া দাওয়া শেষ করতে করতে আমাদের আরো ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল।

সুরেন আর অনিল নালার মুখটা মাটি দিয়ে আটকে দিল। বাঁকিটা নিয়ে এল। এরই মধ্যে অনেক মাছ চাঁইয়ের মধ্যে আটকে গেছে। ট্যাংরা, চেলা মাছ। ট্যাংরাগুলো লাফাচ্ছে। খুশিতে বুক ভরে গেল। পরিশ্রম সার্থক। মাছগুলো ঢেলে রেখে চাঁইটা আবার ওখানে রেখে দিয়ে এল। নালার মুখের মাটি সরিয়ে দিল। উজান ঠেলে ঠেলে মাছগুলো উঠে আসছে। এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম।

দশ

প্রায় তিন দিন এক নাগাড়ে বৃষ্টির পর আজ সকাল থেকেই আকাশ বেশ পরিষ্কার। চিড়বিড় করে সূর্য উঠেছে। সব কিছু যেন ঝকমক ঝকমক করছে। যা ময়লা ছিল, সব ধুয়ে মুছে গেছে। ফুর ফুর করে বাতাস বইছে। পাখি শিস দিচ্ছে। এরই মধ্যে মাটি খটখটে। জল পড়লেই আবার পেছল, কাদায় কাদাময়! নোনা মাটি, বাতাস লাগলেই শুকিয়ে যায়।

আজ রবিবার। তাড়াতাড়ি করে ঘুম থেকে ওঠার কোন তাগিদ নেই। যতক্ষণ খুশি ঘুমোতে পারি, বিছানায় গড়াগড়ি দিতে পারি, কেউ কিছু বলবে না। বলার মতন কেউ নেই এখানে। আমিই আমার সর্বময় কর্তা! কোন কিছুর তাড়া নেই এখানে। ঢিলেঢালা, মন্থর সময়। কখনো কখনো দীর্ঘ, ভারী বলে মনে হয়। সময় খরচ করার মতন উপকরণের বড় অভাব এখানে। কলকাতায় বন্ধু-বান্ধব, আড্ডার অভাব নেই! সব সময়ই একধরনের উত্তেজনা, হই-হল্লা লেগে আছে। সিনেমা পার্ক চায়ের দোকান, সব সময়ই লোকজনের কোলাহলে মুখর থাকে। রাস্তায় বেরোলেই চিৎকার, চেঁচামেচি। রঙ বেরঙের সাজ পোষাক। নানা ধরনের যুবক যুবতী। মনে হচ্ছিল, ওদের সঙ্গে যেন কতকাল আমার যোগাযোগ নেই! আমার বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জনেরা কি একবারও আমার কথা মনে করে?

আমাকে যেন আজ এক আলসেমিতে পেয়েছে। উঠি উঠি করেও উঠছি না। উঠেই বা কি হবে। কথা বলার মতন লোক

কোথায়? হেড-মাস্টারমশায়ের সঙ্গে এত আর কি কথা বলা যায়! দেখা হলেই তো তিনি স্কুলের সমস্যার কথা শুরু করবেন। এ আর কত শোনা যায়! ভারী ভারী কথা আর শুনতে ইচ্ছে করে না। নির্মলবাবু এলেও খানিকটা সময় কাটে। কার্তিকবাবু মানুষটিও বড় ভাল। মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে ছাড়েন না। অনাদি-বাবুকে বোঝা বড় মুশকিল। মুখে হাসি। কিন্তু কথাগুলোর মধ্যে যেন খোঁচা থাকে। সহজে তিনি রাগ করেন না। অন্যদের সঙ্গে এখনো খুব একটা ঘনিষ্ঠতা হয় নি। কেষ্টবাবুর ওপরে অনেকেই খাপ্পা। পেছনে অনেকে অনেক কথাই বলেন, সামনা-সামনি আবার অন্যরকম আচরণ। ধীরেনবাবু আর কার্তিকবাবুর সঙ্গেই ওঁর সম্পর্ক সবচেয়ে তিক্ত। লোকটিকে আমি এখনো বুঝে উঠতে পারি নি। এখনো আমার সঙ্গে ওঁর ভালভাবে আলাপ হয় নি। যতটুকু ভদ্রতা, ওপর ওপর। তবে লোকটি যে খুব সাদাসিধে, সরল গোছের, তা নয়। সবাই ওঁকে একটু-আধটু ভয় পায়। সামনে সমীহ করে। আড়ালে গালিগালাজ করে!

পণ্ডিতমশায় গতকাল বাড়ি গেছেন। ছেলেদেরও অনেকেই ঘরে গেছে। আজ অনেক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। গতকাল এগারটা নাগাদ অনিলের বাড়ি থেকে একটা খারাপ খবর এসেছিল। বেচারা মন খারাপ করে চলে গেল। এই প্রথম আমি জানতে পারলাম ও বিবাহিত। ওর বৌকে নাকি গতকাল ভোরের দিকে সাপে কেটেছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। অনিল যে বিয়ে করেছে, তা জানতাম না! প্রথমে পণ্ডিতমশায় একবার এরকম একটা কথা বলেছিলেন বটে! আমি ভেবেছিলাম, ঠাট্টা। এখন দেখছি তা নয়। ওইটুকু ছেলে, ক্লাস টেন-এ পড়ে, এরই মধ্যে ঘরে ডাগর-ডোগর বউ। তাজ্জব ব্যাপার! আমার বিস্ময় দেখে পণ্ডিতমশায় হেসে ফেলেছেন, বলেছেন, 'শুধু অনিল কেন, এরকম অনেক বাবা-জীবনই এখানে রয়েছে। বিয়েটা এখানে কচি-কাঁচা থাকতেই হয়ে যায়।'

থাকার মধ্যে কানাই, হিমাংশু, বলরাম আর সুরেন। ওরা পুকুরের পাড়ে জামা প্যান্ট কাচাকাচি করছে। হিমাংশুর হয়ে গেছে, ও এখন সেগুলো রোদে শুকোতে দিয়েছে। বলরামেরও প্রায় কাচা-কুচি শেষ। আর একটা জামা কাচা হলেই ওর হয়ে যায়। কানাই আর সুরেন তখন সাবান লাগাচ্ছে প্যাণ্টে, জামায়, বিছানার চাদরে। সাবান লাগিয়ে এক কোণায় ওগুলো জড়ো করে রেখে দিল সুরেন। জানলা দিয়ে সবই দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ওদের হাসি তামাসার ভাঙা, টুকরো-টাকরা কিছু কথা কানে আসছে। আমার আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হল না। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। এবার উঠে পড়লাম। নিচে নেমে এলাম। বেশ বেলা হয়েছে। রোদের দিকে তাকান যায় না। ঝাঁ ঝাঁ করছে। এমনসময় সুরেন এসে সামনে দাঁড়াল। হাসি হাসি মুখ। ও বলল, 'আপনার কি কি কাচতে হবে দিন স্যার।'

'আরে না, আমি নিজেই কাচব।'

'না স্যার, তা হয় না।'

'ধ্যাপ।' কৃত্রিম ধমকের ঢঙে চোখ পাকালাম।

'না স্যার, আমরা শুনবই না।' ও হেসে ফেলল।

'ঠিক আছে, সে তো পরের কথা আগে চা খাওয়াও তো।'

'তা আনতে আর কতক্ষণ।' সুরেন চলে গেল।

আমি হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে উঠে এলাম। এমনসময় সুরেন চায়ের গ্লাস আর বিস্কুট নিয়ে হাজির।

আমি অবাক, 'সে কি, এত তাড়াতাড়ি?'

'একটু পরে গেলে আজ আর চা হত না। ভবদা দোকান বন্ধ করব করব করছে। আপনার জন্যেই নাকি এতক্ষণ খোলা রেখেছিল। আজ তেমন লোকজন নেই ত?'

চায়ের গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললাম, 'বসো।'

সুরেন বসল না, দাঁড়িয়েই থাকল।

বিস্কুটের খানিকটা মুখে দিয়ে আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকলাম একটু সময়। আমাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ও লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়েছে। দেখে তো বোঝা যায় না, ওর বুকের ভেতরে এত সাহস! চোখে-মুখে তো সেরকম কোন রুক্ষতা নেই! চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, 'পণ্ডিতমশায়ের মুখে তোমার বাবার গল্প শুনলাম।'

সুরেন মুখ তুলল। মৃদু হেসে বলল, 'আমারও বাবার সাথে যেতে খুব ইচ্ছে করে।'

'তোমার ভয় করে না?'

'না।' ওর চোখেও যেন মুহূর্তে সেই দুর্জ্ঞেয় নেশা উঁকি মারে।

'আমি শুনলাম, তুমিও নাকি, ডিঙি নিয়ে ওই সব অচেনা জায়গায় যেতে চাও?'

'আপনি কি করে জানলেন?' সুরেন চোখে চোখে চেয়ে থাকল।

'পণ্ডিতমশায়ের মুখেই শুনেছি।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'বাবার মুখে গল্প শুনতে শুনতে আমারও নেশা ধরে যায়। বুকের ভিতরটা যেন কিরকম করতে থাকে। ছটফটানি বাড়ে। একদিন স্যার ঠিক চলে যাব দেখবেন।' কি ভেবে হেসে ফেলল সুরেন।

'এই মরেছে, কোথায় যাবে?'

'বাবা যেখানে যায়, সেই সাগরে। ওখানে আরো নাকি ছোট ছোট অনেক দ্বীপ, অনেক জঙ্গল আছে স্যার।'

'তুমি ওখানে গিয়ে কি করবে?'

'কেন স্যার, দেখব, কাঠ আনব, পাখি ধরব।' সুরেন চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, ওর চোখ-মুখ অন্যরকম দেখাচ্ছে। ওর চোখের সামনে যেন এখন সেই অচেনা সমুদ্রের রহস্য। সমুদ্র যেন ওকে হাতছানি দিচ্ছে। চোখে ঘোর। কি একটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ

আমাকে ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনি স্যার জম্বুদ্বীপের নাম শুনেছেন?'

আমি ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এসব জায়গার কোন অভিজ্ঞতাই আমার নেই। থাকার কথাও নয়। কোন দ্বীপেরই নামধাম আমি জানি না। কি করে জানব! আমি তো এই সাগর-দ্বীপের কথাও কদিন আগে পর্যন্ত জানতাম না। ছেলেবেলায় ভূগোলে দ্বীপের সংজ্ঞাটা শুধু পড়েছি। শেষপর্যন্ত এরকমই কোন দ্বীপে যে আমাকে চাকরি করতে আসতে হবে, তা তো তখন আমার জানা ছিল না! এখানে আসার পর তবু অনেক কিছু জেনেছি। খানিকটা অভিজ্ঞতা বেড়েছে। মাথা নেড়ে বললাম, 'না, শুনি নি তো। ওটা কোন্ জায়গায়?'

সুরেন বলল, 'আরো অনেক ভিত্রে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে হয়। সাহস না থাকলে ওখানে যাওয়া যায় না। আমার বাবা ওখানে দু তিন বার গিয়েছিল। সঙ্গে নগেন খুড়াও ছিল। একবার ত ওরা এক অজগরের ওপরেই বসে বিড়ি-টিড়ি খেয়েছিল।'

'অজগরের ওপর?'

'হ্যাঁ স্যার! কাঠ-টাট কেটে ওরা জিরচ্ছিল। আসলে ওটাকে একটা গাছ-টাছ ভেবেছিল! বিড়ির আগুন ঘষে ঘষে নেবানর সময় ওটা যেন একটু একটু করে নড়তে শুরু করল। আগুনের সেঁকা লেগেছে ত। টের পেয়ে একলাফে ওরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। খুব ঝটপট নৌকা ছেড়ে দিল।'

'আর ওসব জায়গাতেই তুমি যেতে চাও?'

'হ্যাঁ স্যার, ভীষণ ইচ্ছে করে।'

চা খাওয়া আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে দিয়ে বললাম, 'নৌকো বাইতে পার?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'পথ ঘাটও তো চেন না।'

সুরেন হেসে হেসে বলল, 'চিনে নেব। বাবা বলেছে, এবার একদিন আমাকে সাথে করে নিয়ে যাবে।' ওকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। এর মধ্যে কী যে সুখ আছে আমার জানা নেই। এসব জায়গায় যাওয়া মানে তো বিপদ ডেকে আনা। বিপদের মধ্যে কি যে এত মজা, তা ছেলেটাই জানে। আমার কাছে সবটাই কেমন দুর্বোধ্য এসব নেশার কী যে অর্থ ওরাই বুঝে। ওই ছেলেটার ভেতরেও এখন থেকেই নদীর নেশা। জঙ্গলের টান!

কথা বলতে বলতে আরো বেলা হল। ওর মুখের ওপর থেকে নেশাটা ধীরে ধীরে চলে গেল।

সুরেন এবার আগের মতন লাজুক চোখে হাসল, 'কি স্যার, জামা কাপড়গুলো দিন।'

অগত্যা ওকে একটা পাঞ্জাবী আর ধুতি দিতেই হল। গেঞ্জীটা আমি নিজে কাচব বলে রেখে দিলাম। ও চলে গেল।

আবার শুয়ে পড়লাম। কি করব! যাওয়ার মতন জায়গা কোথায়! আড্ডা দেওয়ার মতন লোকও নেই। রবিবারগুলো যেন আরো বেশী ফাঁকা লাগে। সময় আর ফুরোতে চায় না। সবাই প্রায় ঘরে চলে যায়। একদিন সমুদ্র দেখতে গেলে হয়। কপিল-মুনির আশ্রম এখান থেকে মাত্র তো আঠার মাইল। মকর সংক্রান্তিতে এখানে মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা এখানে এসে সাগরে ডুব দেয়। কথায় বলে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গা-সাগর একবার। কত সাধু-সন্ত এখানে আসে। মেলার কদিন আগে থাকতেই লোকের ভিড় হয়। তখন এখানে স্কুল ছুটি থাকে। আগে নাকি যাতায়াতের আরো অনেক অসুবিধে ছিল। তীর্থযাত্রীরা পায়ে হেঁটে বা নৌকোয় সাগরে যেত। মাঝে মাঝে নৌকো ডুবি হত। ঝড়-টড় উঠলে তো আর কথাই নেই। মেলার পরে এখানে মড়ক লাগত। তখন কত লোক যে ওলাওঠায় মরত! গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। কোন ডাক্তার নেই। ভয়ে লোক বাইরে

পর থেকে এখানের অনেক উন্নতি হল। রাস্তাঘাট তৈরী হল। টিউবওয়েল বসান হল। তারপর থেকেই মড়কটা কমল। শুয়ে শুয়ে আমি এসবই সাত-পাঁচ ভাবছিলাম।

এমন সময় ভীম এল জলের কলসী নিতে। হাসতে হাসতে বলল, 'আর কত ঘুমাওঠ, চান-টান কইর‍্যা খাও-টাও, বেলা হইচে।'

'আরে না, ঘুমোচ্ছি না।'

'খালি শুইয়া থাউ কেনি?'

'কি আব করি বল।'

'হঁ, যাবুটা আর কাই।'

'কি রান্না-টান্না করেছ?'

'একটা ডাল রান্‌চি, চিংড়ি মাছের টক, আলু বৈতালের ঘন্‌ট।'

'তোমার ওই ঘ্যাঁটটা এবার বন্ধ কর তো ভীম।'

'টকাগুলানকে মুরগী লিয়াস্‌তে কও।' ভীম হেঁ হেঁ করে হাসে।

'ওবেলা ডিম করবে তো।'

'আচ্ছা।' ভীম মাথা নাড়ে।

এমন সময় নিচে থেকে একটা চিৎকার ছুটে এল। সাপ!

'সাপ-কাটি হইচে।' বলেই ভীম জলের কলসীটা ফেলে রেখেই নিচে নেমে গেল।

আমারও বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। তাড়াতাড়ি করে নেমে এলাম। মুখ-চোখে আমার আতঙ্ক। কাকে আবার সাপে কামড়াল! হেড-মাস্টারমশায়ও ঘর থেকে ছুটে এলেন।

বাইরে এসে তো আমার চক্ষু স্থির! ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। মুখ শুকিয়ে গেল। গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোচ্ছে না। হেড-মাস্টারমশায় দূর থেকে চেঁচাচ্ছেন আর লাফা লাফি করছেন। বলরামের ওপর তিনি ভীষণ চটে গেছেন। এসব বেয়াদপ অসভ্য ছেলেকে এবার স্কুল থেকে দূর করে দেবেন। অত

সাহস দেখান কেন? এখন যদি কিছু একটা হয়ে যায়! তিনি হায় হায় করতে লাগলেন। চিৎকার শুনে আরো কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে। তারা বলরামের সাহস দেখে অবাক। কেউ কেউ আবার তারিফও করছে ওকে।

পুকুরের পারেই একটা বাবলা গাছ। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলরাম আর হিমাংশু কথা বলছিল। সামান্য দূরেই একটা দোয়েল পাখি। গলায় অদ্ভুত রকমের আওয়াজ। মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে পাখিটা, ঠোকর মারছে, আবার সরে আসছে। বলরামের হঠাৎ ওদিকে চোখ পড়ল। যা ভেবেছে, ঠিক তাই। ইয়া বড় এক কেউটে সাপ। সাপটা ঠোকর খেয়ে বারবার ছোবল মারছে মাটির ওপর। ওটা একটু যায়, আবার পাখিটা গিয়ে ঠোকর মারে। সাপটা ফোঁস করে ওঠে। বলরাম এক দৌড়ে এগিয়ে গেল। সুরেন ওরাও ছুটে এল। সাপটা তখন একটা গর্তের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে ফেলেছে। সবে খানিকটা গেছে। বলরাম হাতের কাছে কিছু না পেয়ে লেজটাকে ধরে ফেলল। পেছল শরীর। ফসকে ফসকে যায়। হাতে ধুলো মেখে নিয়ে ওটাকে ধরে টানা টানি করতে লাগল। আর সুরেনকে একটা লাঠি আনতে বলল।

সাপটাও কিছুতেই আর ভেতরে ঢুকতে পারছে না। বলরামও ওটাকে টেনে বাইরে আনতে পারে না। সুরেন একটা লাঠি নিয়ে এল। গর্তের মধ্যে কয়েকটা খোঁচা দিতেই ওটা যেন আরো মরীয়া হয়ে গেল। বলরাম আরো খানিকটা টেনে এনেছে। সুরেন আরো কয়েকটা খোঁচা লাগাল। বলরাম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তুমান্নে সকলে সরিয়া যাউ।'

আরো কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সাপটাকে বের করে আনল। মুখটা থেতলে গেছে। ওই অবস্থাতেই মাথা তুলতে চায়। সাপটা কি বিরাট, মোটা আর কুচকুচে! দেখলেই বুকের ভেতরটা ভয়ে হিম হয়ে আসে। এখনো ওটার তেজ কমে নি। বলরাম চোখের

পলকে ওর লেজটা ধরে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগল। কিছুক্ষণ ঘুরানর পর সাপটাকে মাঠের দিকে ও ছুড়ে দিল। ছেলেগুলো পেছন পেছন ছুটে গেল। আরো কিছু লাঠির ঘা পড়ল।

হিমাংশু কোত্থেকে কিছু শুকনো ডাল পালা নিয়ে এল। একটু পরে ওটাকে আগুন দিয়ে পোড়ান হল। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

হেড-মাস্টারমশায় বলরামকে তখন ধমকাচ্ছেন, 'এই বাঁদর, একদিন না তোকে বলেছি, ওসব গর্তে-টর্তে হাত দিবি না।'

বলরাম মাথা নিচু করে আছে। মুখে কোন কথা নেই। অতি শান্ত, সুবোধ ছেলে।

'যাঃ, আর কোনদিন যদি এরকম বাঁদরামি দেখি, তবে আর উপায় নেই।'

বলরাম হাসতে হাসতে এক দৌড়ে ঘরে।

আমি অবাক হয়ে ভাবি, ওর বুকে কি ভয় বলে কোন বস্তু নেই! সত্যিই সাপের সঙ্গে ওর বিবাদ যেন এক জন্মের নয়! ওর রক্তের মধ্যেই বুঝি সাপ ধরার মন্ত্র লুকোন আছে। এখনো যেন ওর ঠাকুর্দা ওর মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারে। তা না হলে এ বয়েসেই ওর এরকম জংলা নেশা কেন?

খেতে খেতে আরো বেলা হল। আজ বামনখালির হাটবার। আর একটু পরেই লোকজনের ভিড় শুরু হবে। আমার চোখে ঘুম নেই। শুয়ে শুয়ে খালি এপাশ ওপাশ করছিলাম। শান্ত দুপুর। কয়েকটা শালিখ মাঠে নেমে দানা খুঁটছে। জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে হু হু করে। মাঝে মাঝে এখানে বড় একলা, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। সবার সঙ্গে তো এখনো আমার তেমন করে আলাপ হল না! এখানকার লোকজন, সমস্যা আরো অনেক কিছুই এখনো আমার কাছে অজানা। এদের কতটুকু আর জেনেছি। এরা দূর থেকে আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে।

মাস্টারমশায় বলে হয়ত একটু-আধটু খাতির করে। আমার কাছে ওরা সব কথা বলে না। এখনো ওদের কাছে আমি অনাত্মীয়। আমার কাছেও ওরা অচেনা! যতটুকু জেনেছি তা ভাসা ভাসা, ওপর ওপর। এখনো ওরা আমাকে ওদের মতন করে ভাবতে পারে না! এখানেই আমি পড়ে থাকি। আপন ভেবে কেউ ঘরেও ডেকে নেয় না। তবু ছেলেগুলোর মধ্যে একটা সরলতা আছে। ওরা প্রাণ খুলে কথা বলে। আমাকে ভালবাসে। ওদের আমি বুঝতে পারি! এখানকার সামাজিকতা, জীবন ধারার সঙ্গে আমার তেমন কোন পরিচয় নেই। এভাবে বিচ্ছিন্ন, অনাত্মীয় হয়ে থাকার তো কোন মানে হয় না! আমার বুকের ভেতরটা কেন জানি না ভারী হয়ে আসে। আমার এখন কলকাতার কথা মনে পড়ছিল। মা কি করছে? হয় ঘুমোচ্ছে, না হয় শুয়ে শুয়ে ছটফট করছে। এখন কি আমার কথা কিছু ভাবছে মা? গতকাল মার চিঠি পেয়েছি। আমার চিঠি পেয়েও নাকি মার উদ্বেগের শেষ নেই। ঘরটা খালি খালি লাগে। আমার বিছানাটার দিকে তাকালে নাকি চোখে জল চলে আসে! মাকে নিয়ে বড় মুশকিল! সাপ-টাপের কথা জানালে তো আর উপায়ই নেই! তাহলে হয়ত আমার চিন্তায় চিন্তায় মা খাওয়া-দাওয়ার কথাই ভুলে যাবে। আমারও সময় সময় বড় মন খারাপ হয়ে যায়। মা যেন আমাদের সবার কথা চিন্তা করতে করতেই একদিন শেষ হয়ে যাবে! এমন মমতাময়ী মাকে হারানর কথা যে চিন্তাও করতে পারি না! চোখে জল চলে আসে। বুকের ভেতরটা ভার হয়ে থাকে। মার শরীরও তো ভাল থাকে না! স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে! সংসারের চিন্তা করতে করতেই যেন মা গেল! মিলুটারও এখনো বিয়ের কিছু হল না। বয়েস বাড়ছে। লাবণ্য কমছে, ওর শরীরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কয়েকবার তো দেখেও গেল! পছন্দ হয় না। সংসারের কাজ কর্ম ওকেই করতে হয়। আমারও বলার মতন

একটা চাকরি হল না! আমাকে এত দূরে পাঠিয়ে মার চিন্তাই বেড়েছে। তার ওপর বাবুলটার জন্যে মার আরো বেশী দুর্ভাবনা। মা জানিয়েছে, এরমধ্যে পাড়ায় নাকি একটা ভীষণ গণ্ডগোল হয়েছে। বাবুল দু দিন ধরে বাড়ি আসছে না। পুলিশের লোক খুঁজে গেছে ওকে। এত ঝালেলা মা সইতে পারবে না। বাবুলটা একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ। মার কথাটা একবারও ভাবতে চায় না। বাবার শরীরও ভাল নেই। এ আয়ে সংসার আর চলে না। নুন আনতে পানতা ফুরোয়। এতে শুধু অস্বস্তি, যন্ত্রণাই বাড়ে।

এসব ভাবতে ভাবতে বুকের অতল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। স্বাতীর কথা আমার মনে পড়ল। এখানে যেন আরো বেশী করে সব মনে পড়ে। ও পারল এভাবে চুপ করে থাকতে? দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেই কি মানুষ এভাবে ভুলে যায়! হয়ত এই-ই নিয়ম। তবু মন যে মানে না! না, ওকে আর কোন খবরই আমি দেব না। কি দরকার!

অবনীর কথা মনে পড়ল। এখানে এসে, ওকে আর কোন চিঠি লেখা হয় নি। আমি উঠে পড়লাম। একটা খাম আর পেন নিয়ে এসে বসলাম।

অবনী,

তোর জন্যেই শেষপর্যন্ত এ চাকরিটা আমার হল। উচিত ছিল, অনেক আগেই তোর কাছে একটা খবর জানানো। রাগ করিস না। তোর সঙ্গে তো আর আমার মার্জনা চাওয়ার সম্পর্ক নয়। হলে আগেই তা চাইতাম। গঙ্গাসাগরের মেলার কথা শুনেছিস তো, এ হল সেই জায়গা। আমার মতন পুণ্যাত্মা কজন হয় রে? নদী দেখে আমার বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস কর, প্রথম দিন আমার কান্না পেয়েছিল। এখনো যে মাঝে মাঝে মন খারাপ না হয়, তা নয়। তবু অনেকটা সয়ে গেছে। ফিরে যাওয়ার সাধ্য কি আমার আছে রে! তুই তো সবই জানিস! এখানে এসে আমার নতুন

অভিজ্ঞতা হল। এতকাল তো আমি আমার পরিচিত ছোট্ট গণ্ডীটুকুকেই একমাত্র পৃথিবী বলে ভাবতাম। এখন দেখছি, আমার ভাবাটা খুবই সীমিত। এখানে এসে আমার চোখ খুলে গেল। আমার মতন অভাবী আরো অনেকেই এখানে আছে। কবে যে এখানে একদিন বেঁচে থাকার লড়াই শুরু হয়েছিল, আমার জানা নেই। আজো এ লড়াইয়ের শেষ নেই। এখনো যে-কোন সময় এখানে নদী ফুঁসে উঠতে পারে, সাপের ছোবলে ঢলে পড়তে পারে। তবু এদের কোন পরোয়া নেই। এদের দেখে যেন বুকে আরো সাহস বেড়ে যায়। সহজেই চেনা যায়। স্বাতীর কাছেও একটা চিঠি দিয়েছিলাম। কোন উত্তর নেই। আর কদিন বাদেই এখানে ছুটি পড়ছে।

চিঠিটা শেষ করে আমি আরো খানিকক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকলাম। লোকজনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি উঠে পড়লাম। পাজামা আর পাঞ্জাবীটা পরে নিলাম। নিশ্চয়ই এতক্ষণে মহাদেবদার দোকান খুলেছে !

এগার

হাটবারের দিনগুলোতে তবু কিছু লোকজনের মুখ দেখা যায়। আশপাশের গাঁ থেকে কেনাবেচা করতে লোকেরা আসে। দেখতে দেখতে সময়টা বেশ কেটে যায়। এখন ওদের মুখে শুধু চাষবাসের কথা। কার কতটা কাজ এগিয়েছে, কি কি অসুবিধে, এখনো কত বাকি ইত্যাদি ঘর-গেরস্থালী, টুকিটাকি সব কথা। ওরা বেশীক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়ায় না। দাঁড়াবার যেন সময় নেই। কেমন এক তড়ি-ঘড়ি ভাব। দরকারী কেনাকাটা শেষ করেই ঘরের পথ ধরে। চাষের কাজ শেষ না হলে ওদের দুশ্চিন্তা যাবে না। তখন আবার হাতে প্রচুর সময়। এরই মধ্যে দু একজন এসে আলাপ-টালাপও করে। ওরা খুশি হয়। খুশি হওয়ার কারণও আছে। একদিন এই স্কুলের জন্যে তারাও জমি দিয়েছিল। গতর খেটেছিল। সবচেয়ে বড় কথা, তারাও অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সেদিন। আজ ওদের কথা অনেকেই ভুলে গেছে। এজন্যে ওদের কোন দুঃখ নেই। স্কুলের সুনাম বাড়লেই ওদের আনন্দ। তাছাড়া ওদের বয়েসও হয়েছে। চোখের সামনে দিনগুলো দেখতে দেখতে বদলে যাচ্ছে। তবু ওদেরই হাতে-গড়া ছোট্ট এই প্রতিষ্ঠান আজ এত বড় হয়েছে, দেখলেও যেন বুকটা জুড়িয়ে যায়। ছাত্রও অনেক বেড়েছে। বাইরে থেকেও কত শিক্ষিত লোকজন এখানে আসছে! এ তো তারা একদিন ভাবতেই পারত না! তারা নিজেরা লেখাপড়ার খুব একটা সুযোগ পায় নি, কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা পাচ্ছে, এটা দেখেও তৃপ্তি। ওদের চোখে-মুখে সেরকমই খুশি। তারাও শুনেছে, সরকার পাকা-ঘর তোলার

জন্যে নাকি অনেক টাকা দিয়েছে। কথায় কথায় আরো কত কথা চলে আসে। পেন্নাম জানিয়ে ওরা চলে যায়। ওরা চাঁপাতলার দিকে থাকে। ওদের ছেলে, নাতি-টাতিরা এখানে পড়ে। ওদের কথা শুনতে আমারও ভাল লাগে। আমিও তো ওদের সঙ্গে মিশতে চাই। ওরা যেন এখনো আমাকে মনেপ্রাণে নিতে পারছে না। এখনো অনেকে আমাকে অবাক চোখে দেখে।

মাঝে মাঝে সুদর্শনবাবু আসে। কাঠের সাঁকোটার ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা গল্প করি। আরো দু একজন সেখানে আসে। এখানকার নানান সমস্যার কথা ওঠে। সুদর্শনবাবু সিগারেট টানতে টানতে পুরনো দিনের গল্প বলে যায়। শুনতে শুনতে আমার গা রোমাঞ্চিত হয়। এসব জায়গা একদিন কী ভয়েরই না ছিল! শুধু কি জন্তু-জানোয়ারের ভয়! এটা তো নদীর মোহনা। এখানে নাকি একদিন পর্তুগীজ দস্যুরা লুঠপাট করত। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকত। শিকার দেখলেই ছুটে যেত। শুধু টাকা পয়সাই লুঠ করত না ওরা। মেয়ে বউও নিয়ে যেত। এখানে এনে লুকিয়ে রাখত। এসব জায়গা সেদিন ভয়ঙ্কর ছিল। এখনো নাকি একটা পাকা, ভাঙা-চোরা বাড়ি আছে নদীর পাড়ে। আস্তে আস্তে লোকজন এল। জঙ্গল কাটা শুরু হল। জমিদারেরা কোম্পানীর কাছ থেকে এসব জায়গার বন্দোবস্ত নিল। সামান্য মাত্র দাদন। জঙ্গল পরিষ্কার হল। বাঘ-টাঘ মরল, কিছু পালিয়ে গেল। কুমীর-কামটও কমল। কণ্টাই, নন্দী-গ্রামের লোকজনই এখানে বেশী। খরার সময় পালিয়ে এল লাট অঞ্চলে। এখানকার জমিতে তখন সোনা ফলে। কত সুখ। মাছ দুধ অঢেল। কত আর খাবে। ব্যাস, লোক আসতে শুরু করল। কেউ কেউ আবার বড় ঘরের বউ-টউ ফুসলে নিয়েও পালিয়ে এল। অনেক ডাকাত-টাকাতও এখানে এসে গা ঢাকা দিল। পরে আরো অনেকেই এল। এভাবেই লোকজন বেড়ে গেল। সুদর্শনবাবু

হাসতে হাসতে বলে, 'এখন আর মাস্টারমশায় খাওয়া-দাওয়ার সেই সুখ নেই। দুধ ত এক জিনিস মেলেই না। মাছ-টাছও পাওয়া যায় না। রাস্তাঘাট হলে ত আরো মিলবে না। দিন দিনই এখানের সুখ শান্তি আরাম সবচলে যাচ্ছে।'

'চলে যাচ্ছে বললে তো হবে না, সুখ খুঁজে নিতে হবে।'

সুদর্শনবাবু হো হো করে হাসে। ঘন ঘন সিগারেট টানে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'এ কি খুঁজে নেওয়ার জিনিস?'

'খুঁজে না নিলে যে কষ্ট আরো বাড়বে, কমবে না।'

সুদর্শনবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। আমার কথার অর্থটা যেন তার বোধগম্য হয় নি।

আমি হাসতে হাসতে বলি, 'ঠিক তাই, যা যায় তা তো আর ফিরে আসে না। মানুষ এক জায়গায় থেমে থাকে না। এগিয়ে যায়। একদিন এখানে জঙ্গল ছিল, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারেরা ঘুরে বেড়াত। এখানেই থেমে থাকল না। মানুষ এল। আস্তে আস্তে জঙ্গল পরিষ্কার হল। আজ এখানে কত লোকের বাস। দিন দিনই মানুষের অভিজ্ঞতা বেড়ে যায়। একদিন যেভাবে মানুষ এখানে বাঁচতে চাইত, আজ সেভাবে আর বাঁচা যায় না, বাঁচতে পারে না। একদিন তো এখানে আপনারাই বলেছেন, কিছুই ছিল না। আজ সেখানেই রাস্তাঘাট হয়েছে। আর কদিন পরে এখানে বাস চলবে। স্কুল ছিল না, বড় বড় স্কুল হয়েছে। এখানকার ছেলেরা এখন সহরে যাচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে। তাদের দেখার, জানার জগতটা দিন দিনই আরো বাড়ছে। তাছাড়া আরো একটা কথা ভাববার আছে, একদিন এখানে যে লোকসংখ্যা ছিল, আজ তা অনেক গুণ বেড়ে গেছে, ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। এজন্যেই বলছিলাম, সুখটা খুঁজে নিতে হবে।'

'যাই বলুন, আগের দিনগুলোই ভাল ছিল।'

আমি হেসে ফেললাম, 'আবার অনেকের কাছে মোটেই ভাল ছিল না।'

'লেখাপড়া শিখে, কদিন সহর-টহরে থেকে ছেলেগুলোর মাথাই কিরকম বিগড়ে গেছে।'

'এটাকে বিগড়ে যাওয়া বলছেন কেন, বলুন, ভাল-মন্দ চেনার বোধটা এসেছে। ওরা এখন একেবারে হালফিলের চোখ দিয়ে বিচার করতে শিখেছে। একইভাবে তো আর সমাজ চলে না, চলতে পারে না। গ্রহণ বর্জনের ভেতর দিয়েই সে এগিয়ে যায়।'

'কি যে এগোচ্ছে বুঝতে পারছি না। লেখাপড়া শিখে টকাগুলা যে কি করবে আর বুঝতে পারছে না। ওরা একবার যা বুঝবে তাই ঠিক, বাপ-জেঠার কথার আর কি দাম!'

কথা শুনে বোঝা যায়, সুদর্শনবাবু ওদের ওপর তেমন প্রসন্ন নয়। হয়ত ওদের সঙ্গে তার কোন বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছে। মতের মিল হয় নি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলি, 'এসব নিয়ে মন খারাপ করে তো লাভ নেই। যা হবার তা হবেই।'

সুদর্শনবাবু সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দেয়। সন্ধ্যে হয়ে আসে। পুরনো দিনের জন্যে যেন তার এখনো ভীষণ মায়া। অথচ দিন দিনই যে নতুন নতুন ঢেউ আসছে সেগুলো সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ নেই। ভাবতে ভাবতে একসময় ঘরের পথ ধরে। আমি অবাক হয়ে ভাবি, এরা এখনো কোন্ জগতে আছে!

আমাকে দেখতে পেয়ে বনবিহারী সাউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাসি হাসি মুখে বলল, 'আসুন মাস্টারমশায়।'

আমি চারপাশে তাকাচ্ছিলাম। আজকের ভিড়টা তেমন জমজমাট ছিল না। ভবর চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চটার ওপর কিছু লোক বসে আছে। চা খাচ্ছে। বিড়ি ফুঁকছে। মাঝে মাঝে হাসাহাসি করে ওরা কথা বলছে। মহাদেবদার দোকানের সামনে ছোট মতন এক ভিড়। সুধীরের দোকানের সামনেও একটা

জটলার মতন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকজন কথা বলছে। আমি ভেতরে এলাম। ভেতরেও কয়েকজন বসে আছে। আমি ওদের কাউকেই চিনি না। ওরা আমাকে কেমন যেন একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখছিল।

বনবিহারী ওদের একজনকে বলল, 'ইনিই আমাদের নতুন মাস্টারমশায়।'

ওরা হাত তুলে প্রণাম জানাল। আমিও হাত তুলে প্রতি নমস্কার জানালাম।

ওদের একজন হাসতে হাসতে বলল, 'সেদিন ত আমানে এক লৌকাতেই আইলি।'

আমি তাকালাম ওর দিকে। ঠিক মনে করতে পারলাম না। মনে করে রাখার মতন মনের অবস্থাও তখন ছিল না আমার। বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে। নদীর চেহারা দেখে মাথা ঝিম ঝিম করছিল।

লোকটি আবার বলল, 'সুদর্শনদা তখন মাস্টারবাবুকে খুব গপ্প শোনায়ঠে।'

'ওই এক লোক বটে, খালি বাজে বকেঠে।' বনবিহারী আমার মুখের দিকে তাকাল, বলল, 'এই লোকটা আপনার সাথে কি অত বকর বকর করে?' বলে হাসল।

'যাই বলুন, বেশ গল্প জমাতে পারে।' আমি হালকা গলায় বললাম।

'আমাদের সাথে অর ঠিক মিল খায় নি। লোকটা ভীষণ প্যাঁচাল।'

সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিলাম না। মুচকি একটু হাসলাম। কথাটা বনবিহারী একেবারে মিথ্যে বলে নি। দৃষ্টিটা সব সময়ই ওর পেছনে। সামনেটা দেখার মতন যেন চোখ নেই। শুধু সুদর্শনবাবুই নয়, এরকম আরো অনেকেই এখানে আছে। ওরা এটা

কিছুতেই বুঝতে চায় না, দিন এক জায়গায় থেমে থাকে না। পুরনো অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশী দূর যাওয়া যায় না। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে হয়। এখনো ওরা মনে করে, অশিক্ষা অনাচার ব্যভিচার নিয়েই ওরা সুখী ছিল। ওখানেই ওদের তৃপ্তি। আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'এসব রাস্তাঘাট হচ্ছে দেখে সুদর্শনবাবুর তো ভীষণ মন খারাপ।'

'ঠিক কইচ বাবু।' ওই লোকটি গলায় জোর দিয়ে বলল।

বনবিহারীও আমার কথা শুনে যেন খুব খুশি হয়েছে। উৎসাহের গলায় বলল, 'এরা আসলে এখানকার ভাল কিছু চায় না। বাইরের লোকজন এখানে আসে, এটা ওরা পছন্দ করে না। এখানকার ছেলেরাও বাইরে যায়, চায় না। ওদের নাকি চোখ ফুটে যাবে এতে। চোখ ত ফুটবেই মাস্টারমশায়। ওদের সম্পর্কেও এখন অনেক কথা উঠছে। ওরা যা বলছে তা আর হচ্ছে না। প্রতিবাদ উঠছে।' কথা বলতে বলতে বনবিহারী আবার ওই লোকটার দিকে চেয়ে বলল, 'তুটা তিন্‌টিয়া রাঢ় লিয়া থাকার দিন চলিচে। কি কও তুমানে?'

'ঠিক ত কওঠ।'

বনবিহারী আবার আমার মুখের দিকে তাকাল, বলল, 'আর বলবেন না মাস্টারমশায়। এই কেষ্টদা লোকটা কি কম গভীর জলের মাছ! ও পারে না হেন কাজ নেই।'

আমি চুপ করে থাকলাম। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি! এ-ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। এখনো আমি সবাইকে ভাল করে চিনি না। কারো সম্পর্কে কিছু বলার মতন আমার অভিজ্ঞতা কোথায়? মানুষের বাইরেটা দেখে আর কতটুকু ধারণা করা যায়! কেষ্টবাবুর সঙ্গে কতটুকু সময় আর আমার কথা হয়েছে! আমার সঙ্গে তো তিনি ভালই ব্যবহার করেছেন। আমাকে পেয়ে তিনি খুবই খুশি। আমার যাতে খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে

না হয়, ভীমকে ডেকে তা বলে দিয়েছেন। বাড়ি থেকে আমার জন্যে তিনি বিছানাপত্তরও পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই স্কুল নিয়ে ওঁর ভাবনা-চিন্তার যেন শেষ নেই। স্কুল বড় হয়েছে। অনার্স, এম. এ. না হলে পড়ান যাবে না ওপরের ক্লাসে। মাস্টারমশায়রা বাইরে থেকে আসেন। কদিন থেকেই আবার তাঁরা চলে যান। এখানে তাঁদের মন বসে না। নদী, সাপের কথা শুনলে বুক শুকিয়ে যায়। একবার ফিরে গিয়ে আর আসেন না। এতে পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হয়। তাঁরা এসে যাতে এভাবে চলে না যান, তার জন্যে কেষ্টবাবু সাধ্য মতন চেষ্টা করেন। এই স্কুল নিয়ে কেষ্টবাবুর যেন অনেক স্বপ্ন। তিনি সবাইকে বোঝান, এখানে এত ভয়ের কিছু নেই। আর কদিন পরেই এখানকার চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। এই মাটির ঘর আর থাকছে না। স্কুলের দোতলা বিল্ডিং হবে। এখানে হোস্টেল হবে। টিচার্স-কোয়ার্টার হবে। স্কুলের সামনের জায়গায় ফুলের বাগান হবে। আরো কত কি! এর জন্যে জলের মতন টাকা খরচ করছে সরকার। এখানকার ওপর ওদের নজর পড়েছে। কেষ্টবাবু বেশ উৎফুল্ল বোধ করেন। হাসি-খুশি দেখায়। সুতরাং, ওঁর বাইরেটা দেখে বোঝবার উপায় নেই ভেতরে কি আছে। এখানে যারা তাঁকে চেনে জানে, তারাই বলতে পারে, মানুষটি কেমন। অনেকেরই দেখছি ওঁর ওপর ভীষণ রাগ। আড়ালে অনেক কিছুই বলে। আবার ভয়ও পায় ওঁকে।

সেক্রেটারী কাকদ্বীপে থাকেন। গুণধরবাবু মাঝে মাঝে এখানে আসেন। এখানেও তাঁর ঘর-বাড়ি আছে। আত্মীয়-স্বজনরা থাকে। প্রচুর জমিজমা আছে। তিনিও কেষ্টবাবুর ওপরই স্কুলের অনেকখানি দায়-দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি নিজের ব্যবসা নিয়ে আছেন। স্কুলের এত সমস্যা তাঁর মাথায় ঢুকে না। তাছাড়া তাঁর সময়ও কম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বনবিহারী বলল, 'আপনি

হয়ত ভাবছেন, আমি বাড়িয়ে বলছি; মা কালীর দিব্যি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না।'

মৃদু হেসে বললাম, 'আমি কিছুই ভাবছি না। নতুন তো, এখনো কিছুই জানি না।'

'জানবেন, আরো কিছুদিন এখানে থাকলেই সব জানতে পারবেন।'

আমি আবার চুপ করে থাকি।

বনবিহারীবাবু ফের বলল, 'কেন বলছি শুনুন, এই যে একে দেখছেন, এর নাম গোবর্ধন। ঘর সাপখালি।'

আমি ওর চোখে চোখে তাকালাম। লোকটিও নরম চোখে চেয়ে আছে। একটু বিনীত ভঙ্গি। এর আগেও এই নামটা শুনেছি। ওকে দেখবার আমারও একটা কৌতূহল ছিল। এরই কথা সেদিন কেষ্টবাবু বলছিলেন। ওর ওপর কেষ্টবাবু ভীষণ চটে আছেন। পণ্ডিতমশায়ও কথার কথায় সেদিন এরই কথা বলছিলেন। লোকটিকে দেখে তো আমার নিরীহই মনে হল। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা। চোখের কোণটা একটু লালচে। মুখের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া।

বনবিহারী আবার বলতে শুরু করে, 'আমাদের এই স্কুলের নামে অনেক জমি আছে। কেষ্টদাই ওগুলা দেখাশুনা করে। বুঝলেন মাস্টারমশায়, এখানে কেষ্টদার একটা মোটা আয়, ঠিক কিনা গোবর্ধনদা?'

গোবর্ধন মাথা নাড়ে, 'ঠিক কওঠ।'

বনবিহারী একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল। বিড়ির বাণ্ডিলটা ওদের দিকেও বাড়িয়ে দিল। ওরাও সবাই বিড়ি ধরিয়ে নিয়েছে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বনবিহারী ফের বলল, 'এই গোবর্ধনদা আগে বার তের বিঘা জমি চাষ করত। কমতে কমতে ছয়ে এসে ঠেকল। এবার

তাও চলে গেল। হঠাৎ কেষ্টদা ওর ওপর বিগড়ে গেল। কারণটা কি জানেন?'

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। একটু অবাক লাগে আমার। ওই জমিটুকু ঘিরেই তো ওদের স্বপ্ন। এইটুকু জমিও কেড়ে নিলে, ওরা খাবে কি? হঠাৎ কেষ্টবাবুর কেন যে এমন মতিগতি হল, তা আমার কাছে দুর্বোধ্য। সবাই চাষের কাজে হাত দিয়েছে, অথচ ও দিতে পারছে না, এজন্যে যেন ভেতরে ভেতরে গোবর্ধন ছটফট করছে। আর কত দেরি করবে! ওর চোখ-মুখ দেখে আমার এরকমই মনে হয়। পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে একটু-আধটু কারণ যে না শুনেছি, তা নয়। তবু আমি চুপ করে থাকি।

বনবিহারী ক্ষোভের গলায় বলল, 'জানেন ত, এই জমি পাওয়ার জন্যে কেষ্টদাকে আলাদা করে কিছু দিতে হয়, সেটাও বড় কম নয়। তার পরেও ফসলের হিসেবের ওপর অনেক কারচুপি আছে। সেই কথাটাই গোবর্ধনদা কার্তিকদাকে বলে দিয়েছে। কার্তিকদা মিটিংয়ের সময় কেষ্টবাবুকে চেপে ধরেছিল। আর যায় কোথায়! কেষ্টদা হিসেব দিতে পারে না। ঝগড়া-ঝাঁটি করে মিটিং থেকে বেরিয়ে গেল কেষ্টদা। যা ফসল পায়, স্কুলকে অনেক কম দেয়। কেষ্টদাটা একটা চোর।' ওকে বেশ উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত মনে হল।

গোবর্ধনেরও চোখ-মুখ যেন অন্যরকম হয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে ও যেন ফুঁসছে। চোখ দুটো যেন এখন ওর জ্বলছে। ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'চোর কওঠ কি, ওটা একটা আস্ত ফেরেববাজ। পরাণ মণ্ডলকে আমার জমিটা দিতে চায়ঠে কেনি জান? ওর কাছে টাকা ত খাইচেই, ওর বাড়ি খুব ঘন ঘন যায়ঠে। ওর বউয়ের ওপর লজর পড়চে।'

'পরাণ ত কেষ্টদাকে ভাল কর‍্যা জানে। জানিয়া শুনিয়া ঘরে কেউ কালসাপ লিয়াইসে!'

'সে কথা আর বুঝেঠে কাই? ও ত জমির নেশায় আছে। ও সেদিন জমিতে হাল করতে গেল। আমানে বাধা দিলি। কার্তিকও থাইল আমান্‌কের সাথে।'

'আমি কার্তিকদার মুখে সব শুনচি। ঠিক করচু।'

আমি ভাবছিলাম, কেষ্টবাবু লোকটা কি অদ্ভুত ধরনের মানুষ। কথা শুনে তো মনে হয় না, মানুষটা এত নিচে নামতে পারে! এত স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর! আমার অন্যরকম ধারণা ছিল। সারাক্ষণই স্কুল নিয়ে ভাবছেন। কি করে একে আরো ভাল করা যায়, সেই চিন্তাতেই মেতে আছেন। কবে নাগাদ বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু করবেন, এও মোটামুটি একটা ঠিক করে রেখেছেন। কাকদ্বীপে ইট সিমেণ্টের দোকানে গিয়ে কথা-টথা বলে রেখেছেন। স্কুলের জমিতে মাপ-জোখও করেছেন অনেকবার। উৎসাহের যেন শেষ নেই। মানুষের অনেক রকমেরই তো পাগলামি বা নেশা থাকে। এও এক ধরনের নেশা। মন্দ কি! এসব দশের কাজে কজন আর মাথা ঘামায়! এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল। মানুষ সম্পর্কে বোধবুদ্ধি আমার কত অগভীর! সেজন্যেই চট করে মানুষ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। আসলে, এসব উৎসাহের পেছনে ওঁর মস্ত বড় এক লোভ! এর থেকে বেশ মোটা একটা দাও মারার ধান্দা। অথচ বাইরে থেকে তা সহজে বোঝার উপায় নেই। আমার কাছে লোকটার একরকম চেহারা, আর ওদের কাছে আর এক রকম। আমার সঙ্গে ওঁর ভদ্রতার, ওপর ওপর সম্পর্ক। সবে নতুন এসেছি। যে-কোন সময় চলে যেতে পারি। এখনো আমার সঙ্গে এখানকার মাটির সম্পর্ক তৈরী হয় নি। আমি বাইরে থেকে এসেছি, আমার আর শক্তি কতটুকু! সুতরাং, আমার সঙ্গে অভদ্র আচরণের কোন কথাই ওঠে না। কেষ্টবাবু বোধহয় ধরেই নিয়েছেন, আমার দিক থেকে ওঁর বিপদের কোন কারণ নেই। আমিও এটা ভাল করেই জানি, সেরকম যদি কখনো কিছু ঘটে, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ভদ্রতার

মুখোসটা খসে পড়বে। আমাকেও ছোবল মারতে তখন কসুর করবেন না কেষ্টবাবু। এদের সঙ্গে ভদ্রতার কোন ব্যাপার নেই। এরা ওঁর কদর্য, নোংরা দিকটা দেখে ফেলেছে। এখানে উনি যে কী ভয়ঙ্কর আর নির্মম, এটা যেন এরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

আমার কাছেও ব্যাপারটা ভাল লাগল না। যে লোকটা এত বছর ধরে এই জমিটুকু চাষবাস করছে, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনরকমে বেঁচে-বর্তে আছে, আজ সেটুকু সম্বলও কেড়ে নিলে, ওরা দাঁড়াবে কোথায়? খাবে কি? বাঁচবে কি করে? এরই মধ্যে লোকটার মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। একটা লোকের খাম-খেয়ালির জন্যে এতগুলো প্রাণ ছটফট করে মরবে? ওই লোকটার কি বেঁচে থাকার অধিকারও নেই? কেষ্টবাবু এসব কথা শুনতেই চান না। অপমানের প্রতিশোধ নেবেন এবার। এখানেও সেই নির্মম, নির্দয় ছবি!

বনবিহারী উত্তপ্ত গলায় বলল, 'এ কি কেষ্টদার বাপের জমিদারি, এ স্কুলের জমি। পাঁচজনের দেওয়া জমি। যা খুশি তাই করে যাবে? আমারা এবার আর ছাড়চি নে। কি আর বলবেন মাস্টারমশায়, এর ওপর আবার এদের বেগার খাটতে হয়।'

'বেগার খাটতে হয় মানে!' আমি একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম।

আমার কথা শুনে গোবর্ধনই জবাব দিল, 'হুঁ গো মাস্টারবাবু। এর ওপর ফের ফাউ কাজ আছে। পুকুর সু মাছ ধর‍্যা দিতে হবে। জমি জায়গার কাজ কর‍্যা দিতে হবে। ঘরের চাল ছায়্যা দিতে হবে, আরো অনেক ফাউ কাজ। না করলে রাগ করবে। রাগ করলে আর জমি পাবু নি।'

'সে কি?' আমার চোখে-মুখে বিস্ময় আরো ঘন হয়।

বনবিহারী বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলছে ও। এ না করে কোন উপায় নেই মাস্টারমশায়। বছরের পর বছর এই

চলে আসছে। এরা চিরকালই অন্যের দয়ার ওপর বেঁচে থাকে। এখান থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই। এদের কষ্টের কথা কে আর ভাবে! মহাজন জোতদারের মন না ভেজালে সে পরের বছর আর কাজ পাবে না! তা হলে ত না খেয়ে মরবে। কেষ্টদাও এখন পরের ধনে জোতদার হয়েছে।'

গোবর্ধন বিড়িটায় টান মেরে বলল, 'সেদিনও কেষ্টদা কইল, ঘরের চালটা ঠিক কইর‍্যা দুবু রে গোবর্ধন। তাড়াতাড়ি কাজটা কর‍্যা দিলু। ভাবলি, রাগটা খানিকটা পড়বে। তবু রাগ পড়ল নি! জমিটা পরাণকে দিয়া দিল!' বলতে বলতে সহসা যেন ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'পরাণকে ত আর জমির দখল দাও নি।' বনবিহারী ওর দিকে তাকায়।

গোবর্ধন যেন ফোঁস করে উঠল, 'কেনি দুবু, আমানে খাব কি?' ওর মুখ-চোখ দেখতে দেখতে কেমন শক্ত হয়ে ওঠে। ভেতরে ভেতরে যেন ও মরীয়া হয়ে উঠছে। এ জমি সে সহজে ছাড়বে না। দরকার হলে ওর জীবন দিয়ে দেবে। এ জমিটুকু একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে তাদেরও আর খাওয়া জুটবে না। ছেলেমেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করতে হবে। তার চেয়ে শরীরে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ সে লড়ে যাবে। সে তো কোন অন্যায় করে নি। সে পরিশ্রম করে। বেশী ফসল ফলায়। কেষ্টদার চালাকিটা সে অন্যদের বলে দিয়েছে।

বনবিহারী আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ঠিক করচু, তুমানে চুপ কর‍্যা থাউ। কিছু একটা হবেই।'

গোবর্ধন দাড়ি চুলকোয়। ফুঁক ফুঁক করে বিড়ি টানে। বিড়িটা আর ভাল লাগছে না। টুকরোটা ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'কেষ্টদা এখন রসের লাগর হইচে রে বন।'

'তা হবে নি!'. বনবিহারী শেষমেষ আর একটা টান দিয়ে টুকরোটা ফেলে দিল।

'হুঁ, পরাণের বউটার গতর দেখ্যা মাথা ঘুরিচে।' গোবর্ধন মন্তব্য করে।

'পরাণটা শালা একটা ঢেমনা।'

'কেষ্টদা আইজ-কাইল ওর বাড়ি ঘন ঘন যায়ঠে, ঠারে-ঠুরে কথা কয়ঠে ওর বউয়ের সাথে।'

বনবিহারী হাসে। হাসতে হাসতে বলে, 'ওর কপালে অনেক কষ্ট আছে।'

'ও শালা ঢেমনাটা অখনো কেষ্টদার মতলবটা বুঝল নি। শালা তাড়ি খায়া রাঢ়ের বাড়ি গড়াগড়ি যায়। এদিকে যে ঘরে মায়্যা-চোর ঢুকে, সেদিকে, টেরও রাখে নি।'

এমন সময় কার্তিকবাবু ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, 'আপনার ওখানে গিয়েছিলাম। পরে গোবর্ধনের দিকে চেয়ে শুধোলেন, 'কেষ্টবাবুর সাথে দেখা হইচে?'

'না। অখনো ত আইল নি!'

বনবিহারীর যেন এতক্ষণে খেয়াল হল। একজনকে বলল, 'এই কেনারাম, ভবদার দোকানে গিয়া পাঁচটা চায়ের কথা কয়্যা আসবু।'

গোবর্ধন কার্তিকবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। ওঁকে দেখে যেন এরা মনে একটু বল পেল। মুখের ওপর থেকে মনমরা ভাবটা সরে গেল। এ বিপদে ওঁরাই এদের সহায়, সাহস। এতকাল তো মুখ বুঝেই এরা সব অনাচার অবিচার সয়ে এসেছে। প্রতিবাদ করার ভাষা ছিল না এদের। আজ যেটুকু মুখ খুলতে পেরেছে তা ওঁদেরই জন্যে। তাদের পাশে আরো অনেকেই আছে এটা তারা বুঝতে পারে। এদের দীর্ঘদিনের অসন্তোষগুলো মাঝে মাঝে আজকাল ফেটে পড়ে। এদের ভয়ও খানিকটা কেটেছে। একটু একটু করে ঘুম ভাঙছে। এরাও আজকাল কথা বলতে শিখেছে। বুকে সাহস ফিরে পাচ্ছে। আর

কতকাল তারা এ অভিশাপের জীবন যাপন করবে! গোবর্ধনের চোখের কোণে যেন আবার আগুন জ্বলে উঠতে চায়। ধীরে ধীরে ও জিজ্ঞেস করল, 'গুণধরদার কাছে যাইথুলু নাকি?'

'হঁ হঁ, সবই সমান। কেষ্টবাবু যা করবে তাউ ঠিক। আমার সাথে ত ভীষণ কথা কাটাকাটি হইল।'

গোবর্ধনের মুখটা যেন মুহূর্তে কিরকম ফ্যাকাসে হয়ে যায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলল, 'তাইলে কিছু হইল নি কও!'

কার্তিকবাবু এবার হেসে ফেললেন, 'আরে গোবর্ধনদা, তুমানে অমন ভাঙ্যা পড়লে চলবে কেন। ভুলিয়া যাওঠু কেনি, এ লড়াই বাঁচার লড়াই। হয় বাঁচবু, না হয় মরবু। বুকে সাহস রাখবু ত।' একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন তিনি। সামান্য পরে ফের বললেন, 'সেক্রেটারীকে ত সব বুঝাইয়া কইল। সব শুনিয়া ত সেক্রেটারী তুমানে চার বিঘা জমি চাষ করতে কইল। পরাণকে দু বিঘা জমি চাষের জন্যে দিল। কেষ্টবাবু ওকে কথা দিয়ে ফেলিচে ত!'

একটু পরে চা এল। চা খেতে খেতে কার্তিকবাবু আমার দিকে তাকালেন একবার। মৃদু হেসে বললেন, 'এরকম কেষ্টবাবুর দল সব জায়গায়ই আছে, তাই না অরুণাংশুবাবু!'

'ঠিকই বলেছেন।'

কার্তিকবাবু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। দেখতে দেখতে চোখ-মুখ তার অন্যরকম হয়ে যায়। খানিক পরে আবার চায়ের গ্লাসে চুমুক দেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'আর এই লোকগুলো, বছরের পর বছর এভাবেই লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত হয়েছে। বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত এদের নেই। তবু যে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে এদিকে! কিন্তু একা সরকার কি করবে? লোকগুলোই যে অসৎ, জুয়াচোর, বদ। এত বছরের বঞ্চনার জগদ্দল

পাথরটা কি চট করে সরানো সোজা কথা! জানেন, এই বঞ্চনার অভিশাপ নিয়েই এখানকার ইতিহাস একদিন শুরু হয়েছিল। আজো সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি।' চায়ে চুমুক দিলেন আবার।

আমি হাঁ করে কার্তিকবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

তিনি বলতে শুরু করলেন আবার, 'একদিন যারা নিরুপায় হয়ে, নিতান্ত বেঁচে থাকার তাগিদে এখানে জঙ্গল কাটতে এসেছিল, তাদেরকে লোভ দেখান হয়েছিল জমি দেওয়া হবে। জঙ্গল কাটতে এসে ত অনেকে মরল। যারা বেঁচে থাকল, তারাও জমির অধিকার পেল না। এই লাটের জমিতে সোনা ফলে। এ জমি কি অত সহজে হাতছাড়া করা যায়! জঙ্গল কাটার সময়ও কি এদের ওপর কম অত্যাচার হয়েছে! সে এক অন্য ইতিহাস।' কার্তিকবাবু চুপ করে থাকেন ক মুহূর্ত। ওর চোখে যেন কিসের এক ঘোর। দু একবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'নায়েব কিছু কিছু মেয়েছেলে এনে রাখত! রাতের অন্ধকারে এই ক্ষুধার্ত লোকগুলোর কাছে ওদের ছেড়ে দিত। দিনের পরিশ্রমের পয়সা ওরা এভাবেই এদের কাছ থেকে নিয়ে আসত। সেই পয়সা নায়েবের কাছে জমা পড়ত। এদেরকে দেশী মদ, তাড়ি আর মেয়েছেলে দিয়ে ভুলিয়ে রাখত। এমনি করেই ওরা একদিন নিঃস্ব, সর্বহারা হয়ে গেল।' কার্তিকবাবুর চোখের সামনে যেন অতীতের দিনগুলো ফিরে এসেছে। তাঁর মুখের ওপরও বিষাদের এক ছায়া। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আবার যেন মুখের রঙ বদলে যেতে থাকে। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। বুকের ভেতরে কি যেন একটা যন্ত্রণা ছটফট করে মরে। তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এবার দিন বদলের পালা শুরু হল। একটু একটু করে এদেরও চেতনা ফিরে আসছে।'

এমন সময় কেষ্টবাবুর গলা শোনা গেল। বনবিহারী বলল, 'ওই ত কেষ্টদা, গলা শোনা যায়ঠে।'

গোবর্ধন একটু নড়েচড়ে বসল। মুহূর্তের জন্যে যেন চোখ দুটো ওর জ্বলে উঠেছে।

কার্তিকবাবু ইসারায় ওকে যেতে বললেন। ওরা চলে গেল।

কেষ্টবাবু সুধীরের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এখান থেকে সব দেখা যায়। আরো লোকজনের ভিড় ছিল। গোবর্ধন গিয়ে ওঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন রয়েছে। ওকে দেখেই কেষ্টবাবুর মুখের চেহারা চোয়াড়ে শক্ত হয়ে উঠল।

গোবর্ধন বলল, 'এই যে কেষ্টদা, আমার কথাটা কি একটু ভাবল!'

কেষ্টবাবু হঠাৎ যেন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেলেন, জোরে জোরে বললেন, 'তর ত খুব সাহস বাড়ছে রে গোবর্ধন। পরাণকে জমি চাষ করতে দিল নি।'

গোবর্ধনের চোখে যেন মুহূর্তে আগুন জ্বলে ওঠে, 'আমার কি দোষ হইচে কইবু ত।'

'আমার ভাল লাগে নি, তকে এবার চাষ করতে দুব নি।'

'তা কইলে হবে কেনি, আমি কি নেই খায়া মরিয়াব?'

'খুব বড় বড় কথা শিখচু যে!'

'কথা কি আর অম্‌নি কইতে শিখচি? পেটে যে টান পড়ে!'

কেষ্টবাবু রাগে কাঁপছিলেন। হাত নেড়ে বললেন, 'এই তকে শেষ কইয়া দিলি, বেশী বাড়াবাড়ি করবু নি।'

গোবর্ধনের চোখ-মুখ যেন আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। শক্ত গলায় বলে, 'বাড়াবাড়ি ত তুমি শুরু করল।'

'মুখ সামলে কথা কইবু গোবর্ধন।' কেষ্টবাবু যেন রাগে আরো থর থর করে কাঁপছেন।

'হঁ হঁ, তুমার কথা জানতে আর বাকি নেই।'

'কি কইলু?'

'ঠিক কইঠি। পরাণের সাথে অত পিরীতের কারণটা কি, তাও আমানে বুঝচি।'

এরমধ্যে আরো অনেক লোকজন জমে গেছে। কাতিকবাবু বেরিয়ে এলেন। বনবিহারীও।

কাতিকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

গোবর্ধন একে একে সব বলে গেল।

সব শুনে কার্তিকবাবু কেষ্টবাবুকে বললেন, 'আপনি খুব ভুল করছেন কেষ্টবাবু। এ আপনার নিজের জমিদারী নয় যে যা খুশি করবেন। এদের কাছ থেকে ত কম টাকা খান নি! লোভটা এবার একটু কমান। নিজের চরিত্রটাও ঠিক করুন।'

অনেকেই হো হো করে হেসে উঠল।

কেষ্টবাবু রাগে এবার ঠক ঠক করে কাঁপছেন। মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরোচ্ছে না। মাথাটা তাঁর কেমন ঝিম ঝিম করছে। তিনি বেঞ্চের ওপর বসে পড়লেন। লোকেরা মুখ টিপে টিপে হাসছে। অনেকেই খুব খুশি হয়েছে এতে।

কর্তিকবাবু বললেন, 'তুমানে কও, এই গোবর্ধনদা আজ এত বছর নু জমি চাষ কর্‌্যা আইসেঠে। আজ কেষ্টবাবুর ওর উপ্‌রে রাগ হইচে, তাই জমি দিল নি। কাজটা কি ঠিক হইল?'

অনেকেই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'মোটে ঠিক হয় নি।'

কাতিকবাবু কেষ্টবাবুর আরো কাছে এলেন। পকেট থেকে একটা চিঠি বের করলেন। চিঠিটা তাকেই লেখা, কেষ্টবাবুকে দেখাতে বলে দিয়েছেন গুণধরবাবু। চিঠিটা খুলে কেষ্টবাবুর সামনে ধরে তিনি বললেন. 'সেক্রেটারী আপনাকে একবার চিঠিটা দেখাতে বললেন। তিনি এখানে লিখে দিয়েছেন, গোবর্ধনদাকে চার বিঘা আর পরাণকে

দু বিঘা জমি যেন চাষ করার জন্যে দেওয়া হয়। দেখুন, ভাল করে একবার দেখে নিন।'

কেষ্টবাবুর তখন রাগে, অপমানে সর্বাঙ্গ জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। কে যেন সারা গায়ে তাঁর জলবিছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। মাথাটা যেন কেবলই ভার হয়ে আসছে, ঘুরছে।

কার্তিকবাবু চিঠিটা সবাইকে দেখিয়ে বললেন, 'তুমানে ভাল কইর‍্যা দেখঠ, আমি ঠিক কইঠি, কি বেঠিক কইঠি।'

সবাই হেসে উঠল।

একে একে সবাই চলে গেল। হাট ফাঁকা হয়ে এল। লোকের মুখে মুখে তখন একটা কথাই ঘুরছে। কেষ্টবাবুর এই অপমানে অনেকেই যেমন খুশি হয়েছে, আবার কয়েকজন ক্ষুব্ধও হয়েছে। তার মধ্যে সুধীর একজন। কাজটা খুব ভাল করে নি ওরা। হাটের মধ্যে এরকমভাবে অপমান করার দরকারটা কি ছিল! ভবও খুশি নয়। এর ফল ভাল হবে না। মহাদেবদা খুশি হয়েছেন। পান খেতে খেতে বলেছেন, 'এতদিনে একটা কাজের কাজ হইচে। খুব ভাল হইচে।'

আমিও একসময় ঘরে ফিরে এলাম। কেষ্টবাবু যে কখন চলে গেছেন টের পাই নি। কথাটা সব জায়গায়ই জানাজানি হয়ে গেছে। আমার কেন যেন একটু ভয় হল। কেষ্টবাবু কি সহজে এটা মেনে নেবেন? কেন জানি না, কার্তিকবাবুর ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। মানুষটাকে আরো স্পষ্ট করে যেন আজ বোঝা গেল।

বার

পরের দিন স্কুলে এসে টের পেলাম, গতকালের ঘটনাটা মোটামুটি সবারই শোনা হয়ে গেছে। তবে ঘটনাটা এক কান থেকে আর এক কান হওয়ার আগে নানাভাবে আরো মুখরোচক, আরো পল্লবিত হয়েছে। কেউ কেউ শুনেছেন, কার্তিকবাবুর সঙ্গে নাকি কেষ্টবাবুর রীতিমতন হাতাহাতি হয়েছে। শেষপর্যন্ত যারা হাটে এসেছিল, তাদের মধ্যেও তুটো দল হয়ে যায়। তু দলের মধ্যে প্রথমে ভীষণ কথা কাটাকাটি, পরে মারামারি। কেউ কেউ আবার অন্যরকমও শুনেছেন। যাই হোক, মোদ্দা কথা, কেষ্টবাবুকে গতকাল অনেক লোকের সামনে ভীষণরকম অপমান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে মাস্টারমশায়দের অনেকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। ভেতরে ভেতরে তাঁরা রুষ্ট, ক্ষুব্ধ। আবার অনেকেই উল্লসিত। তাঁদের মনোভাবটা যেন অনেকটা এই: বেশ হয়েছে! জেঁাকের মুখে এবার নুন পড়েছে। এবার বাছাধন জব্দ। বড্ড বেড়ে উঠেছিল, পরের ধনে পোদ্দারি! এবার মোক্ষম দাওয়াই পড়েছে।

কেষ্টবাবুর অপমানে যিনি সবচেয়ে মর্মাহত, তিনি বিমলবাবু। মুখ গোমড়া করে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। ভেতরে ভেতরে যেন ফুঁসছেন। দেখে মনে হচ্ছিল, অপমানটা যেন তাঁকেই করা হয়েছে। জ্বালাটা এখনো বুঝি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। মুখের ওপর উত্তেজনার একটা ছাপ।

কালিপদবাবুও এ ব্যাপারে প্রসন্ন নন। তাঁরও মনটা যেন ভাল

নেই। তিনিও যেন এতে বেশ আহত। মলিন মুখ করে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন। এরকম যে একটা ব্যাপার ঘটতে পারে, এ যেন তাঁর ধারণাই ছিল না।

কার্তিকবাবুকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। আমার সঙ্গে চোখা-চোখি হতে তিনি হাসলেন। আড়চোখে বিমলবাবুকে একবার দেখে নিলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়লেন।

আশুতোষবাবুও যেন খানিকটা অবাক হয়ে গেছেন। তিনি কার্তিকবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। কি হয়েছে, একবার বল ত ভাই।'

কার্তিকবাবু ওঁর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে গিলতে বললেন, 'ওসব এখন থাক দাদা।'

'আরে না, একটা ভীষণ ব্যাপার করে ফেলেছ, থাকবে কি! খবরটা জানতে আর কারো বাকি নেই!'

'তবে ত জানেনই।' হাসলেন কার্তিকবাবু।

'আরে না, এক একজন একেক রকম বলছে!'

অনাদিবাবু বিড়ি খেতে খেতে ভুরু কোঁচকালেন সামান্য। মুখে মিটি মিটি হাসি, বললেন, 'আপনার যেন বেশ ফুর্তি হচ্ছে?'

আশুতোষবাবু হি হি করে হাসেন। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলেন, 'হবে না, এখনই কি দেখছেন। আরো কত হবে। এই ত সবে শুরু!'

'কাজটা কি খুব একটা ভাল হয়েছে ভাবছেন?' বিমলবাবু বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকলেন। মুখের ওপর তাঁর একরাশ বিরক্তি, উত্তেজনা।

আশুতোষবাবু ওঁর চোখে চোখে তাকালেন। কি যেন ভাবলেন দুদণ্ড। একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, 'আমার ত মনে হচ্ছে,

এ একদিকে ভালই হয়েছে।' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পরক্ষণই নরম গলায় শুধোলেন. 'কেন, আপনার কি খারাপ লাগছে?' কথাটার মধ্যে সামান্য খোঁচা ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে তার কোনরকম রাগ বা ঝাল নেই। মৃদু মৃদু হাসছিলেন তিনি। বেশ মজা পাচ্ছিলেন। কেননা, তিনি ভাল করেই জানেন, এতে বিমলবাবুর খুশি হওয়ায় কিছু নেই। বরং রাগে যেন ফুলছেন। ওঁর মুখ-চোখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। কেষ্টবাবুর সঙ্গে ওঁর খুব মাখামাখি। যত কানাকানি, শলা পরামর্শ ওঁর সঙ্গেই। এখানকার সব খবর চালাচালি করেন এই বিমলবাবুই। মোসাহেব বলতে যা বোঝায়, বিমলবাবু তাই। কেষ্টবাবু লোকটা আরো ধূর্ত, আরো শয়তান। সামনা সামনি কখনো রাগারাগি করেন না। যা করবার পেছনে কলকাঠি নাড়ান। একবার যার ওপর তাঁর বিষ নজর পড়ল, তার আর উপায় নেই। বিমলবাবু লোকটা ওঁর তুলনায় অনেক সোজা। অল্পতেই রেগে যান। সুতরাং, কেষ্টবাবুর দুঃখে ওঁর ভীষণ কষ্ট।

বিমলবাবু এতে আরো চটে গেলেন। ক্ষুব্ধ, অবিনীত কণ্ঠে বললেন, 'নিজেদের অত চালাক ভাবছেন কেন?'

আশুতোষবাবু রাগলেন না। একটু অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, 'বারে, এতে আবার চালাকির কি হল!'

'থামুন, আর কথা বড়াবেন না।' ওঁর বলার মধ্যে যেন কেমন একটা অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্যভাব ছিল। তিনি অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিলেন।

আশুতোষবাবু ওকে আরো রাগিয়ে দেওয়ার জন্যে মুখের ওপর কপট গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে ধমকাচ্ছেন?'

অনাদিবাবু এবার চোখ মিট মিট করে ওকে বললেন, 'আঃ, থাম ত তুমি।'

'আহা, আমি ত বুঝতেই পারছি না, ওঁর গায়ে এত ফোস্কা পড়ার কি আছে!'

ধীরেনবাবু হেসে হেসে বললেন, 'সব কি আর বোঝা যায়?'

বিমলবাবু আবার ফোঁস করে উঠলেন। টেনে টেনে বললেন, 'কেন যাবে না, আপনারা ত সবই বোঝেন।' গলার স্বরে ঠাট্টা, উপহাস যেন আরো তীব্র।

ধীরেনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে চিমটি কাটতে ছাড়লেন না। মুখে হাসি রেখে মিষ্টি মিষ্টি করে বললেন, 'আপনি যেন আজ কিরকম হয়ে গেছেন বিমলবাবু, কষ্টটা কি আপনার খুবই বেশী?' তিনি অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকেন ওঁর মুখের দিকে।

অনেকেই মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন।

এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। এমনিতেই ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিলেন তিনি, তার ওপর আবার এঁদের এই ব্যঙ্গ, পরিহাস। গায়ে যেন আগুন ধরে যায়। রুষ্ট, কর্কশ গলায় বললেন, 'আমাকে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন, আপনারাই বলুন, আপনারা ত সব জান্তা।'

'উহুঁ, আপনার এই কষ্টের কারণটা ত বুঝতে পারছি না!' ধীরেনবাবুর মুখে তখনো মিহি হাসি।

'সে কি, এত বোঝেন আর এটুকু বোঝেন না?'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'এসব আলোচনা এখন থাক না!'

এমন সময় নির্মলবাবু সিগারেট টানতে টানতে ঘরে ঢুকলেন। মুখে হাসি। কার্তিকবাবুর দিকে তিনি একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'কনগ্রেচুলেশন। ভীষণ, ভীষণ খুশি হয়েছি আমি। আপনি ঠিকই করেছেন।'

অনাদিবাবু হেঁ হেঁ করে হাসলেন। চোখ পিট পিট করে শুধোলেন, 'আপনি কি সব শুনেছেন মাস্টারমশায়?'

'শুনেছি মানে, সব জানি।'

'কই, আমি ত কিছু জানি না।' অনাদিবাবু অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন।

'জানতে না চাইলে আর জানবেন কি করে!'

'তা ঠিক, বুঝলেন না, আমরাই অভাগা মাস্টারমশায়!' অনাদিবাবুর হাসিটা কৃত্রিম, আড়ষ্ট। সবই তিনি শুনেছেন, সবই জানেন। অথচ বাইরে তিনি সরল, উদাসীন থাকার একটা ভান করেন। গোপনে গোপনে কেষ্টবাবুর সঙ্গে তাঁরও খুব মাখামাখি। এ ব্যাপারে তিনিও আদৌ প্রসন্ন নন। কিন্তু এখানে সেটা বুঝতে দিতে চান না। বিড়ি টানতে টানতে আরো কি যেন তিনি একটা ভাবছিলেন।

কালিপদবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনি পা দোলাতে দোলাতে অনাদিবাবুকে বললেন, 'দিন দিন আরো কত কি যে দেখব!' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলেন সামান্য।

অনাদিবাবুর মুখের ওপর দুশ্চিন্তার একটা ছায়া পড়েছে। পরমুহূর্তেই আবার সেটা মিলিয়ে গেল। মাথা চুলকে তিনি বললেন, 'তাই ত। এসব ত আমরা ভাবতেই পারি না। দিনকাল বড় তাড়াতাড়ি পাল্টে যাচ্ছে হে। আমরা বড় সেকেলে হয়ে পড়ছি।' কি ভেবে আবার মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকেন।

নির্মলবাবু সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে একটা একটা বৃত্ত তৈরী করছিলেন। তাঁকে বেশ হাসি খুশি দেখাচ্ছিল। তিনি একবার আড়চোখে অনাদিবাবুকে দেখলেন। পরে হেসে হেসে বললেন, 'আপনি কি চান, দিনগুলো এক জায়গায় থেমে থাকে!'

অনাদিবাবু বাইরে কোন বিরক্তিভাব দেখালেন না। বিনীত ভঙ্গিতে, মোলায়েম গলায় বললেন, 'আমি চাইলেই কি মাস্টারমশায়র তা থেমে থাকবে?'

'না, তা থাকে না, থাকবে না। তবে আর আপনার এ দুঃখ কেন?' নির্মলবাবু ওঁর চোখে চোখে চেয়ে থাকেন। মুখে হাসি। আস্তে আস্তে সিগারেট টানেন তিনি।

অনাদিবাবু হেঁ হেঁ করে হাসেন, 'না না, দুঃখ কোথায় দেখলেন, আপনি ভুল করছেন মাস্টারমশায়, এতে কি কারো দুঃখ হয়?'

'হয়। তবে সকলের হয় না। কারো কারো হয়। এটা মানুষের স্বভাব। যে ধ্যান-ধারণার মধ্যে মানুষ একবার বড় হয়ে ওঠে, সেগুলোকেই সে জীবনভর আঁকড়ে ধরে থাকে, থাকতে চায়। কিন্তু তা তো হয় না! নদীর স্রোত কি সব সময় একই ভাবে চলে? চলে না। আপনিই বলুন না, এখানে একদিন জীবনের গতিটা যে ধারায় তর তর করে বয়ে যাচ্ছিল, এখনও কি সেই একইভাবে তা চলেছে?'

'হেঁ হেঁ, তা কি করে হয়!' বিড়িটা অনেকক্ষণ নিবে গেছে। এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল। আবার ধরিয়ে নিলেন। জোরে জোরে টানলেন।

নির্মলবাবু হাসলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এগ্‌জ্যাক্‌ট্‌লি। কখনই তা হয় না, হতে পারে না।'

কালিপদবাবু উসখুস করছিলেন। কি যেন একটা তিনি বলতে চাইছেন। সবার মুখের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে আনলেন। নির্মলবাবুর মুখের ওপর এসে দৃষ্টিটা স্থির হল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'বাইরেটাই যা চকচক করছে, কিন্তু ভেতরটা যে এদিকে ফাঁপা হয়ে যাচ্ছে।'

নির্মমবাবু হেসে ফেললেন, 'ওটা আপনার চোখের দোষ।'

কালিপদবাবু ক্ষুণ্ণ হলেন। মুহূর্তে মুখের রঙ যেন বদলে গেল। একটা ঢোক গিলে সামান্য কুপিত গলায় তিনি ফের বললেন, 'তা আপনাদের চোখ আর পাব কোথায়?'

'দেখতে চাইলে, আপনার চোখ দিয়েই সব দেখতে পাবেন।' নির্মলবাবুর মুখে মৃদু হাসি। গলার স্বর শান্ত।

কালিপদবাবু একটু ঝাঁজের গলায় বললেন, 'আমরা ত

দেখছি, এখানে একদিন স্কুল ছিল না, স্কুল হয়েছে, রাস্তাঘাট ছিল না, তাও হয়েছে, আরো হবে।'

নির্মলবাবু সিগারেটের টুকরোটা বারবার ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছেন। ওঁর চোখের দিকে অল্পক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ব্যাস, এই ?'

আশুতোষবাবু বললেন, 'কেন, আরো বল, এখানে একদিন কেউ বাইরের দুনিয়ার কোন খোঁজ-খবরই রাখত না, এখন তা রাখছে। শুধু তাই নয়, এরা এখন অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছে।'

অনাদিবাবু চোখ পিট পিট করে তাকালেন একবার। মুখের ওপর সামান্য হাসি ধরে রেখে বললেন, 'আগে এখানে বাইরের লোক কেউ খুব একটা আসত না মাস্টারমশায়! এখন দেখছি অনেকেই আসছে।'

ধীরেনবাবু সোজা ভাবে বললেন, 'তাতে আপনার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে ?'

অনাদিবাবু জিভ কাটলেন। একটু যেন লজ্জা পেলেন। হাত কচলে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'ছি ছি, আমার অসুবিধা হবে কেন! আমি ত বলি, এ ভালই, এরকমই ত চাই।'

'তাই নাকি ?' ধীরেনবাবু তেরছা চোখে একটুক্ষণ চেয়ে থাকেন। হাসেন কি ভেবে।

'হেঁ হেঁ, আপনারা আমাকে ঠিক বুঝতে পারেন না।' অনাদিবাবুর তখনো রাগ নেই।

'তা ঠিক, আপনাকে বোঝা বড় মুশকিল।' কার্তিকবাবু জোরে জোরে হাসলেন।

'হাসুন হাসুন, আরো জোরে হাসুন।' অনাদিবাবু বিড়িটা টিপে-টুপে ফেলে দিলেন। মশলা ফুরিয়ে গেছে, খেয়ে ঠিক সুখ হল না। ভেতরে ভেতরে যেন তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, মুখ-চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। তিনি মুখ গম্ভীর করে বসে থাকলেন।

নির্মলবাবু অনাদিবাবুর মুখের ওপর থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে কালিপদবাবুর ওপর রাখলেন। ভাল করে দেখলেন অল্পক্ষণ। দু আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের টুকরোটা জ্বলছে। কি ভাবতে ভাবতে আরো কয়েকটা টান দিলেন টুকরোটা। পরে ফেলে দিলেন। হাসলেন সামান্য। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'এ সবই কিন্তু আপনাদের ওপর ওপর দেখা।'

কালিপদবাবুও ওঁর চোখে চোখে তাকালেন। ভেতরের জ্বলুনি তখনো যেন তাঁর কমে নি। একটু পরিহাসের গলায় বললেন, 'ভেতরের দেখাটা তাহলে কি?'

'সে তো আপনিও জানেন।' নির্মলবাবু হাসছিলেন তখনো।

কালিপদবাবু যেন বিরক্ত হলেন। বেজার মুখে বললেন, 'এসব হেঁয়ালি রেখে দিয়ে আসল কথাটা বলেই ফেলুন না।' অন্যদিকে তাকালেন তিনি।

'বলব, নিশ্চয়ই বলব।' নির্মলবাবু চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ।

বিমলবাবু বেঁকা চোখে একবার দেখলেন ওঁকে। খানিকক্ষণ পরে একটু উপহাসের ভঙ্গিতে বললেন, 'তাছাড়া এখানকার আরো অনেক উন্নতি হয়েছে।'

'বলছেন আপনি?' নির্মলবাবু ওঁর চোখে চোখে চেয়ে মুখ টিপে হাসলেন।

'বারে, চোখে দেখছি আর বলব না!' ওঁর গলায় ঠাট্টা, বিদ্রূপ! ওঁর বলার ধরন দেখে কালিপদবাবু, অনাদিবাবু হাসলেন। অন্যরা একটু অবাক চোখে চেয়ে আছেন। ওঁর কথার মধ্যে যে খোঁচা ছিল এটা বুঝতে ওঁদের কোন অসুবিধে হল না।

নির্মলবাবু হাসি হাসি মুখে শুধোলেন, 'কি দেখেছেন আপনি?'

'অনেক কিছু। এই ধরুন, লোকের এখন চোখ ফুটেছে। চাষাভুষো লোকের সাহস বেড়েছে। আগে সাত চড়েও মুখে রা

বেরোত না, আজকাল ওরা মুখের ওপর অপমান করতে পারে, শুধু পারে না, করছেও!'

বিমলবাবুর কথা শুনে অনাদিবাবু যেন খুশি হলেন। মুখের ওপর থেকে ক্ষোভের ছায়াটা যেন এইমুহূর্তে তাঁর সরে গেছে। তিনি আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে নিলেন। ফুঁক ফুঁক করে বিড়ি টানলেন। একসময় নির্মলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, 'এই আপনারা এসেই কিন্তু মাস্টারমশায় লোকগুলোর মাথা খেয়েছেন।'

নির্মলবাবু কিছু বলার আগেই কার্তিকবাবু বললেন, 'এ ধারণাটাই আপনার ভুল। এ কিন্তু হতই।'

'হতই!' অনাদিবাবু অবাক হন।

'নিশ্চয়ই।' নির্মলবাবুর চোখ-মুখ যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তিনি অনাদিবাবুর চোখে চোখে চেয়ে আছেন। মনে মনে কি যেন ভেবে নিলেন। গলায় জোর দিয়ে বললেন, 'এই হল ইতিহাস!'

'ইতিহাস?' অনাদিবাবু হেসে ওঠেন। বিমলবাবু ভুরু কোঁচকান।

'ইয়েস্, ইতিহাস। এ কোন হাসির কথা নয়।' গলার স্বর গম্ভীর। বলিষ্ঠ।

'তা একটু বুঝিয়ে বলুন না, আমরা হলুম গিয়ে গাঁয়ের মানুষ, অতশত বুঝি না।' সামান্য নড়েচড়ে বসেন অনাদিবাবু। মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। যেন শোনার কত আগ্রহ। হয়ত ভেতরে ভেতরে তিনি তখন অন্য কিছু ভাবছেন। থেকে থেকে বিড়ি টানছেন।

নির্মলবাবু কি যেন ভাবলেন একটু সময়। বোধহয় কথাগুলো তিনি মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। চোখে চোখে তাকালেন। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'মনে রাখবেন, সমাজে যখন বড় রকমের কোন উলটপালট হয় বা হওয়ার সময়

ঘনিয়ে আসে, তখন তার আগে ছোট ছোট অনেক কিছুই ঘটে। টুকরো টুকরো ঘটনা। মনে হয়, এগুলো সব আলাদা, বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার। আসলে কিন্তু তা নয়, এগুলোর ভেতর দিয়েই একদিন বড় ঘটনাটা অনিবার্য হয়ে ওঠে।' নির্মলবাবু হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে থাকেন।

'বুঝলাম না। আর একটু সোজা করে বলুন।'

নির্মলবাবু কিছু না বলে একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'নদীতে ঢেউ দেখছেন তো ?'

'হ্যাঁ, তা দেখেছি।' অনাদিবাবু তখনো যেন কিছু ধরতে পারছেন না এমনভাবে চেয়ে থাকেন।

'কি মনে হয় আপনার ?'

'কি আবার মনে হবে, কিছুই মনে হয় না।'

'এটা কি আপনার কখনো মনে হয় না, ঢেউগুলো সব আলাদা, একটার সঙ্গে আর একটার কোন যোগ নেই ?'

অনাদিবাবু হেঁ হেঁ করে হাসেন। ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, 'সে ত মাস্টারমশায় চোখেই দেখা যায়।'

'এই বাইরের দেখাটাই সব নয়, এর পেছনেও আর একটা দেখা আছে। আমি সেই দেখাটার ওপরই জোর দিতে চাইছি। সেখানে দেখবেন, এগুলো আলাদা কিছু নয়, একটা সুতোতেই বাঁধা আছে।'

'বেশ ত, এর দ্বারা আপনি কি বোঝাতে চাইছেন।'

নির্মলবাবু আবার হাসলেন, 'আমার বলার উদ্দেশ্য এটাই যে, এ ঘটনাগুলোর পেছনেও একটাই ইতিহাস কাজ করে যাচ্ছে। এগুলোকে আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে। কেষ্টবাবুর ঘটনাটা আলাদা কোন ঘটনা নয়। এরকম ঘটনা ঘটতই, আরো হয়ত অনেক ঘটবে। সমাজ-জীবনেরও একটা প্রচণ্ড স্রোত আছে। চিরকাল একইভাবে সেই স্রোত প্রবাহিত হয় না।

মাঝে মাঝেই খাত পরিবর্তন করে।' নির্মলবাবু চুপ করে থাকলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে ফের বলতে শুরু করলেন, 'এখানে মান অপমানের কোন ব্যাপার নেই। খোলা চোখে ঘটনাটাকে দেখবার চেষ্টা করুন। দেখবেন, এটাই স্বাভাবিক। কেষ্টবাবুকে এখানে আলাদা করে দেখার কিছু নেই। সমাজে এরকম অনেক কেষ্টবাবু আছে। এরা জোতদার, মহাজন। এদের হাতে অনেক ক্ষমতা। আর গোবর্ধন? ওরা সংখ্যায় অসংখ্য। ওরা ভূমিহীন ভাগচাষী। মহাজনের কৃপার ওপর ওরা বেঁচে থাকে। দুঃসময়ে মহাজনেরা যেটুকু সাহায্য করে, ফসল ওঠার সময় সেই মহাজনরাই সুদে আসলে একদিন তা আদায় করে নেয়। এজন্যে গোবর্ধনদের আরো অনেক মাশুল দিতে হয়। মাসের পর মাস ওরা বেগার খাটে, খাটতে হয়। মহাজনদের ওরা নানাভাবে মন ভেজায়। কি করবে, না ভিজিয়ে কোন উপায়ও নেই। ওরা চটে গেলে তো আরো সর্বনাশ। সামান্য জমিটুকুর বিনিময়ে ওরা সব দিতে পারে, সব! মান ইজ্জত কোনটাই ওদের কাছে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় নয়। ওই জমিটুকুই যে ওদের বেঁচে থাকার অবলম্বন! ওটা ওরা কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী নয়। আপনারা তো সবই জানেন।' নির্মলবাবুর গলায় আবেগ। চোখে-মুখে কিসের যেন ঘোর। সামান্যক্ষণ নীরব থেকে কি যেন ভাবলেন তিনি। সিগারেট টানলেন ধীরে ধীরে। অনেকটা অন্যমনস্ক ভঙ্গি। ধোঁয়াটা যেন গলায় আটকে গেল হঠাৎ। কাশলেন কয়েকবার। অনাদিবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ফের বলতে শুরু করলেন, 'এই বঞ্চনার অভিশাপ নিয়েই ওরা জন্মে, এই অভিশাপ নিয়েই ওরা মরে। এমনি করে কত বছর যে পার হয়ে যায়! কিন্তু এ কতকাল চলবে বলুন? একদিন অভিশাপের এই জমাট অন্ধকারটা নড়ে ওঠে। সমাজের বুকে নতুন ঢেউ ওঠে, নতুন জোয়ার আসে। চোখের সামনে সব কেমন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। নতুন ইতিহাস তৈরী হয়। একে

রোধ করা কি কখনো সম্ভব ? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই ঢেউ এখানেও এসে লেগেছে। এ তো শুধুমাত্র একজন কেষ্টবাবুর সঙ্গে একজন গোবর্ধনের বিবাদ নয়, এ হল একটা শ্রেণীর সঙ্গে আর একটা শ্রেণীর লড়াই। এটা তার সূচনা মাত্র। সবে শুরু, শেষটা আমরা হয়ত দেখে যেতে পারব না, কিন্তু এর শেষ একদিন হবেই। আর শেষের সেই লড়াইয়ে দেখবেন গোবর্ধনদের দলটাই জিতে গেছে।' ওঁর বলার ভঙ্গি দৃপ্ত, ঋজু ও স্পষ্ট। সিগারেটের টুকরোটা আরো ছোট হয়ে এসেছে। একমুখ ধোঁয়া নিয়ে আবার তিনি ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরী করার খেলায় মেতেছেন।

খানিকক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলেন নি। সবাই যেন কিরকম এক আচ্ছন্নতার মধ্যে আটকা পড়ে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আশুতোষবাবু বললেন, 'কথাটা কিন্তু ভালই বলেছেন, এরকম করে ত এত তলিয়ে দেখি নি ব্যাপারটাকে !'

অনাদিবাবু হেঁ হেঁ করে হাসলেন, 'তলিয়ে না দেখে ভালই করেছ, অত বুঝে ফেললে অশান্তি আরো বাড়ত।'

আমি মুচকি মুচকি হাসছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কালিপদবাবু বললেন, 'আপনি ত কিছু বলছেন না মাস্টারমশায় ?'

সহাস্যে বললাম, 'শুনছিলাম আপনাদের কথা।'

পণ্ডিতমশায় কালিপদবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওঁর আর বলার কি আছে। সবে নতুন এসেছেন, এখনো ত এখানকার কিছুই চেনাজানা হল না। আগে পুরনো হোন, পরে বলবেন।'

অনাদিবাবু আড়চোখে পণ্ডিতমশায়কে দেখলেন। মুখের ওপর তাঁর তির্যক হাসি। টেনে টেনে বললেন, 'তুমান্‌কে ওকালতি করতে কে কয়ঠে।'

ধীরেনবাবু বললেন, 'পণ্ডিতমশায় ত ঠিকই বলেছেন, উনি নতুন, ওঁকে আর এর মধ্যে টেনে লাভ কি !'

অনাদিবাবু হেসে হেসে বললেন, ‘না, তখন মু চুপ কর্‌্যা আছু, একটাও কথা কয় নি, তাই।’

ধীরেনবাবু ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ‘অত মাথাব্যথা কেনি! সময় হইলে ঠিক কইব।’

‘মাথাব্যথার আবার হইল কি, বাজে কথা কইবু নি ত!’ অনাদিবাবু বিরক্ত হলেন। গলার স্বর রুক্ষ, একটু অবিনীত। তাঁর চোখ-মুখের রঙ মুহূর্তে বদলে গেল। এতক্ষণ ধরে অনেক খোঁচা খেয়েছেন তিনি। এটা আর সামলাতে পারলেন না। কৃত্রিম, হাসি হাসি আচ্ছাদনটা মুখের ওপর থেকে যেন সহসা খসে পড়ল। তিনি চুপ করে অন্যদিকে চেয়ে থাকলেন।

বিমলবাবুও মুখ গোমড়া করে বসে আছেন। কালিপদবাবুও কেমন চুপসে গেছেন। আর কোন কথা বলছেন না।

খানিকক্ষণ কেউ আর কোন কথা বললেন না। কার্তিকবাবু যেন মনে মনে কি একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন। মুখের ওপর তার রুষ্ট, বিরক্ত ছায়া পড়েছে। মাঝে মাঝে ভেতরের উত্তাপ চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। একটু পরে কার্তিকবাবু মুখ তুলে তাকালেন। দেখে নিলেন সবাইকে। পরে সামান্য উষ্ণ গলায় বললেন, ‘কেষ্টবাবু নিজেকে খুব বেশী চালাক ভাবেন। তিনি ঠিকই করে নিয়েছিলেন, গোবর্ধনদাকে জমিটা কিছুতেই এবার দেবেন না। স্কুলের জমি, সেখানেও ওঁর লোভ, কেন? ও বেচারা কতদিন থেকে পেছন পেছন ঘুরছে, কত কাকুতি মিনতি করছে, তবু রাগ পড়ে না। চোরের মার গলা বেশী।’

পণ্ডিতমশায় রসাল করে বললেন, ‘পরাণকে যে ওঁর খুব মনে ধরচে! আহা, ওর দুঃখে যে বুকটা ফাটি যায়ঠে।’

‘সে ত যাবেই।’ ধীরেনবাবু হেসে ফেললেন।

‘আইজ-কাইল ওর বাড়ি অত ঘন ঘন যায়ঠে কেনি, কইতে পারু!’ পণ্ডিতমশায় অপলকে চেয়ে থাকেন।

'এ দোষ আর মারলেও যাবে নি।'

'পরাণের বউটা নাকি দেখতে ভাল?' পণ্ডিতমশায়ের গলায় কৌতুক। দৃষ্টিতে কি এক মজা যেন উঁকিঝুঁকি মারে।

কার্তিকবাবু বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন।'

আশুতোষবাবু হাসলেন কি ভেবে। একটু পরে বললেন, 'ভাগ্যধরের ঘটনাটা মনে আছে?'

'তা আর থাকব নি। ওর বউটাকে ত প্রথমে কাকদ্বীপ পরে ডায়মণ্ডহারবার রাখ্‌থল। তারপর কবি যে একদিন চিড়িয়া পালিচে, কেউ জানে নি!' পণ্ডিতমশায় হা হা করে হাসছিলেন।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। কার্তিকবাবু বললেন, 'কেষ্টবাবুর ওপর জমি বিলির ভার থাকলে এসব হবেই। তাছাড়া, বিল্ডিং-এরও অনেক টাকা আসছে, এখন থেকেই তিনি লেজ নাড়তে আরম্ভ করেছেন। ওঁকে এসবের মধ্যে আর রাখা চলবে না। আপনারা কি বলেন?'

'আমরাও তাই চাই।' সমস্বরে কয়েকজন বললেন।

অনাদিবাবুরা চুপ করে থাকলেন।

তের

নির্মলবাবু সম্পর্কে প্রথম থেকেই আমার একধরনের কৌতূহল। কলকাতার ছেলে। কৈশোর এবং যৌবনের অনেকগুলো বছর তাঁর কলকাতায়ই কেটেছে। তিনিও কি একদিন আমারই মতন চাকরির খোঁজ করতে করতে এখানে এসে পড়েছিলেন? ফিরব ফিরব করেও আর ফিরতে পারলেন না? প্রথম দিকে আমার এরকমই মনে হয়েছিল। খানিকটা অন্তরঙ্গ হওয়ার পর বুঝেছিলাম, আমার ধারণা ভুল। আমার মতন কাঙাল হয়ে তিনি এখানে আসেন নি। এসব চাকরির জন্যে তিনি বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামান নি। প্রয়োজনও ছিল না। এখানে আছেন বলেই তিনি এ চাকরিটা করছেন। না করলেও চলে। এখানে যে কেন তিনি এভাবে পড়ে আছেন, জানি না। মাঝে মাঝে জানার ভীষণ ইচ্ছে করে। প্রথম কি করে তিনি এখানকার সন্ধান পেলেন? এতদূরে এসে তিনি বিয়েই বা করলেন কেন? বড় অদ্ভুত, মেজাজী মানুষ তিনি। মাঝে মাঝে যেন তাঁকে কথায় ভর করে। তখন কথা আর ফুরোতে চায় না। বুকের ভেতরে তাঁর এখনো কত আবেগ। চোখে স্বপ্নের ঘোর। এই নদী আকাশ মাঠ প্রান্তর এখনো যেন ওঁকে হাতছানি দেয়। আমাকে পেয়ে যেন ওঁর খুশি আরো বেড়েছে! আমারও মনের জোর অনেকটা বেড়ে গেছে। আমি একদিন ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি তো এখানে অনেক দিন আছেন, না?'

'হ্যাঁ, তা প্রায় বছর চারেকের কাছাকাছি।' নির্মলবাবু হাসি-হাসি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, 'কেন, অবাক হচ্ছেন নাকি?'

'একটু।' আমার মুখে মুচকি হাসি।

নির্মলবাবু আমার কথা শুনে হাসলেন জোরে জোরে। পরে সামান্য হেঁয়ালির মতন করে বললেন, 'আমি নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। সংসারে সবই সম্ভব।'

'আপনার কোন অসুবিধে হয় না?'

'প্রথম প্রথম একটু হত। এখন সয়ে গেছে।' নির্মলবাবু আমার চোখে চোখে চেয়ে ফের বললেন, 'আপনিও থাকুন, দেখবেন খারাপ লাগবে না।'

'আপনার তো এখানে স্কুলের চাকরির কোন দরকার ছিল না!'

নির্মলবাবু হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। পরে সামান্য উদাস গলায় বলেছিলেন, 'কার যে কোথায় কখন দরকার পড়ে যায়, কেউ তা বলতে পারে না। আমিই কি কখনো ভেবেছিলাম, এখানে এসে এভাবে থেকে যাব! অথচ থেকে তো গেলাম।' বলতে বলতে কেমন যেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, এসব স্কুল-মাস্টারির কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। স্কুলে চাকরি করলে তো আমি কলকাতার ওপরই করতে পারতাম। তাছাড়া মাস্টারি করলে স্কুলে কেন, কলেজেই করতে পারতাম। সে সুযোগ আমার ছিল। যে চাকরির কথা আমি জীবনেও ভাবি নি, শেষে তাই করতে হচ্ছে। একেই বলে কপাল।'

আমি সকৌতুকে আবার শুধোই, 'তবে আর এখানে এলেন কেন?'

নির্মলবাবুর মুখের ওপর পাতলা এক রহস্যের হাসি। আস্তে আস্তে তিনি বলেছিলেন, 'সেই তো এক মজার ব্যাপার।'

মজার ব্যাপারটা যে কি, আজো তিনি তা পুরোপুরি খুলে বলেন নি। কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন। কলকাতায় টাউন-স্কুলে পড়াশুনো করেছেন। আমিও তো ওই স্কুলেরই ছাত্র।

শুনে ভীষণ খুশি হয়েছেন। আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছেন, 'আপনি কোন্ ইয়ারে পাস করেছেন?'

'ফিপটি ফাইভ।'

'আমি তো ফিপটি ওয়ান। আপনাদের সময়ে বিভূতিবাবু ছিলেন না?'

'হুঁ—, দুই বিভূতিবাবুই ছিলেন।'

'ছোট বিভূতিবাবু গ্রে-স্ট্রীটের ওপর আমার পিসীমার বাড়ির কাছেই থাকতেন। জ্যোতিষ চর্চা করতেন। কি চিমটিটাই না কাটতেন!'

আমি হেসে ফেলেছি, 'হ্যাঁ, উনি চিমটি স্পেশালিস্ট।'

'যা বলেছেন!' হো হো করে হাসলেন তিনি। মনে মনে আরো কি যেন ভাবলেন। পুরনো দিনের যেন অন্য এক নেশা বা স্বাদ আছে। মনে হয়, সে-দিনগুলো যদি আবার একবার ফিরে পাওয়া যেত! যা যায়, তা তো আর ফিরে আসে না! মাঝে মাঝে মনে পড়ে। মনটা থেকে থেকে কি এক বিষণ্ণতায় যেন ভিজে ওঠে। কৈশোরের দিনগুলো এখনো যেন সময় সময় কেমন আনমনা, উদাস করে দেয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলেছিলেন, 'বড় বিভূতিবাবু আমাদের অঙ্ক করাতেন।'

'আমাদেরও।'

'আমাকে খুবই ভাল বাসতেন।'

'উনি তো সবাইকেই ভালবাসতেন।'

'তা ঠিক, কখনো ওঁকে রাগ করতে দেখি নি।' অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করেছেন, 'প্রিয়রঞ্জনবাবু কেমন আছেন, জানেন?'

'আমার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় নি। ওদিকে তো আর যাই-টাই না!'

নির্মলবাবু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। চোখে তাঁর ঘোর।

কি একটা ভাবতে ভাবতে সামান্য কাতর গলায় বলেছিলেন, 'সে-দিনগুলো বড় ভাল ছিল, তাই না?'

'মাঝে মাঝে মনে পড়লে ভীষণ কষ্ট হয় আমার।'

'আমারও। ওঁদের ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে।'

'পুরনো দিনের অনেককেই এখন আর পাবেন না। নতুনরা তো আর আমাদের চিনবে না!'

'পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে আছে আপনার?' নির্মলবাবু আমার দিকে চেয়ে থাকেন।

'হুঁ—, মনে আর থাকবে না! বড় আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। প্রথমেই প্রত্যেক ছেলের দেশ কোথায়, বাবার নাম কি, ক ভাই ইত্যাদি নানারকম কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। আমরা ছেড়ে আসার বছর দুয়েক পরেই তিনি রিটায়ার করেছেন। তিনি মারা গেছেন।'

'কে জানে, হয়ত আরো অনেকেই এরমধ্যে স্বর্গে গেছেন।' কথা বলতে বলতে ওঁর বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে আসে। চোখের ওপর বিষণ্ণ ছায়া। মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। একটু চুপ করে থেকে ফের বলেন, 'সরোজবাবুর কথা আমার খুব মনে পড়ে। দেখতেও যেমন, পড়াতেনও তেমন। ওইরকম বাংলার শিক্ষক জীবনে আর একজনও পেলাম না। শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা যেন কিরকম করত। অমাবস্যা, পূর্ণিমা এলে নদীর বুক যেমন টনটন, ছটফট করে, আমাদেরও সেইরকম অবস্থা। সব ভুলে যেতাম। শব্দগুলো যেন কানের চারপাশে কেবলই গুঞ্জন করছে। স্বরের কী মধুর ওঠা নামা! মনের মধ্যে একটার পর একটা যেন তরঙ্গ ফুটছে। ফুটছে তো ফুটছেই। মনে হত, কোন এক রাজা-বাদশার অন্দর-মহলে ঢুকে পড়েছি, এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে কেবলই ঘুরে মরছি। দেখার তো আর শেষ হয় না! আর যদি কখনো তিনি বুঝতে পারতেন যে আমাদের মধ্যে কেউ লেখে-

টেখে তবে তো আর কথা নেই! সেই কিশোরবয়েসেই তিনে আমার বুকের ভেতরে এক স্বপ্ন গেঁথে দিয়েছিলেন। ভীষণ ভালবাসতেন আমাকে।' নির্মলবাবুর চোখে-মুখে, কণ্ঠস্বরে যেন আজো পুরনো দিনের সেই উত্তাপ, আবেগ। চোখের ওপর যেন এখনো সেই রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন। এসব কথা মনে পড়লে এখনো তাঁর বুকে ঢেউ ওঠে।

সরোজবাবু ভাল পড়াতেন, এটা মিথ্যে নয়। তাঁর পড়ানোর ঢঙটাই অন্যরকম। কঠিন জিনিসের ভেতরেও তিনি প্রাণ এনে দিতে পারতেন। তাঁর কথা শুনতে আমাদেরও ভাল লাগত। কিন্তু নির্মলবাবু আজো যেভাবে আবেগ বোধ করেন, আমার সেরকম কোন ব্যাপার নেই। আমার মনে এরকম রাজপ্রসাদের তুলনা কখনোই আসে নি, আজো আসে না। আমি খানিকক্ষণ ওই মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম. 'আপনি লেখেন-টেখেন নাকি ?'

নির্মলবাবু ম্লান একটু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'লিখতাম একটু-আধটু, ছাপাও হয়েছিল কয়েক জায়গায়।'

'কি লিখতেন ?'

'কবিতাই বেশী লিখেছি!'

'এখন আর লেখেন না ?'

'না, লেখা-টেখা আর আসে না।' নির্মলবাবু গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে থেকে বলতেন, 'বিশ্বাস করুন, মাঝে মাঝে লিখতে ভীষণ ইচ্ছে করে, বুকের ভেতরটা ছটফট করে। এই নদী সাগর, ঝড় আকাশ যেন আজো কানাকানি করে আমাকে কি শোনাতে চায়। বুকের মধ্যে কার যেন গোঙানি! আমি অস্থির হয়ে পড়ি। লিখতে বসেও দেখেছি; পারছি না, পারছি না। আমি মনের মতন কোন শব্দ খুঁজে পাই না। আমি ফুরিয়ে গেছি·

অরুণাংশুবাবু, আমি শেষ হয়ে গেছি। কবিতা আর আমার জন্যে নয়। এতকাল কোন্ মায়া হরিণের পেছনে আমি ছুটে বেরিয়েছি?' নির্মলবাবুর কণ্ঠস্বরে বেদনা, চোখে-মুখে যন্ত্রণা। না জেনে ওর মনের কোথায় যেন খোঁচা দিয়ে ফেলেছি। ভেতরে ভেতরে তিনি যে এত নরম, আমার ধারণা ছিল না। ওঁর চোখের ভেতরে যেন তখনো এক স্বপ্নের ঘোর। কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আজো সেই পরশমণির সন্ধান পেলেন না।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে আমি আবার জিজ্ঞেস করেছি, 'এখানে আপনি কি করে এলেন?'

নির্মলবাবুর চোখে আবার সেই রহস্যের ছায়া ঘনায়। মুখের ওপর সেই একই রকম হাসি। পরে আমার চোখে চোখে চেয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে তিনি বলেছেন, 'এও আমার এই নেশা। সে ভারী এক মজার ব্যাপার, অন্য একদিন শোনাব।'

বুঝতে কষ্ট হত না, তিনি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। এর পর পীড়াপীড়ি করলেও কোন লাভ হবে না। যত দেখছি মানুষটাকে, কথা বলছি, ততই যেন অবাক হয়ে যাচ্ছি। বড় অদ্ভুত লোক তো! কথা বলতে বলতে, সিগারেট টানতে টানতে প্রায় সময়ই তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন। কেন জানি না, আমার মনে হত, ওঁর বুকের গভীরে কোন দুঃখ লুকনো আছে। সেখানে সামান্য টোকা লাগলেই যেন কিরকম হয়ে পড়েন তিনি। সবার কাছে তো আর সব কথা বলা যায় না! আমাকে এখানে পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। এরই মধ্যে আমার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। আমার কাছে কোন কথা বলতে যেন ওঁর সঙ্কোচ নেই। বরং, নিজেকে অনেকখানি হালকা বোধ করেন। আমিও অকপটে ওঁর কাছে সব কথা বলতে পারি।

নির্মলবাবুই আমাকে একদিন কথায় কথায় বলেছেন, 'আপনাকে তো বলেছিই, ছেলেবেলা থেকেই আমি পিসীমা পিসেমশায়ের কাছে

মানুষ। গ্রে-স্ট্রীটের ওপর বিরাট বাড়ি। পিসেমশায়ের ওষুধের বিজনেস। অঢেল টাকা। ছুটো গাড়ি। অভাব অনটন কি জিনিস, কখনো বুঝি নি। কিন্তু ওই প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও আমার মনে কোন সুখ বা শান্তি ছিল না। কি করে থাকবে বলুন ?'

নির্মলবাবু আবার চুপ করে কি যেন ভাবতেন। দেখতে দেখতে মুখের রঙ কেমন বদলে যেত। চক্ষু-পল্লবে যেন বিষণ্ণ আমেজ। গোপনে, একান্ত আড়ালে যে-ছুঃখ তিনি অনেককাল ধরে লালন করেছেন, তাকেই ধীরে ধীরে তিনি তুলে আনতেন। কেমন আহত, ক্লিষ্ট গলায় বলতেন, 'আমার মার কথাটা আমি ভুলতে পারতাম না।'

'মার কথা ?' আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকতাম!

'হ্যাঁ, মার কথা তো আপনাকে এখনো বলি নি।' বুকের ভেতরটা যেন হা হা করছে। চোখ ছুটো আরো নরম, আর্দ্র হয়ে আসে। মুখখানা কেমন করুণ, অসহায় দেখায়। খানিকক্ষণ নিজের মধ্যে ডুবে থেকে একসময় বলার জন্যে যেন মনে মনে তিনি তৈরী হয়ে নেন। ধীরে ধীরে বলতে শুরু করেন, 'আমার যখন বয়েস সাত কি আট, তখন মা আমাকে ফেলে রেখে চলে যায়। সেদিন যে কি কেঁদেছিলাম না! সে কান্না কি আর সহজে থামে! সে-সব কথা মনে হলে, আজো মাঝে মাঝে চোখে জল চলে আসে। দীর্ঘশ্বাসে বুক ভারী হয়ে ওঠে। ওই বয়েসে মাকে হারানো যে কী কষ্টের, তা আমিই জানি। এমন মাও সংসারে আছে, যার কাছে সন্তানের মূল্য খুবই ঠুনকো।' গলার স্বর যেন তাঁর কিরকম কেঁপে গেল। বুকের মধ্যে থরো থরো আবেগ, হাহাকার। এসব সামলাতে আরো খানিকটা সময় লাগল।

আমি কি যে বলব, বুঝতে পারলাম না। হাঁ করে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি তো আছিই।

খানিকটা শান্ত হয়ে তিনি ফের আরম্ভ করেন, 'আমার আবছা আবছা মনে পড়ে, আমাদের বাড়িতে বাবার এক বন্ধু আসত। প্রায়ই আসত। বাবা বাড়ি না থাকলেও আসত। আমি ওকে কানুকাকু বলে ডাকতাম। এখনো লোকটার চেহারা আমার একটু একটু মনে আছে। একটু বেঁটে, মোটাসোটা চেহারা। নাকের কাছে বড় একটা আঁচিল। কানুকাকু আমার মার সঙ্গে কি যে অত কথা বলত, বুঝতাম না। তবে কেন জানি না, লোকটাকে আমার খুব একটা ভাল লাগত না। মাও যেন কিরকম! গল্প পেলে যেন ওঠার আর নাম নেই। মাঝে মাঝে লোকটা হো হো করে হাসত। মাও হাসত। ওদের গল্পের সময় আমাকে খুব একটা কাছে থাকতে দিত না। মা আমাকে বাইরে গিয়ে খেলা করতে বলত। আমার ভীষণ রাগ হত। বাইরে এসে আমি কেঁদে ফেলতাম। দিন দিনই যেন মা কিরকম হয়ে যাচ্ছিল। বাবা একদিন অপিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল। আমি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছি। অন্য ঘরে মা আর কানুকাকু। হাসাহাসি করছিল। বাবা সোজা আমাকে টেনে নিয়ে ও-ঘরে চলে গেল। বাবাকে দেখে কানুকাকু কেন যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। মুখের হাসি মুহূর্তে কোথায় মিলিয়ে গেল। মনে মনে আমি খুব খুশি হলাম। বাবা মাকে খুব বকল। কানুকাকুকে ইংরেজীতে কি বলল। কানুকাকু মুখ নিচু করে বেরিয়ে গেল। এরপর থেকে মার সঙ্গে বাবার প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হত। রাগারাগি, মারপিটও হত। একদিন আমার সামনেই কি কথা বলতে বলতে বাবা মাকে ঠাস ঠাস করে কটা চড় মারল। মাও ভীষণ চেঁচামেচি, গালিগালাজ করল। তারপর হাউ হাউ করে বুক চাপড়ে অনেকক্ষণ কাঁদল। দুদিন কিছু খেল না, বাবার সঙ্গে কোন কথা বলল না। আমার ওপরও যেন খুব রেগে গেছে। তারপর মাকে একদিন আর খুঁজে পেলাম না আমরা। আমাকে ফেলে রেখেই মা কোথায় যে

চলে গেল। কান্নায় আমার বুক ফুলে ফুলে উঠল। মা কোথায় গেল, মা কেন আসে না। আমি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ি। মার কথা মনে পড়লেই চোখের জলে আমার বুক ভেসে যায়! বাবাও যেন মহাচিন্তায় পড়েছে। এমন সময় পিসীমা এসে একদিন আমাকে নিয়ে গেল। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তখনো মার জন্যে চোখের জল ফেলি।' বলতে বলতে গলাটা কেমন ধরে আসে ওঁর। কষ্ট হয়। বুকের ভেতরে যেন পুরনো ঝড়ের ছটফটানি শুরু হয়। অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে থাকেন। টেনে টেনে নিশ্বাস নিলেন। চোখের কোণা ছুটো কেমন যেন চিক চিক করে। কোন্ অস্ফুট শৈশবে মা তাকে ফেলে রেখে চলে গেল! আজো তিনি সেই কষ্ট নিভৃতে বয়ে বেড়াচ্ছেন! রুমাল দিয়ে চোখটা একবার মুছে নিলেন। কি ভেবে ম্লান একটু হাসলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনে টেনে ফের বলেছিলেন, 'আমার বয়েস যখন তের-টের, সেই সময় হঠাৎ করে একদিন আমার বাবাও মরে গেল। বাস অ্যাক্সিডেন্ট। বুঝলেন, বড় অভাগা আমি। মা-বাবার স্নেহ মমতা পাওয়ারও একটা কপাল চাই। জানেন, মাঝে মাঝে এসব কথা মনে পড়লে আমার খুব কষ্ট হত। সে-কষ্টের কথা কাউকেই আমি বলতে পারতাম না। এমন কি পিসীমাকেও না। চুপচাপ থাকতেই আমার ভাল লাগত। এই নিঃসঙ্গতাই আমাকে একদিন কবিতা লেখাত। এই নিঃসঙ্গতাই একদিন এখানে টেনে নিয়ে এল আমাকে।'

আমি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলেছিলাম, 'এখানে তো নিঃসঙ্গতা আরো বাড়ে।'

নির্মলবাবু সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'প্রথম প্রথম তাই মনে হয়। পরে আর তা থাকে না। এখানকার প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা মায়া আছে, যা মনের এই অবসাদ ভুলিয়ে দেয়। বিশ্বাস করুন, এখানকার নদী ঝড় আকাশ সমুদ্র

আমার এই নিঃসঙ্গতা অনেকখানি দূর করে দিয়েছে। এখানে না এলে বোধহয় আমার এই কষ্ট আরো বাড়ত। সহরের কোলাহল আমার ভাল লাগত না। কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কখনো মিশতে পারতাম না। নিজের ভেতরেই একটু একটু করে আমি হারিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে নিয়ে পিসীমারা যেন বেশ ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন। এম. এ. পড়ার সময় মনোরঞ্জনই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রথম দিনই জায়গাটা আমার ভাল লেগে গেল। আমিও আপনার মতনই বর্ষা মাথায় করে এখানে এসেছিলাম। এই নদী বৃষ্টি আকাশ দেখে আমি যেন কিরকম হয়ে গেলাম। আমি যেন মনে মনে এরকমই একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এই নির্জন নিরিবিলি জায়গাটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিল!'

আমি অবাক চোখে চেয়ে থাকি। ওঁর চোখে-মুখে যেন গাঢ় এক বিষাদের ঘোর। নির্মলবাবু সিগারেট টানতে টানতে আমাকে দেখলেন খানিকক্ষণ। মুখের ওপর মলিন ছায়া তিরতির করছে। কি ভেবে ফের তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তাই। এখানে প্রত্যেকটা ঋতুরই একটা বিউটি আছে। শুধু তাই নয়, বিউটিটা ফিল করা যায়। আপনি তো বর্ষার মুখটাতেই এসেছেন। এখানে বর্ষার আলাদা একটা মাদকতা আছে। নদীর চেহারাটাই এখন অন্যরকম। ভরন্ত, ভারী চেহারা। আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন না? দেখবেন, আকাশটাকে এখন প্রায় সময়ই রাশি রাশি মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে। মেঘের রঙও একরকম থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কালো ধুসর পিঙ্গল। কত রকমের বর্ণের বাহার। রঙে রঙে কত মিশেল। এই ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামে। শোঁ শোঁ করে বাতাস ছুটে। আবার আকাশের দিকে চেয়ে থাকুন, চোখ আর ফেরাতে পারবেন না আপনি। মেঘের গায়ে কত রকমের ছবি, কত রঙ। এই দেখুন একটা পাহাড়। দেখতে দেখতে আবার সেটা কোথায় মিলিয়ে গেল। ওই দেখুন, কেশর ফোলা এক সিংহের মুখ। ওটা

কি, ময়ূরের পেখম না? ওই তো একটা ভাল্লুক। কত জন্তু-জানোয়ারের ছবি, যেন চিড়িয়াখানা। সেগুলোও বেশীক্ষণ থাকে না। কালচে মেঘের গা বেয়ে কখনো বা সূর্যের সোনা-বরণ আলো গড়িয়ে পড়ছে। আর পরক্ষণেই কোত্থেকে এক টুকরো মেঘ এসে সেই আলো গায়ে মেখে নিয়ে চলে গেল। রঙে রঙে যেন রঙমহল। চোখ আর ফেরাতে পারবেন না। এবার কি দেখছেন, একটা রাজপ্রাসাদ মনে হচ্ছে না? ওই তো কত লোক লস্কর সেপাই বরকন্দাজ। আপনিই বলুন তো, এসব ছবি কি মানুষ কখনো আঁকতে পারে? এসব ছবি কি সহজে দেখা যায়? আবার দেখুন, আকাশটা কেমন নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল। এমনি করেই আকাশের বুকে কত রকমের খেলা চলে! এর আর শেষ নেই। আবার মেঘ জমে। আবার মুষলধারে বর্ষা নামে। আমি যেখানে থাকি, সেখান থেকে নদীটা বেশী দূরে নয়। মাত্র দু তিন মিনিটের পথ। একটু উঁচুতে দাঁড়ালেই নদী দেখা যায়, জলের কি ভয়ঙ্কর শব্দ। শুয়ে শুয়েও সেই শব্দ শুনি, শব্দের মধ্যেই যেন কখন ঘুম চলে আসে। শব্দের মধ্যেই আবার ঘুম ভাঙে।' র্মলবাবু ফের খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন! চোখের দৃষ্টিতে তখনো নেশা নেশা জড়িমা। তখনো যেন একটার পর একটা ছবি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছে। সিগারেটের টুকরোটা দু আঙুলের ফাঁকে পুড়েই যাচ্ছিল। আঙুলে তাপ লাগছে। এতক্ষণে খেয়াল হল। কয়েকটা টান মেরে টুকরোটা ফেলে দিলেন। বোঝা যায়, তখনো যেন তিনি এক ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। একটু পরে আকাশটার দিকে চেয়ে আবার যেন তিনি কিরকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সোৎসাহে বললেন, 'দেখুন, দেখুন, আকাশের একটা দিক কেমন কুচকুচে কালো দেখাচ্ছে, বৃষ্টি এল বলে। আবার তার পাশেই কেমন ঝকঝকে চেহারা। রোদের জোয়ার বইছে যেন। আলো-আঁধারির এমন যুগল-মূর্তি আর কখনো দেখেছেন? কত আর দেখবেন, দেখার

কি আর শেষ আছে? এখানকার ঝড় তো এখনো দেখেন নি? কোত্থেকে দেখবেন! দেখলে বুঝতেন, সে কি ভয়ঙ্কর চেহারা। ষাট-সত্তর মাইল বেগে ঝড় ছুটে যাচ্ছে। ঘর-বাড়িগুলো বুঝি ভেঙে শুকনো খড়কুটোর মতন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কেউ আর তখন বাইরে বোরোয় না। কার বুকে আর অত সাহস! খেয়া বন্ধ। নদীর মাতলামো যেন তখন আরো বেড়ে যায়। ঢেউগুলো বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে। নদীর সে কি ফোঁস-ফোঁসানি! ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেও তখন সংহার-মূর্তি ধরেছে। চার পাশেই এক গোঙানির শব্দ ছুটে বেড়ায়। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। ঝড়ের টানে বুঝি নদীর জল ওপরে উঠে আসবে। চোখের পলকে যেন সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বুঝলেন তো, ফি-সনই এখানে একটা দুটো করে এরকম ঝড় হয়! অনেক ঘর-বাড়িও ভেঙে পড়ে। লোকজনও কেউ কেউ মরে। এমনি করেই একদিন বর্ষার আয়ু ফুরিয়ে আসে। আবার যেন সব কিছু অন্যরকম। শরৎ উঁকিঝুঁকি মারে। এবার একবার তাকান দেখবেন, আকাশের গা থেকে যেন সব ময়লা ধুয়ে মুছে গেছে। তখন শুধু নীল আর নীল। চোখ আর ফেরানো যায় না। আপনিও ফেরাতে পারবেন না। ফটফটে সাদা মেঘের টুকরো নীলের গায়ে চুমকির মতন ঝকঝক করে। কখনো বা সোনালী রঙ ধরে। মাঠের বুকে সবুজের ঢেউ। আহা, চোখ জুড়িয়ে যায়। নদীর পাড়ে কাশের ঝোপ। সাদা বকের দল ঘুরে বেড়ায়। শিউলির গন্ধে বাতাসের নেশা ধরে। হেমন্তেরও এখানে একটা ভিন্ন চেহারা আছে। কখনো দেখেছেন সেটা? দেখলে, এখান থেকে আর যেতেই পারবেন না আপনি। মাঠের বুক থেকে তখন মৌ মৌ গন্ধ ভেসে আসে। দিনের আলো তাড়াতাড়ি করে ফুরিয়ে যায়। পাকা সোনার রঙ ধরে। ভোরের বাতাসে শীতের আলসেমি। শিশিরে, ঘাস পাতা গাছ-গাছালি মাঠঘাট সারারাত ধরে নীরবে ভেজে।

সকালের দিকে হেঁটে যান, দেখবেন পা ভিজে গেছে। মাঠে মাঠে ধান পাকে। ঘরে ঘরে নবান্ন। লোকগুলোকে দেখুন একবার, ওদের মুখেও যেন এতদিনে হাসি ফুটেছে। এরই মধ্যে কোন্ ফাঁকে শীত চলে আসে। উত্তুরে বাতাস এসে গায়ে কামড় বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। বাতাসের আর সেই দাপট থাকে না। নদীও কেমন ভেজা বেড়ালের মতন হয়ে যায়। ভীষণ গো-বেচারা। এরা বলে, নদীর হাড় ভেঙে গেছে। আর জোর নেই তেমন। কুয়াসায় ঢাকা থাকে। এখানে তখন মেলা বসে। গঙ্গাসাগরের মেলা। লক্ষ লক্ষ লোক আসে। কত সাধুসন্ত। খেজুর গাছে কলসী বাঁধে! সেই রস জ্বাল দেওয়া হয়। বাতাসে তার গন্ধ ভেসে বেড়ায়। শীতও একসময় বিদেয় নেয়। আসে বসন্ত। দক্ষিণা বাতাস বইতে থাকে। রোদের তেজ বাড়ে। বাতাস শুকনো, হালকা হয়ে আসে। চৈত্রের খটখটে হাওয়া হু-হু করে ছুটে বেড়ায়। দেখতে দেখতে মাঠঘাট তেতে ওঠে। গরম হাওয়া। ধুলো উড়ে। বাতাসে সমুদ্রের গর্জন। কান পাতলে আপনিও তা শুনতে পাবেন। এসময় নদীর হাড় জোড়া লাগে। আবার সেই দাপট ফিরে পায়। মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে। কালবৈশাখী। এরও একটা আলাদা বিউটি। বুঝলেন, আমি কিন্তু এ জায়গার প্রেমে পড়ে গেছি।'

'শুধু কি জায়গার প্রেমেই পড়েছেন, আর কিছু নয়?' আমি মুখ টিপে টিপে হাসি।

নির্মলবাবু আমার চোখে চোখে তাকান। কথার ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে হা হা করে হাসেন! বলেন, 'অত কৌতূহল কেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাবে বলেছি, 'আপনার সেই ইন্টারেস্টিং গপ্পটা কিন্তু এখনো বলেন নি!'

'গপ্প কি মশায়, একেবারে সত্যি ঘটনা, আমারই ঘটনা। বলব, সব বলব।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উৎসাহের গলায় আবার তিনি বলেছেন, 'চলুন, একদিন সমুদ্র দেখে আসি। একবার

ওখানে গেলে আর আসতে ইচ্ছে করে না। আমার যেন নেশা ধরে যায়। মাথাটা যেন কিরকম ঝিমঝিম, ঝিমঝিম করতে থাকে। নিজেকে তখন বড় ছোট, বড় তুচ্ছ মনে হয়। সংসারের ক্লেদ, গ্লানির কথা আর মনে থাকে না। সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। ফিরে আসার পরও বুকের ভেতরটা কদিন ভারী হয়ে থাকে। সমুদ্র কি মশায় কোন জাতু জানে? শরীর মন অমন অবশ করে দেয় কি করে?'

আমি বোকার মতন ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কি বলব। বলার মতন আমার আর অভিজ্ঞতা কোথায়? নির্মলবাবুর কথা শুনে শুনে আমার মনে হয়েছে, তিনি এখনো মনে মনে কবিতা লেখেন। এখনো তিনি কল্পনার পাখায় চড়ে দূর দূরান্তে ভেসে বেড়ান। প্রকৃতির রঙমহলে এখনো তাঁর নিমন্ত্রণ।

এমনি করেই আমাদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আমি সাঁকোটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। খালের জল এসে কয়েকটা আছাড় খেয়ে এখানে পড়ছে। জায়গাটা একটু গর্তের মতন। সামান্য আবর্ত তৈরী করেই জল আবার সবেগে বয়ে যাচ্ছে। এখানে জলের একটা শোঁ শোঁ শব্দ। আকাশের গায়ে মেঘ জমে আছে। কিছু পাতলা মেঘ দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। একটা নরম নরম, বাদলার মলিন ছায়া ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। মাঠে তখনো কাজ চলছে। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ছবি দেখছিলাম। দেখতে দেখতে কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। সত্যই আকাশের গায়ে হরেক রকমের ছবি। আমাকেও যেন এই মুহূর্তে কি এক নেশায় পেয়েছে। কখন যে নির্মলবাবু এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, টেরও পাই নি। হঠাৎ আমার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে শুধোলেন, 'এমন করে দেখছেন কি?'

'আরে আপনি, কখন এলেন?'

'এই মাত্র। দেখলেন তো, টেরও পান নি। আমারও এরকম হয়।'

'ওই মেঘটা দেখছিলাম।'

নির্মলবাবু সিগারেট ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আজকের ওয়েদারটা কিন্তু বড় ফাইন।'

'হ্যাঁ, সকাল থেকেই দিনটা মেঘলা মেঘলা।'

নির্মলবাবু চারপাশে একবার তাকালেন। ওঁকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে। সিগারেট টানতে টানতে একসময় বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কি, চলুন একটু হাঁটা-হাঁটি করি।'

'চলুন।'

আমরা কচু বেড়ের রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। দুপাশে শুধু ক্ষেত। অনেক দূরে দূরে বাড়ি-ঘর, কিছু গাছ-গাছালি চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে বাবলার গাছ। সাঁই সাঁই একটা শব্দ। আকাশের মেঘের তলায় কিছু চিল উড়ছে।

নির্মলবাবু যেন কি ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বললেন, 'আপনাকে তো বলেছি, এম. এ. পড়ার সময় মনোরঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। কেন জানি না, ওর সঙ্গে আমার ভীষণ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। আসলে ও-ও কবিতা লিখত। ওর মুখেই আমি প্রথম এ জায়গার কথা শুনি। এখানেই ওর বাড়ি-ঘর। চারপাশেই নদী। ঝড়-টড়েরও যেন অদ্ভুত এক মাদকতা। ওর মুখে গল্প শুনি আর বুকের ভেতরটা যেন কিরকম করে। এখানে আসার জন্যে আমার ভীষণ লোভ হল। আমিও এমনই এক বর্ষার দিনে এখানে এসেছিলাম। প্রথম দিনেই ওই নদী, মেঘলা আকাশ আমার চোখে এক নেশা ধরিয়ে দিল।' নির্মলবাবু চুপ করে সিগারেট টানলেন।

আমি শুধোলাম, 'মনোরঞ্জনবাবুকে তো একদিনও দেখলাম না?'

নির্মলবাবু হাসলেন সামান্য, বললেন, 'ও এখন আর এখানে

থাকে না। আসাম, গৌহাটির কাছে একটা কলেজে কাজ করে। ছুটিছাটায় আসে।' আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকেন তিনি। খানিকটা ধোঁয়া গিলতে গিলতে বললেন, 'ওদের বাড়িটা একেবারে নদীর কাছে। ঘর থেকেও নদী দেখা যায়। জলের শব্দ শোনা যায়। এখানেই ওর এক খুড়তুতো বোনের সঙ্গে আমার পরিচয়। নাম কাঞ্চন। ও-ও তখন ডায়মণ্ডহারবার কলেজে পড়ে। মনোরঞ্জনের মুখে খবর পেয়ে এসেছে। আমরা নদীর পাড়ে খুব বেড়াতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতাম। কাঞ্চনকে আমার খুব ভাল লেগে গেল। কদিন এখানে থেকে আবার কলকাতায় ফিরে গেলাম। পিসীমাকে কাঞ্চনের কথা বললাম। শুনে ভীষণ রেগে গেল। আমারও সহর আর ভাল লাগছিল না। আমি আবার এলাম এখানে। কাঞ্চনও এল। ওর সঙ্গে আমার মাখামাখি আরো বাড়ল। ওকেই আমি বিয়ে করলাম।' আমার মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে হাসলেন একটু। সিগারেটটা ছোট হয়ে এসেছে। টুকরোটায় আরো কয়েকটা টান মেরে ফেলে দিলেন। অল্পক্ষণ নীরব থেকে ফের বললেন, 'কাঞ্চনের গল্প কিন্তু শেষ হল না। সবে শুরু।' হঠাৎ যেন ওঁর মুখটা মলিন দেখায়। পরমুহূর্তেই আবার হেসে ফেলেন।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেকটা পথ চলে এসেছি। হাওয়ার গতি বাড়ছে। হাওয়াটা যেন কেমন ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা। চরাচরে অন্ধকার ঘন হচ্ছে। আকাশটা যেন আরো নিচে নেমে এসেছে। মাঠের কাজ শেষ করে ক্লান্ত শরীরে আজকের মতন লোকগুলো ঘরে ফিরে যাচ্ছে। আমরাও একসময় ঘরে পথ ধরলাম।

চৌদ্দ

বর্ষার ছুটিতে আমি আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। যেদিন এলাম, সেদিনও আকাশে ঘন মেঘ ছিল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। হাওয়া ছিল এলোমেলো। নদী টাল-মাটাল। চলে আসার সময় ছেলেমেয়েরা অনেকেই খুব কেঁদেছিল। নাম ডেকেই সেদিন স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। বোর্ডিংয়ে যারা ছিল, তারাও সবাই বাড়ি চলে যাবে। দুতিনজন তো ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে। বাকিরাও যাওয়ার জন্যে গোছগাছ করছিল। দীর্ঘ ছুটি, এখানে আর কি করতে থাকবে। একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে বোর্ডিং-হাউস। সকালেই জোয়ার। এই জোয়ারেই আমাকে নৌকো ধরতে হবে। আমিও তৈরী হয়ে নিচ্ছিলাম। কানাই আমার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সবারই মনে তখন ঘরে ফেরার সুখ। একধরনের ব্যস্ততা। কিন্তু কানাইয়ের মুখের ওপর সেরকম কোন চিহ্নও নেই। বরং ওর মনটা যেন আরো খারাপ হয়ে গেছে। আমি ওর মুখের দিকে এক পলক চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কখন যাবে কানাই?'

কানাই আমার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। ওর চোখ ছল ছল করছিল। বুকের মধ্যেও যেন ভীষণ এক কষ্ট। অল্পক্ষণ পরে ক্লিষ্ট, কাতর গলায় ও বলেছিল, 'যাব, আইজ বিকালা চল্যা যাব।' বলতে বলতে ওর গলা ধরে এসেছিল

আমি জানি, ওর কষ্টটা কোথায়। ঘরে যেতে ওর ইচ্ছে করে না। কিন্তু উপায় নেই। এসময় তো ওকে ঘরেই ফিরে যেতে হবে! এছাড়া আর যাবে কোথায়! আমি জানি, ঘরে গেলে আরো অনেক কথা, অনেক টুকরো-টাকরা স্মৃতি ওর মনে পড়ে যাবে। কষ্ট আরো দুঃসহ, আরো তীব্র হবে। লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলবে। কিরকম যেন মনমরা হয়ে গেছে ও। ওর চোখে গভীর এক কষ্ট।

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ণ গলায় ও বলেছিল, 'আসবেন কিন্তু স্যার।' বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল।

আমি ওর মাথাটা আস্তে করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে মমতার গলায় বলেছিলাম, 'হ্যাঁরে আসব, আসব।'

ওর বিষণ্ণ মুখটা আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। হিমাংশুও এই ঝড়-জলের সময় ওর বাবার কাছে ফিরে যাবে। সেরকম সাইক্লোন-টাইক্লোন হলে তো ওদের দ্বীপটা ডুবেই যাবে। ভাবলে আমারই বুকের ভেতরটা কেমন ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। ওখানে ওরা এখনো কিসের মমতায় পড়ে আছে! জীবনের চেয়ে ওই সামান্য জমি জিরেতের দাম কি আরো বেশী! নদী যেখানে সর্বনাশা হয়ে উঠেছে, সেখানে আর কতকাল ওরা থাকতে পারবে! ওই দ্বীপের ওপর নদীর কোপ পড়েছে। ভাঙছে, দ্রুত ভাঙছে। এরই মধ্যে অনেকখানি জমি খাবলে নিয়েছে। বাড়ি-ঘর তুলে নিয়ে লোকেরা ওখান থেকে পালাচ্ছে। কিন্তু হিমাংশুরা ওখানেই পড়ে আছে। আমি একদিন ওকে বলেছিলাম, 'তোমরা আর এই বিপদ মাথায় নিয়ে ওখানে পড়ে আছ কেন, চলে আস।'

'ওই জমিটুকুই যে আমাদের সম্বল স্যার।'

এই বিপদের মধ্যেই ছেলেটা ঘরে ফিরবে। ভাবতেও আমার খুব খারাপ লাগছিল। এই ঝড়-জলের দিনগুলোতেই ভয়টা ওদের আরো বেশী। ও একদিন বলেছিল, 'জানেন স্যার, আকাশ

কালো করে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামলে, তার সাথে যদি পাগলা হাওয়া থাকে এবং তিন চার দিন ধরে তা সমানে চলতে থাকে, তাহলেই আমাদের মুখ শুকিয়ে যায়। বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে আসে। নদীর চেহারাই তখন অন্যরকম। ভয়ে তাকান যায় না। আমাদের আর তখন ঘুম আসে না। লম্ফ জ্বালিয়ে বা তেল না থাকলে অন্ধকারের মধ্যেই আমরা জেগে বসে থাকি। জলের ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনি। ঠাকুর দেবতার নাম করি মনে মনে।'

আমি বলেছিলাম, 'তোমাদের সাহস আছে বলতে হবে।'

হিমাংশু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'এ আর স্যার সাহসের কি হল! এছাড়া যে আর কিছুই উপায় নেই আমাদের!' ওর মুখখানা বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। কেমন যেন অসহায়।

ভানুমতী ক্লাস এইটে পড়ে। আমার জন্যে ও একটা কেয়া ফুল নিয়ে এসেছিল। ফুলটা আমি কলকাতায় নিয়ে এসেছি।

এইটুকু সময়ের মধ্যেই ভীম আমার জন্যে ভাত আর একটা মাছের ঝোল করে দিয়েছিল। আসার সময় ভীম হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তাইলে ঘর যাইঠ!'

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছিলাম। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম, 'হুঁ, যাইঠি।'

আমার কথা শুনে সবাই হেসে ফেলেছিল।

'আবার চল্যা আসব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আসব।'

পণ্ডিতমশায় আমাকে অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষটা বড় ভাল। মনটা ভীষণ নরম। ফিরে আসার জন্যে বার-বার করে বলেছেন। আমার একটা হাত ওর মুঠোর মধ্যে নিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদেই ফেলেছিলেন। ওর স্নেহের উত্তাপে আমার চোখও ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতমশায় বিষণ্ণ চোখে আমার পথের

দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। ওঁর শরীরে যে এত মায়া, আমার তা জানা ছিল না। আমারও বুকের ভেতরটা কেমন করছিল।

নির্মলবাবু আরো অনেকটা পথ আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন। আমার জন্যে তিনিও সামান্য বেদনা বোধ করছিলেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে একসময় বলেছিলেন, 'চলে আসবেন কিন্তু। না এলে খুব কষ্ট পাব।'

নির্মলবাবুর মুখে ম্লান একটু হাসি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'আজকাল কলকাতার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। এক-আধবার যেতেও ইচ্ছে করে।'

'তাহলে' আর কি, চলে আসুন।'

নির্মলবাবুর মুখের ওপর আবছা বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে। কেমন যেন মলিন দেখাচ্ছিল ওঁকে। একটু চুপ করে থেকে আবার তিনি বললেন, 'যাব, কাঞ্চনও বলেছে এবার একবার যাবে।'

আমি অবাক। ওঁর চোখে চোখে তাকালাম।

নির্মলবাবু হয়ত কিছু একটা বুঝতে পেরেছিলেন। আমার বলার আগেই তিনি হেসে বলেছিলেন, 'কাঞ্চনের সব কথা আপনাকে তো বলা হয় নি। এরপরে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। ভারী অদ্ভুত এই কাঞ্চন।'

'তা ওঁকে নিয়েই তো আসতেপারেন।'

'মুশকিল তো এখানেই। ওর মর্জির কোন ঠিক নেই। আজ বলল যাবে, কালই আবার মত পাল্টে গেল। আবার আমাকেও যেতে দেবে না। আর ওকে ফেলে রেখে আমারও যাওয়ার কোন উপায় নেই।'

'কেন?'

নির্মলবাবু কোন উত্তর দিলেন না। অপলকে আমাকে দেখলেন সামান্য। একটা সিগারেট ধরালেন। খানিকটা ধোঁয়া মুখ থেকে

বের করে দিতে দিতে হাসলেন মৃদুভাবে। কি যেন ভাবলেন অল্পক্ষণ। পরে ধীরে ধীরে বললেন, 'এখন আর বেশী কিছু বলব না। শুধু এটুকুই জেনে রাখুন, ওকে এখানে ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারব না।'

কাঞ্চনকে এখনো আমি চোখে দেখি নি। নির্মলবাবুর কথা শুনে ওর সঙ্গে আলাপ করার কৌতূহল আমার আরো বেড়ে গেল। এর মধ্যে কোথায় যেন একটা রহস্য আছে। নানারকম প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে গেল। নির্মলবাবুকে আমার এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ বলে মনে হল। কবি বলে কি সাংসারিক বুদ্ধিও থাকতে নেই! এখানে পা দিয়েই এই নদী, সাগরের প্রেমে পড়ে গেল! এক নজরেই কাঞ্চনকে ভালবেসে ফেলল! নিশ্চয়ই ও দেখতে খুব সুন্দরী! এমন প্রেমিক সংসারে কজন দেখা যায়। সব ছেড়েছুড়ে এখানেই থেকে গেল মানুষটা! হাসতে হাসতে বলেছিলাম, 'এবার ফিরে এসে আপনার কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপ করব।'

'নিশ্চয়ই।'

আমাকে ছেড়ে দিতে নির্মলবাবুর কষ্ট হচ্ছিল। কথা বলতে বলতে তিনি এই পথটা চলে এসেছিলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। এই পথটা আবার একা একা ওঁকে ফিরতে হবে। আমার মুখের দিকে চেয়ে সামান্য বিমর্ষ গলায় বলেছিলেন, 'আপনাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। ঠিক আছে, ঘুরে আসুন।' আর দাঁড়ালেন না।

বলরাম আর সুরেন আমাকে একেবারে খেয়াঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ওরাও কেঁদে ফেলেছিল। চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিল; 'আসবেন কিন্তু স্যার

আমারও চোখ জলে ভরে উঠেছিল। বুকের ভেতরটা কেন যেন ভারী হয়েছিল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। আমি ওদের আশ্বাস দিয়েছি। ওরাও আমার কথা বিশ্বাস করেছে।

বলরামকে সস্নেহে বলেছি, 'তুমি কিন্তু সাপের নেশাটা একটু কমাও ভাই। তোমার জন্য আমার ভীষণ ভয় করে।'

বলরাম আমার কথা শুনে হেসে ফেলে। ও চুপ করে থাকে। ওর চোখে-মুখে ভয়ের ছিটে-ফোঁটা চিহ্নও নেই। কেমন যেন একটু নির্বিকার। ওই একটা নেশাই ওর মাথার মধ্যে থেকে থেকে পাক মারে। তখন আর কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না ওর।

আসার সময় কেষ্টবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তিনি তো কোন্ ফাঁকে এসে চলে গিয়েছিলেন, টেরও পাই নি। বিমলবাবুও তড়িঘড়ি করে চলে গেলেন। বিষ্ণুবাবু তখনো আসেন নি। অনাদিবাবু দু হাত কপালে ঠেকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলেছিলেন, 'নমস্কার, নমস্কার মাস্টারমশায়। আমাদের কথা-টথা একটু মনে রাখবেন। আমাদের ওপর রাগ-টাগ করবেন না। হেঁ হেঁ, গেঁয়ো লোক ত আমরা, কি বলতে কি বলেছি, কিছু মনে করবেন না।'

'আরে না না, আমি কিছু মনে করছি না।'

'আবার আসবেন কিন্তু। আপনারা না এলে কি, হেঁ হেঁ, আমাদের চোখ এমন করে আর খুলত। ভুলে যাবেন না আমাদের। তাহলে চলি মাস্টারমশায়, এলে আবার দেখা হবে। আর দাঁড়াব না।' সেই বিনীত ভঙ্গি। গুটি গুটি করে তিনি চলে গেলেন। এই এক লোক বটে। ভেতরে জিলিপীর প্যাঁচ। সোজা করে কিছু যেন বলতে পারেন না।

কার্তিকবাবু সহাস্যে বলেছিলেন, 'আমরা কিন্তু আপনাকে আমাদেব মধ্যে চাই। সুতরাং, চলে আসবেন।

কলকাতায় ফেরার পরও কটা দিন আমি এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম। চোখ বুজলেই ওখানকার ছবি একটার পর একটা ভেসে উঠেছে। নদীর ফোঁস ফোঁস শব্দ। বাতাসের দুরন্তপনা। আকাশ ভেঙে ঢল নামা। সাগরের গর্জন। সুদর্শনবাবুর সেই বন কেটে

বসত তৈরীর গল্প। সাপ-কাটির গল্প। আরো কত কি! এর মধ্যেও আমি স্বপ্ন দেখেছি, বলরাম গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা বিষধর সাপের লেজ ধরে টানছে! সাপটা ফোঁস ফোঁস করছে। আর একটু হলেই সাপটা ওকে ছোবল মারত। মা গো! গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঝট করে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। ভয়ে তখনো আমার বুকের ভেতরটা ধুকধুক করছে। গলাটা যেন আমার শুকিয়ে গেছে। জিভটা চট চট করছে। ঢক ঢক করে জল খেয়ে তবে খানিকটা স্বস্তি বোধ করি। বলরামের মুখটা আমার চোখের সামনে ঘুরতে থাকে। কেন যেন ওর এই দুঃসাহস। ওর ঠাকুর্দার কথাও মনে পড়ে যায় আমার। ওর ঠাকুর্দা ছিল সাপের ওঝা, ঝাড়-ফুঁক মন্ত্র-টন্ত্র জানত। সাপে কাটলে লোক বাঁচাতে পারত। বলরাম আজো যেন তা বিশ্বাস করে। নিয়ম-নিষ্ঠা থাকলে আজো বুঝি বাঁচানো যায়। আজো কেন যেন ওর বিশ্বাস, ওর ঠাকুর্দা যদি ঠিক ঠিক মতন নিয়ম-টিয়ম মেনে চলত, তাহলে ওর জেঠামশায় বেঁচে যেত। সাপ কাটিতে আর মরত না। সে-রাত্তিরে আমার আর ভাল ঘুম হয় নি। ছেলেটার জন্য মনটা আমার কেন যেন ভারী হয়ে থাকল।

শুধু কি বলরাম, হিমাংশুকেও এর মধ্যে একদিন স্বপ্ন দেখলাম। ভীষণ একটা ঝড় উঠেছে। ঘণ্টায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল বেগে হাওয়া ছুটে যাচ্ছে। হাওয়ার মেজাজ বোঝা দায়। ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠছে। তেজ বাড়ছে। আকাশ ভেঙে ঢল নেমেছে। বৃষ্টি আর থামে না। চোখে-মুখে আতঙ্ক জমে আছে ওদের। মুখ শুকিয়ে গেছে। চোখে ঘুম নেই। রাত জেগে বসে আছে ওরা। নদীর জল বাড়ছে। মাটির ভেতর থেকে গুম গুম একটা শব্দ উঠছে। এবার জোয়ার এলেই বুঝি দ্বীপটা ডুবে যাবে। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কয়েকটা ভূতুড়ে বাতি অন্ধকারের গায়ে গায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে একসময় নিবে গেল। হঠাৎ চিৎকার, আর্তনাদ।

গোঙানি আর কান্না ঘুর্ণির মতন ঘুরতে লাগল। বাঁধের একটা জায়গা ভেঙে গেছে। হুড়-হুড় করে জল ঢুকছে। আর কোন উপায় নেই। সব ভেসে যাচ্ছে। হিমাংশুও ভেসে যাচ্ছে।

ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। সবাই যেন হকচকিয়ে উঠল। পাশের ঘরে মিলু লতুরা ছিল। ওরাও ছুটে এল। মা তাড়াতাড়ি করে আলো জ্বালল। দরজা খুলে দিল। কাছে এসে আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এমন চেঁচিয়ে উঠলি কেন রে, কি হয়েছে ?'

আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চেঁচামেচি করেছি। গলার কাছে পুঁটলির মতন তখনো কি যেন একটা আটকে আছে। একটু ব্যথা-ব্যথা করছিল। আস্তে আস্তে কয়েকবার ঢোক গিললাম। তখনও আমি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছি। মুখ-চোখ ফ্যাকাসে। বুকটা কাঁপছিল। মিলু জল এনে দিল। জল খেলাম। একটু সুস্থ হয়ে আমি মার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললাম, 'খুব ভয়ের একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

মা একটু চিন্তিত মুখে বলল, 'তোর কি হয়েছে বল তো, কদিন ধরেই দেখছি, ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠছিস, আগে তো তা হয় নি!' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করেছে, 'কিরে, ভয়-টয় পেয়েছিস নাকি ?'

'বারে, ভয়-টয় পাব কেন ?'

মা আমার কথা যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। মুখের ওপর তখনো এক খটকা ভেসে থাকল। মা চলে গেল। আবার সব চুপচাপ। আমার আর চট করে ঘুম এল না। রাস্তায় কুকুরের চিৎকার! শুয়ে শুয়ে আমি ওদের কথাই ভাবছিলাম। বাঁচার জন্যে মানুষের কি প্রাণান্তকর সংগ্রাম! এ লড়াইয়ের যেন শেষ নেই। এদের দেখে আমার হতাশা কেটে

যায়। নতুন করে আবার সাহস ফিরে পেয়েছি। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ওরা। আমারই বা অত ভয় কি!

তবু মার কাছে সব কথা বলতে পারি নি। মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে: যেমন, জায়গাটা কতদূর, খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে আছে কিনা, লোকজন কি রকম, সাপ-টাপ আছে তো ইত্যাদি।

আমি শুধু একটা কথাই বলেছি, 'আমার জন্যে তোমার এত দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

অবশ্য আমার চেয়ে বাবুলের জন্যেই মার চিন্তাটা সবচেয়ে বেশী। কোন কথাই ওর কানে যায় না। কাউকেই তোয়াক্কা করে না। কেমন একটা বেপরোয়া, উদ্ধত ভাব। দিন দিনই ও যেন কিরকম হয়ে যাচ্ছে। পাড়ার ঝামেলা এখনো কমে নি। এখনো রাতে ও ঘরে থাকে না। কোথায় থাকে কে জানে। মা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকে। ওর জন্যে মা ঘুমোতে পারে না নিশ্চিন্তে। এজন্যে ওর কোন দুঃখ-টুঃখ নেই। মাঝে-মধ্যে হুট করে কোত্থেকে এসে হাজির হল! চান করল, খেল। আবার বেরিয়ে গেল। চেহারাটাও কেমন চোয়াড়ে, রুক্ষ হয়ে উঠেছে। মাথা ভরতি ঝাঁকড়া চুল। ইয়া জুলফি, গোঁফটা থার্ড ব্রাকেট করে নিচের দিকে ঝুলনো। চোখ লাল। তাকালেই ভয় হয়। পুলিসের লোক এসে মাঝে মাঝে ঘুরে যায়। দলাদলি, রেষারেষি লেগেই আছে। হঠাৎ কি করে যে ওর এত সাহস বেড়ে গেল। নিশ্চয়ই এর আড়ালে কেউ আছে। সুতোটা সেই অদৃশ্য বাজিকরের হাতেই। যখন যেমন খুশ নাচাচ্ছে। মগজে যদি ওর কোন বুদ্ধি-টুদ্ধি থাকে। ওর জন্যে আমাদের সবারই অশান্তি।

মিলুকে এর মধ্যে নাকি এক পাত্র-পক্ষ দেখে গেছে। এখনো ওরা কিছু জানায় নি। ওর জন্যেও মার দুশ্চিন্তা। ওর বিয়েটা কোনরকমে দিয়ে দিতে পারলে অনেকটা হালকা হওয়া যায়।

মার বুকের অসুখটা আরো বেড়েছে। ওঠা নামা নিষেধ। বেশী নড়া-চড়া করলে আরো নাকি খারাপ হতে পারে। মনের ওপর যেন বেশী চাপ না পড়ে। অথচ মার চিন্তার আর শেষ নেই। বাবাও অসুস্থ। প্রেসার আরো বেড়েছে। নাক দিয়ে গল গল করে একদিন রক্ত পড়েছে। ওষুধ খাচ্ছে। ডাক্তারবাবু বিশ্রাম নিতে বলেছেন।

এর মধ্যে দু দিন স্বাতীর ওখানে গিয়েছিলাম। দেখা হয় নি। মনের মধ্যে আমারো তীব্র এক অভিমান। যাওয়ার সময় দেখা করে যেতে পারি নি। গিয়েই চিঠি লিখেছিলাম। কোন উত্তর পেলাম না। ওর বাড়ির লোকগুলোর ব্যবহারটা যেন কিরকম। ভাল করে কথাই বলতে চায় না। কেমন এক অবজ্ঞা।

একদিন দুপুরের দিকে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। পরীক্ষা হয়ে গেছে। হঠাৎ স্বাতীর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে ওর মুখটা মুহূর্তের জন্যে যেন একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। আমাকে হয়ত এখানেও দেখবে আশা করে নি। একটু অবাক চোখে চেয়ে থাকল আমার মুখের দিকে। হঠাৎ ওর মুখটা এমন হয়ে গেল কেন বুঝতে পারলাম না। আমিও ওর চোখে চোখে চেয়ে আছি।

স্বাতী ম্লান একটু হেসে শুধলো, 'কবে এলে ?'

'কেন, তুমি জানতে না ?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করি।

'বারে, আমি জানব কি করে !' স্বাতী যেন একটু ক্ষুণ্ণ হল।

'এর মধ্যে দু দিন তোমার বাড়ি গেলাম, বলে নি কেউ ?'

'নাঃ।'

'আশ্চর্য তো !' একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম, 'তা দশ-বার দিন হয়ে গেল এসেছি।'

'পরীক্ষাটা দিলে না কেন ?' স্বাতী আড়চোখে চেয়ে আমাকে শুধলো। গলায় কোন মিষ্টতা ছিল না। একটু গম্ভীর। বুঝি মনে-মনে সামান্য বিরক্ত। এজন্যে এখনো যেন আমার ওপর রেগে আছে।

কপালে দুটো আঙুল ঠেকিয়ে বললাম, 'সবই আমার নসিব।' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

স্বাতী এবার সরাসরি আমার মুখের দিয়ে চেয়ে থাকল একটু-ক্ষণ। আমার কথায় ও আদৌ খুশি হল না। বেজার মুখে বলল, 'নসিব, না তোমার খ্যাপামি, কোনটা?'

'তুমি যা মনে করবে তাই।'

'আমার মনে করার কি আছে।' ওর বলার মধ্যে কোনরকম আবেগ বা তাপ-উত্তাপ ছিল না।

আমি চুপ করে থাকলাম একটু সময়। এরকম আচরণের কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। ভেতরে ভেতরে কেন জানি না, আমার কষ্ট হচ্ছিল। এতদিন পরে ওর সঙ্গে দেখা হল, কোথায় ও আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করবে তা নয়, উল্টে তিরিক্ষে মেজাজ। প্রথমে মনে হয়েছিল, আমার সঙ্গে ও মজা করছে। যাওয়ার সময় ওকে কিছু বলে যাই নি বলে ভীষণ চটে আছে। কিন্তু ওর হাবভাব দেখে আমার এখন অন্যরকম ধারণা হল। আমাকে দেখে যেন ও কেমন একটু চমকে উঠেছে। আমার বুকের ভেতরে যেন একটা চিনচিনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছিল। এত তাড়াতাড়ি মানুষ বদলে যেতে পারে! আশ্চর্য, স্বাতীকে তো আমার কখনোই এরকম মনে হয় নি! আমি তো সব কথাই ওকে জানিয়েছি। আমার সম্পর্কে কি ওর আগ্রহ শেষ হয়ে গেল? ওর কি কিছু হয়েছে? আমি ওর চোখে চোখে তাকালাম। মৃদু হাসলাম, বললাম, 'যাক গে, তোমাদের পরীক্ষা কিরকম হল?'

স্বাতীর কাটা কাটা জবাব, 'আমি আমারটা বলতে পারি, অন্যেরটা বলব কি করে!'

আমার মুখের ওপর থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'তোমারটাই শুনি।'

'মোটামুটি হয়েছে। ফোর্থ পেপারের সেকেণ্ড-হাফটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'ও কিছুই নয়।'

'থাক, তোমাকে আর জ্যোতিষী করতে হবে না।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলাম আমরা। কেমন এক আড়ষ্ট ভঙ্গি। ওকে অনেক কথাই তো আমার বলার ছিল। বলতেই এসেছিলাম। শোনার মতন মন নেই ওর। মনের চার-পাশে যেন ও হঠাৎ করে এক দেয়াল তুলে দিয়েছে। এখন কিছু বলতে গেলে আমার কথাগুলোই ওই দেয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে আসবে। সাধ করে আর এই কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কি। বরং, ওরই বেশী আগ্রহ থাকা উচিত ছিল। ওরকম একটা জায়গায় আমার দিনগুলো কেমন করে কেটেছে, তা শোনার কোনরকম কৌতূহল নেই স্বাতীর। আমার মুখের ওপর বিষণ্ণ ছায়া। এরকম অস্বস্তি বোধহয় আর কখনই হয় নি আমার। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্বাতী একসময় বলল, 'পরীক্ষাটা দিয়ে দিলেই ভাল করতে।'

ম্লানভাবে হাসলাম সামান্য। মুখের ওপর যেন হালকা এক দুঃখ ছড়িয়ে থাকে। বুকের ভেতরটা ভারী লাগে। এত কষ্ট করে এতদিন ক্লাস-টাস করেও শেষ রক্ষা হল না। এজন্যে আমারও দুঃখ কিছু কম নয়। জানি না, পরে আর কখনো সুযোগ আসবে কিনা। বিমর্ষ গলায় ধীরে ধীরে বললাম, 'কোন উপায় ছিল না।'

স্বাতী কি ভেবে হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল। সামান্য ঠাট্টার গলায় বলল, 'শেষে একটা মাস্টারির চাকরির জন্যে এতদূরে যেতে হল?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'আমার আর দরকারও নেই বুঝে।'

আমি ওর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকলাম অল্পক্ষণ। এরকম একটা কথা মুখ থেকে ও বের করতে পারল। একবারও ভাবল না? আমার বুকের ভেতরে সেই অবুঝ কষ্টটা ছটফট করে। আস্তে আস্তে বললাম, 'একদিন তো বুঝতে স্বাতী।'

স্বাতীও আমার চোখে চোখে চেয়ে থাকল। হঠাৎ যেন ওর মুখের রঙ কেমন বদলে গেল। দেখতে দেখতে মুখের ওপর থেকে ওর রুক্ষ ভাবটা মুছে গেল। মুখের ওপর কেমন ম্লান এক ছায়া ধীরে ধীরে ভারী হতে থাকে। ওর আজকের এই আচরণ যেন একধরনের অভিনয় মাত্র।

আমি শুধোলাম, 'তোমার কি হয়েছে খুলে বল তো।'

স্বাতী আনত ভঙ্গিতে একটু নম্র কণ্ঠে বলল, 'কি হবে, কিছুই নয়।'

'তুমি আমার চিঠির উত্তর দিলে না কেন?'

স্বাতী ঘাড়টা ঈষৎ বেঁকিয়ে আমাকে একবার দেখল। ওকে আবার যেন একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। অনাড়ষ্ট গলায় বলল, 'হঠাৎ দুম করে ওরকম একটা চিঠি লিখতে গেলে কেন?'

'তুমি কি রাগ করেছ এজন্যে?'

স্বাতী চুপ করে থাকল কিছু সময়। পরে বলল, 'কাজটা ভাল কর নি। চিঠিটা প্রথমে আমার দাদার হাতে পড়ে। ও খুলে সেটা পড়েছে। মাকে দেখিয়েছে। বাবাকে দেখিয়েছে। এজন্যে আমাকে অনেক বকুনি খেতে হয়েছে। আরো অনেক কথা শুনতে হয়েছে, তোমাকে তা বলা যাবে না।'

নিজেকে এই মুহূর্তে আমার খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। এরকম যে হতে পারে, আমার কোন ধারণা ছিল না। বুকের কষ্টটা যেন আরো তীব্র হল। আমি অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলতে পারলাম না। গলার কাছে একটা যন্ত্রণা। পরে অনুচ্চ কণ্ঠে বললাম,

'আসলে ওখানে গিয়ে প্রথমটায় খুব খারাপ লাগত। ভীষণ একলা মনে হত। তোমার কথা খুব করে মনে পড়ত। সেজন্যেই চিঠিটা লিখেছিলাম। তাছাড়া যাওয়ার আগে তোমাকে কিছু বলে যেতে পারি নি। কিন্তু তার ফল যে এরকম হবে বুঝতে পারি নি। আমার এখন ভীষণ খারাপ লাগছে।'

'আমারও। তুমি কি যে করলে না!' গলাটা কেমন কেঁপে যায় ওর।

আমি ওর চোখে চোখে চেয়ে থাকি। ধীরে ধীরে আমার কাছে সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার ওই চিঠিটাই ওকে এই অশান্তির মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। এখনো যেন ওর এই ঝামেলা কাটে নি। আমি বললাম, 'তোমার খোঁজ করতে গিয়ে আমারও এরকমই একটা ধারণা হয়েছিল। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

স্বাতীকে একটু বিষণ্ণ, চিন্তিত দেখাচ্ছিল। টলটলে চোখে একবার তাকাল। আবার সরিয়ে নিল দৃষ্টি। ভঙ্গি আনত। কি ভেবে সামান্য আহত গলায় বলল, 'তুমি ওখানে যেও না। আমি চাই না, আমার জন্যে তুমি এভাবে অপমানিত হও।' আবার তাকাল আমার দিকে।

'তোমার জন্যে আমার কোন অপমান নেই স্বাতী।'

'না, তা ঠিক নয়।'

আমি হাসলাম একটু। বললাম, 'তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ।'

আমার কথা শুনে স্বাতীও হেসে ফেলল। একটু তেরছা চোখে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'ওটা শ্রীমতী রাধিকার জন্যেই তোলা থাক।'

'তাই থাক।'

স্বাতী আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মুখের ওপর নানারকম

রেখা ফুটল, মিলিয়ে গেল। শেষে একসময় বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলব ?'

'হুঁ, কথা শুনতেই তো এলাম।'

স্বাতী চোখে চোখে চেয়ে থাকল। ভাবল একটু সময়, মুখের ওপর রহস্য। সরাসরি প্রশ্ন করল, 'তুমি কি মাস্টারির চাকরিটা এই মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পার ?'

'কেন ?' আমি অবাক।

'বল না, পার কি না ?' অপলক দৃষ্টি। চোখের কোলে একধরনের কৌতূহল।

'আর একটা না পেলে, কি করে ছাড়ি !' আমার গলায় সংশয়, আড়ষ্টতা।

স্বাতী মনে মনে যেন হাসল। একটু চুপ করে থেকে আবার শুধলো, 'এক্ষুনি আমাকে বিয়ে করতে পারবে ?'

আমি কি জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। আমার চোখে-মুখে আরো গভীর এক বিস্ময়। এটা ওর কৌতুক, না অন্য কিছু, আমার কাছে অস্পষ্ট। আমি বিমূঢ়। অপ্রস্তুত। হঠাৎ এসব বলছে কি স্বাতী !

স্বাতী আমার এই অসহায় দশা দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, 'আরে, ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, তোমার সঙ্গে একটু মজা করলাম।' হাসি থামিয়ে আমাকে ভরাট চোখে আবার দেখল।

আমি সহাস্যে বললাম, 'ওরে বাপস্ তুমি আমাকে ভীষণ চমকে দিয়েছিলে।'

স্বাতী এবার আর জোরে হাসল না। মুখের ওপর পাতলা টুকরো হাসি। সামান্য ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এই, আমি আজ আর দাঁড়াব না। কিছু মনে করো না।' ও চলে গেল একসময়।

ওর কথা শুনে আমারও কেন যেন মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বুকের ভেতর থেকে যেন এক অবুঝ কান্না ঠেলে ওঠে। সেদিন আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হল না। বিষণ্ণ মন নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

পনের

এরপর স্বাতীর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। অভিমানে বুকের ভেতরটা আমার ভারী হয়ে থাকে। ভাল লাগে না কিছু। কারো সঙ্গে আমার বেশী কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কোথাও যেতে ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে একা একাই মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ আমিও যেন কেমন বদলাতে শুরু করেছিলাম। মা আমার মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠেছে, 'হ্যাঁরে, তোর কি কোন অসুখ-টসুখ করেছে।'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছি, 'না তো।'

'উঁহু, কিছু একটা হয়েছে। তোর চোখ-মুখের ভাবই অন্যরকম হয়ে গেছে।' মার গলায় উদ্বেগ ফুটে ওঠে। আমার জন্যে মার দুশ্চিন্তা বাড়ে।

আমি হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। পারি না। হাসিটা দেখতে দেখতে কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। একটা চিন্তা সব সময়ই আমার মাথার মধ্যে কুট কুট করে কামড়াচ্ছে! ভেতরে ভেতরে তার একটা জ্বলুনি আছে। আমি মাকে আমার সব কথা বোঝাতে পারি না। আমি আরো চুপচাপ হয়ে যাই। স্বাতীর এই উপেক্ষা, আমাকে আরো গভীর অনির্দেশ্য কোন বেদনার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। আমার মধ্যে ধীরে ধীরে কঠিন কোন রোগের লক্ষণ ফুটে উঠছে যেন। মা হয়ত আমার মুখের ওপর তারই পূর্বাভাস দেখে চমকে উঠেছে। ব্যাকুলতা বোধ করছে।

আমি অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছি, এরমধ্যে স্বাতী এতটা

বদলে গেল কি করে! মানুষ কি করে এত তাড়াতাড়ি এমন নিষ্ঠুর হয়ে যায়! ওর এই আচরণের কোন অর্থই আমি খুঁজে পাই না। হঠাৎ ও এমন হয়ে গেল কেন? ভাবতে ভাবতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। কিন্তু মনের মতন কোন জবাব পেতাম না। মাঝে মাঝে আমার এমনও মনে হয়েছে, আমিই কি ওকে বুঝতে ভুল করছি? ও আগেও যেমন ছিল, এখনো তাই-ই আছে। আমিই নিজের মতন করে কতগুলো ধারণা তৈরী করে নিয়েছিলাম মাত্র। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব! ধারণাগুলো তো আর শূন্যের ওপর হয় না। এরই সুতো ধরে তখন আমার চোখের সামনে একের পর এক, অনেক ভাঙ্গা-চোরা শব্দ, হাসি-ঠাট্টা, টুকরো টুকরো ছবি ভেসে উঠত। একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে জুড়ে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখেছি। ঠিকই তো আছে সব! কোনরকম অসঙ্গতি তো চোখে পড়ল না! একবার ওর সঙ্গে দেখা হলে বলতে পারতামঃ স্বাতী, আমাকে খুলে বল তো, আসলে তোমার কি হয়েছে! হঠাৎ তুমি আমার সঙ্গে এমন করছ কেন? বেশ তো, কোন কারণে যদি আমার ওপর তোমার রাগ হয়ে থাকে, আমাকেই তো তা অনায়াসে বলতে পার। তোমার সঙ্গে এখনো যে আমার সব কথা বলা হয় নি। কত কথা তোমার কাছে বলব বলে বুকের ভেতরে জমিয়ে রেখেছিলাম। জানি না, আর কখনো তা বলা হবে কিনা। আমার পক্ষে কি আর তোমাদের ওখানে যাওয়া সম্ভব! তুমিই যে আমাকে ওখানে যেতে বারণ করে দিয়েছ স্বাতী। ভিক্ষুকের মতন দোর-গোড়া থেকে ফিরে আসার তো কোন মানে হয় না। তোমাদের বাড়ির লোকগুলোর এরকম ব্যবহার কেন গো? ভীষণ বাজে। একবার ওখানে যাওয়া মানে, সেধে সেধে অপমানিত হওয়া।

আর একবার শেষবারের মতন তোমার কাছে যেতে আমার ভীষণ লোভ হয়। তোমার মুখ থেকেই কিছু কথা শুনে আসতে

চাই। তা যতই রূঢ় আর নির্দয় হোক না কেন! অপমান করবে, করো। তাড়িয়ে দিতে হয় দিও। তবু আমার নিজের কাছে একটা কৈফিয়ৎ থাকবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তীব্র এক অভিমান এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আবার কেমন চুপসে যাই।

জান, এর মধ্যে আমি কয়েক দিনই ইউনিভার্সিটিতে গেছি! শুধু তোমার জন্যে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছি। কিন্তু তোমার দেখা পেলাম না। ওখানে আমার যেতে ইচ্ছে করে না। অন্য কোন কারণে নয়। ওখানে গেলে আমার অনেক কথা মনে পড়ে যায়। আমার ব্যর্থতাটা আরো প্রকট হয়ে পড়ে। তোমার খোঁজে আমি কফি-হাউসেও গিয়েছি। ওখানেও তো তুমি আর আস না! তোমার কি হয়েছে, আমাকে একবার মুখ ফুটে বলতে পার না? আমি কি আজ তোমার কাছে এতই পর? তোমার এই অস্বাভাবিক আচরণের আসল কারণটা যে কি, এখনো তা আমি বুঝতে পারছি না স্বাতী। আমার চিঠিটাই কি এর মূলে? আমার কিন্তু আদৌ তা মনে হয় না। না হয়, আমার চিঠিটা তোমার দাদার কিংবা বাবার হাতেই পড়েছিল! তাতে তো এমন হওয়ার কোন কথা নয়! চিঠিটাতে এমন আর কি ছিল! আমার এখন চিঠির সব কথা মনে পড়ছে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, ওতে অশালীন বা মনে করার মতন কিছু ছিল না। জানি না, এজন্যে কেন তোমাকে এমন বকাবকি করল ওরা? বিশ্বাস কর, ওখানে গিয়ে তোমার কথা আমার খুব মনে পড়ত। প্রথম কটা দিন বড় নিঃসঙ্গ মনে হত! এ চিঠি কি আমি তোমাকে লিখতে পারি না? আমার দোষটা কোথায়? একসঙ্গে আমরা পড়তে পারি, গল্প করতে পারি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারতে পারি, আর একটা চিঠি লেখাতেই সব এমন উলটপালট হয়ে গেল? ভেবে দেখ তো, তুমি আমি কতদিন লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে একা একা হেঁটে গেছি! কত গল্প করেছি। সবটাই কি পড়ার কথা ছিল;

কত সময় আমাদের রেষ্টুরেন্টেও কেটে গেছে। অন্যেরা আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করত। তুমি তো স্বাতী ঠোঁটে দাঁত কেটে কেটে হাসতে। কই, তেমন করে তো জ্বলে উঠতে না! একটু রাত হয়ে গেলে তুমি আমাকে কতদিন বলেছ, 'এই, আমাকে একটু এগিয়ে দাও না!' সে-সব কথা কি আজ তুমি ভুলে গেছ স্বাতী? একবারও কি তা মনে পড়ে না তোমার? আমার চিঠিটা তোমাদের কাছে একটা নিমিত্ত মাত্র। আসল কারণটা আরো গভীরে। তোমার বাড়ীর লোক না হয় ক্ষুণ্ণই হল আমার ওপর, কিন্তু তুমি? তোমার তো আমার সঙ্গে এরকম করার কোন কারণ ছিল না! তোমার এই ব্যবহার রীতিমতন আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

এজন্যে বুকের ভেতরে আমার এক কষ্ট জমে থাকে। আমি হালকা হতে চাই, পারি না। ঠেলে ঠেলে এসব চিন্তা দূরে সরিয়ে দিতে চাই, পারি কই! ওদের হাতে আমি যেন এখন এক খেলার পুতুল। দেখতে দেখতে সব কেমন বদলে গেল। সেদিন ওরকম রসিকতার অর্থটা আমার কাছে দুর্বোধ্য। ঘরে এসেও আমি কথাটা অনেক রকম ভাবে ভেবেছি। ভাল করে কদিন আমি ঘুমোতে পারি নি। নিজের মধ্যেই একধরনের অস্থিরতা। এটা কি নিছকই ওর রঙ্গ, ঠাট্টা? আমার কাছে হেঁয়ালির মতন মনে হয়েছে। ওর কথা শুনে আমি তো হকচকিয়ে উঠেছিলাম। বুকের ভেতরটা যেন ধক করে উঠেছিল। রীতিমতন কাঁপছিল। পরক্ষণেই ও খিল খিল করে হেসে ফেলেছিল। হাসিটাও স্বাভাবিক ছিল না। আমার সঙ্গে নাকি ও মজা করছিল। কখন যে ওর মাথায় কি খেয়াল চাপে! ওর সঙ্গে একবার দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম: এ তোমার কেমন রসিকতা স্বাতী! এরকম দুষ্টুমি তো এর আগে আর কখনো তোমার মাথায় ভর করে নি! নিশ্চয়ই তোমার কিছু একটা হয়েছে। আমাকে কি তা কিছুতেই বলা

যায় না? আবার চলে যাওয়ার সময় তো তোমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি সবই লক্ষ্য করেছি। দুম করে ওরকম একটা কথা বললে কেন স্বাতী? ধর, আমি যদি বলেই ফেলতাম, হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই তোমার জন্যে এই চাকরিটাও ছেড়ে দিতে পারি, তুমি রাজী থাকলে এ বিয়েতেও আমার কোনরকম আপত্তি নেই, তা হলে কি হত? তুমি কি তোমার কথা রাখতে পারতে? সব ছেড়েছুড়ে আমার কাছে চলে আসতে পারতে? আমার ধারণা তুমি তা পারতে না। আসলে তুমি আমাকে ভাল করে জান বলেই, এরকম ঠাট্টাটা করতে পারলে! তুমি জানতে আমার পক্ষে এ কখনো সম্ভব নয়। আমার হাত পা বাঁধা পড়ে গেছে সংসারে! আমি কোন ভাবেই বেপরোয়া হতে পারি না। তুমি কি আমাকে অন্যরকম কিছু ভেবে নিলে? তোমার এরকম কৌতুকের কোন মানে হয় না।

এর মধ্যে অবনীর সঙ্গে আমি দেখা করেছি। আমাকে দেখে হাসতে হাসতে ও বলেছে, 'এই যে সাগর ফেরা বন্দী!'

'বন্দী?' আমি অবাক হয়ে ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকি।

অবনী জোরে জোরে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, 'তাছাড়া কি, তোর চিঠি পড়ে তো আমার তাই মনে হল।'

'ভাল বলেছিস, বন্দীই বটে।'

'এরকম একটা যে জায়গা আছে, আমি তো ভাবতেই পারছি না।'

'আমরা আগে থাকতে অনেক কিছুই তো ভাবতে পারি না।'

'তোর চিঠি পড়ে আমার কিন্তু খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'কেন?' আমার চোখে-মুখে কৌতূহল ছড়িয়ে থাকে।

'আমিই তো তোকে ওরকম একটা জায়গায় পাঠালাম। আমিও জানতাম না, জায়গাটা কোথায়: কিরকম। তোর চিঠি পড়ে তো আমার একটু ভয়ই হল। চারপাশে নদীর ওইরকম

ফোঁস ফোঁসানি, সাপ, আমি হলে একদিনও থাকতে পারতাম না, পালিয়ে চলে আসতাম।'

'চাকরিটার জন্যে তোকে কিন্তু অজস্র ধন্যবাদ।'

'ভাগ, আমাকে আর আমড়াগাছি করতে হবে না।'

'হ্যাঁরে, আমি ঠিকই বলছি।'

'তুই কি ওখানে আবার ফিরে যাবি নাকি?' ও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

'ওরা তো ভাই ফিরে যাওয়ার জন্যে খুব করে বলে দিয়েছে।'

'ওরা বলবেই। ওদের লোকের দরকার। ওখানে এত অনার্স আর এম. এ. পাবে কোথায়? হায়ার-সেকেণ্ডারী করে আরো বারটা বাজিয়েছে।'

'এটা ওদের একটা প্রব্লেম। সাবজেক্ট-টিচার পাওয়াই যায় না। হয়ত কেউ এল, কদিন থেকেই আবার পালিয়ে যায়। ছেলেগুলো মাঝখান থেকে ভীষণ সাফার করে। লোকাল ছেলেরা পাস-টাস করে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত এই চলবে।'

'যাক গে, আমার মতে তোরও আর ওখানে গিয়ে কোন কাজ নেই।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'ভাবা ভাবির কি আছে! ওটা তুই বরং ছেড়েই দে।' অবনী জোর দিয়ে বলল।

আমি ম্লান একটু হেসে বললাম, 'তার আগে অন্য একটা কিছু তো হওয়ার দরকার।'

'ভাল করে চেষ্টা কর, এখানেই হয়ে যাবে।'

'চেষ্টা কি আর কম করছি রে!'

অবনী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে একসময় বলল, 'এ তো একধরনের নির্বাসন রে!'

আমি হাসলাম আবার। ওর মুখের ওপর চোখ রেখে ধীরে

ধীরে বললাম, 'প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হয়েছিল। এখন অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। এখন আর খুব একটা খারাপ লাগে না। তবে অনেকটা দূরে, এই যা।'

'দূরেও আপত্তি ছিল না। মাঝপথে ওই রকম ভয়াল নদী।'

'নদী মানে, এপার ওপার দেখা যায় না। ঢেউ আর ঢেউ। দেখলেই ভাই বুক কেঁপে ওঠে।'

'সাঁতার জানিস ?' অবনীর চোখে-মুখেও যেন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

'ওখানে সাঁতার জানা, না-জানা সমান। নৌকো একবার উল্টোলে আর রক্ষে নেই। কোথায় যে ভেসে চলে যাবে কেউ জানে না।'

অবনী আরো ভয় পেয়ে যায়। গভীর মমতার গলায় ও ফের বলল, 'যা বলছি তাই শোন, তোর আর ওখানে যেতে হবে না। শুনেই আমার হয়ে গেছে।'

আমি চুপ করে থাকলাম। এ চাকরিটা আপাতত আমার কাছে একটা অবলম্বন। অবনীও আমার সংসারের সব কথাই জানে। আসলে আমাকে ও ভীষণ ভালবাসে। ওসব জায়গার কথা শুনে ও একটু ভয়ই পেয়েছে। সেজন্যেই ও আমাকে ওখানে আর যেতে দিতে চায় না। আমি আরো কয়েকটা জায়গায় চেষ্টা করেছি। মাস কয়েক আগে ইউ. ডি. ক্লার্কের জন্যে পি. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ওখানে পাস করেছি। ভাইভার জন্যে ডেকেছিল। কদিন আগে তাও দিয়ে এলাম। যতক্ষণ বিকল্প একটা না পাওয়া যায়, ততক্ষণ এটা আমি ছাড়ি কি করে। কোন উপায় নেই আমার। তাছাড়া অবনী যে ভাবে ভয় পেয়েছে আমার ভয়টা ওর চেয়ে অনেক কম। জায়গাটা আমার কাছে খারাপ লাগে নি। মোটামুটি একটা পরিচয় আমার হয়ে গেছে, নোনা জায়গার অন্য এক নেশা আছে যেন।

আমি আরো কিছুক্ষণ নীরব থেকে একসময় বললাম, এখন আর ওসব কিন্তু ভাবছি না। এ দিকের খবর কি বল।'

অবনী আমার মুখের দিকে তাকাল। হাসল সামান্য। খুশি খুশি গলায় বলল, 'ভালই।'

'সুপ্রিয়ার কি খবর রে?'

'ও-ও ভালই আছে। হঠাৎ যেন অবনীর কি একটা মনে পড়ে গেল। ড্রয়ার খুলে একটা পার্কার পেন বের করল। পেনটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'সুপ্রিয়া এই কদিন আগে এটা প্রেজেন্ট করেছে। ওর এক দাদা আমেরিকায় থাকে। সুপ্রিয়া একটা পার্কার পেন আনতে লিখে দিয়েছিল ওর দাদাকে। ওর দাদা কদিনের জন্যে ভারতবর্ষে এসেছিল। দেখা করে গেল। আমার সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। বেশ হাসি খুশি, ভাল মানুষ।'

আমি পেনটা দেখে-টেখে অবনীর হাতে ফিরিয়ে দিলাম। মুচকি একটু হেসে বললাম, 'সুপ্রিয়া মেয়েটাও খুব ভাল।'

'ওদের ধরণটাই একটু অন্যরকম। ওর বাবা এখনো একটা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মাও তাই। ওর এক দাদা আমেরিকার কোন্ একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। আর এক দাদা প্রেসিডেন্সীর কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক। ফ্যামিলিটার সবাই প্রায় টিচিং-প্রফেসনে আছে। যাই বল, এমনটা খুব দেখা যায় না।'

আমি শুধোলাম, 'তোদের সঙ্গে ফাইনাল কথাবার্তা হয়ে গেছে?'

'মোটামুটি সবই ঠিক। পরীক্ষার রেজাল্ট আগে বেরুক। কলেজে-টলেজে একটা চাকরি পাই, তারপর তো!'

'ও হয়ে যাবে।'

অবনী অপলকে আমাকে দেখল খানিকক্ষণ। কি ভেবে শুধলো, 'এর মধ্যে স্বাতীর সঙ্গে কি তোর দেখা হয়েছিল?'

'একদিন হয়েছিল।'

'বলিস কি, মাত্র একদিন, আর দেখা হয় নি?' ওর গলায় বিস্ময়।

'না।' আমি চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। শেষে বললাম, 'কি ব্যাপার বল তো?'

'যাওয়ার আগে তোর সঙ্গে স্বাতীর কোন ঝগড়া-টগড়া হয়েছিল?'

'নাঃ-, ওর সঙ্গে তো আমার দেখাই হয় নি।'

'স্ট্রেঞ্জ!'

'আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না।' আমার গলার স্বরটা কেমন ভেঙে যায়।

'হঠাৎ তোদের মধ্যে এমন মিস্আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হল কি করে?' অবনী আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

'এটা আমার কাছেও এক বিস্ময়।'

'সত্যিই, মেয়েদের চরিত্র বোঝা বড় দায়, তার ওপর আবার বড় লোকের মেয়ে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'আমার কিন্তু কখনই তা মনে হয় নি।'

'হয় নি, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। ভুলটা বোধহয় তোর ওখানেই।'

'নারে, আমার কাছে এখনো কিরকম খটকা লাগছে।' গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে এল। বুঝতে পারছিলাম মুখের ওপর যেন চিন্তার কয়েকটা রেখা ভেসে উঠেছে।

অবনীও একটু গম্ভীর। আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'শুধু তোর কাছেই নয় অরুণাংশু, আমাদের কাছেও। এ নিয়ে আমাদের মধ্যেও অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। ওই টাইপটাই আলাদা। আমার ঠিক ভাল লাগত না।'

আমি চুপ করে থাকলাম কিছু সময়। এটা কোন তর্কের

বিষয় নয়। হতেই পারে, অবনীর ওকে ভাল লাগে না। সংসারে সবাইকে সবার ভাল লাগে না! এটা নিছকই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাকে যে কখন কার ভাল লাগে, বলা বড় কঠিন। মোটের ওপর, আমার খারাপ লাগত না। একসময় আমারও ধারণা ছিল, ও-ও আমাকে পছন্দ করে। হয়ত এরচেয়েও বেশী কিছু। কিন্তু এবার ফিরে এসে আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, স্বাতী আমাকে যে কোন কারণেই হোক ভুল বুঝেছে। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা চিড় ধরে গেছে। আর বোধহয় তা জোড়া লাগবে না। আর একবার মুখোমুখি হলে বুঝতে পারতাম। হতেই পারে, ও আমাকে আর পছন্দ করছে না, মানুষের মনের খবর কে বলতে পারে! বাইরে তার কতটুকু বোঝা যায়! এ যেন এক গভীর রহস্যের ডোরে বাঁধা। কেনই বা ভাল-লাগা আর কেনই বা এভাবে দুরে ঠেলে-দেওয়া! যাওয়ার আগে স্বাতী আমাকে অপমান করে গেল। দুঃখটা আমার এখানেই। বুকের ভেতরটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আস্তে আস্তে বললাম, 'যাক, এ ব্যাপারে আমার আর কিছু বলার নেই।' গলাটা কেঁপে যায়। কেমন বেসুরো শোনাল।

অবনী আবার আমাকে স্থির চোখে একবার দেখল। আমার এই দুঃখী-দুঃখী চেহারাটা ওকেও যেন বিচলিত, শঙ্কিত করছে। কি একটা ভাবতে ভাবতে শুধলো, 'তুই কি ওখান থেকে স্বাতীকে কোন চিঠিপত্তর দিয়েছিলি?'

'হুঁ।'

অবনী অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল। চুপ করে একটু সময় কি যেন ভাবল। পরে আমার চোখে চোখে চেয়ে বলল, 'ওটা ও ভালভাবে নেয় নি।'

'চিঠির খবরটা দেখছি তোদের কানেও পৌঁছেছে!'

'স্বাতীই একদিন এসে আমাদের বলল। বলার ধরণটা খুবই বাজে ছিল।'

'কি বলল শুনি!' আমি ম্লানভাবে হাসলাম একটু। হাসিটা কেমন শুকনো, করুণ মনে হল।

'ওসব শুনে এখন আর কি করবি! মোটকথা, তোর ওই চিঠিতে নাকি কতগুলো ন্যাকা ন্যাকা কথা ছিল, তুই নাকি খুব কাব্যি করেছিস। ভীষণ নাকি খারাপ লেগেছে ওর।'

'ওতে তো সেরকম কিছু ছিল না! জাস্ট, ওখানকার ফিলিংস্-টার কথা জানিয়েছিলাম!'

'ছাড় তো ওসব কথা। ও তো অনেক কিছুই বলে!' অবনী হেসে উঠল।

'আর কি কি বলেছে ও?' আমি সাগ্রহে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

অবনী হালকা গলায় হাসল, 'বললাম তো, ওর কথার কোন মাথা-মুণ্ডু নেই।'

'বল না, আমি কিছু মনে করব না।'

অবনী ইতস্তত করল। পরে বলল, 'আসলে ও তোর মাস্টারির চাকরিটা পছন্দ করে না।' বলে ও চুপ করে থাকল অল্প সময়। হঠাৎ করে ওর কি একটা কথা মনে পড়ে গেল। মুহূর্তে মুখ-চোখের রঙ অন্যরকম। সামান্য ঝাঁজের গলায় বলল, 'দেমাকের কথা শুনলে গা-পিত্তি জ্বলে যায়, বলে কি, মাস্টারির চাকরিটা নাকি ওর দু চোখের বিষ। এর চেয়ে অফিসের কেরানীগিরিও নাকি ঢের ঢের ভাল। সে কি ঠোঁট বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ঠাট্টা, হাসি!'

আমি নীরব, সেদিনের কথার মধ্যেও স্বাতীর এরকমই একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এখন মনে হল, এটা ওর মনের কথা। ওর সম্পর্কে আমি যা ভেবেছিলাম, তা ঠিক নয়। আরো কি যেন ভাবছিলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অবনী বলল, 'আমার কি মনে হয় জানিস?'

'কি?' আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম।

'ও একটি উঁচু দরের পাকা খেলুড়ে মেয়ে।'

'যাঃ, এমন করে বলিস না!' হাসিটা ফুটে ওঠার আগেই মিলিয়ে গেল।

'এরপরও ওর ওপর তোর দুর্বলতা, তুই মরেছিস!'

আমার বুকের মধ্যে এক অবুঝ কষ্ট গুমরে গুমরে উঠছিল। আমি ওখান থেকে চলে এসেছিলাম একসময়। ঘরে এসেও এই কথাগুলোই ঘুরে ফিরে আমার মনে পড়েছে। আমি ঘুমোতে পারি নি। ছটফট করেছি। জানলা দিয়ে অজস্র তারা-ভরতি আকাশ দেখতে দেখতেও আমার যন্ত্রণার কোন উপশম হয় নি। মানুষ কি নিষ্ঠুর, কি নির্মম! স্বাতী কি সত্যি সত্যিই আমার সঙ্গে খেলা করেছে মাত্র? হৃদয়ের কোন উত্তাপই ছিল না সেখানে? ও কি সত্যিই আমার সঙ্গে আর দেখা করবে না? এখনো যে ওর কাছে আমার অনেক কথা বলার ছিল! আমার বুক ভারী হয়ে ওঠে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

এর কদিন পর আমাকে আরো চমকে দিয়ে একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র এল। সেই সঙ্গে একটা চিঠিও। স্বাতীর বিয়ে। পাত্র ইঞ্জিনীয়ার।

চিঠির সবটা আর পড়তে পারলাম না। আমার মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে। পা টলছে। সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে ঘুরছে। আমি শুয়ে পড়লাম। বুকের ভেতরে হু-হু করে যেন এক বাতাস ছুটে বেড়াচ্ছে। এটাও কি স্বাতীর একধরনের খেলা? শেষটুকু না হয় বাদই থাকত!

ষোল

কলকাতায় আমার মনটা আর টিকছিল না। হঠাৎ নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ, বড় অপমানিত বোধ করছিলাম। আমার কাছে এক মুহূর্তেই সব কেমন ফাঁকা, ঠুনকো মনে হচ্ছিল। এরকম একটা ঘটনা যে ঘটবে, আমার জানা ছিল না আগে। জীবনের শুরুতেই এমন একটা হোঁচট খাব, ভাবতে পারি নি। এখনো এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কোথায় যেন একটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল! সেটা থেকেই গেল। এ জীবনে বোধকরি তা আর শোধরাবার নয়।

কোন কিছুতেই আমার আর আগের মতন উৎসাহ নেই। মনের জোর যেন অনেকটা কমে গেছে। ভাল লাগত না কিছু। কোথাও যেতে চাইতাম না। কারো সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করত না। এমন কি অবনীর কাছেও যাই নি। আমাকে যেন এক অস্থিরতা ভর করেছে। ভাবনাগুলোও কেমন অগোছাল। মানুষের হৃদয় বড় পাষাণ। কেউ কারো দুঃখ বুঝতে চায় না। বরং আঘাত দিতে পারলেই সুখ। কেন এমন হয়! আমি একটু একটু করে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার এই একধরনের নির্লিপ্ততা, উদাসভাব বাড়ির সবাইকে যেন ভাবিয়ে তুলেছিল। মার মুখে সব সময় গভীর এক উৎকণ্ঠা। এমনিতেই বাবুলের জন্যে মার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না, তার ওপর আবার নতুন করে আমি মাকে গভীর এক উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। আমিও তো চাই না আমার জন্যে এভাবে কেউ ভেবে মরে! মাকে তো বোঝান যাবে না! আমার জন্যে মার চোখেও ঘুম নেই। আমার অস্বস্তি এতে আরো বেড়েছে।

আমার ছুটি ফুরিয়ে এল। আর কোন দ্বিধা নয়। এরমধ্যে মনকে অনেকটা শক্ত করে ফেলেছি। আমার সংশয় কেটে গেছে। আবার একদিন সাগরে ফিরে এলাম। আসার আগে কারো সঙ্গে আর দেখা করি নি।

নদীরও আর, কদিন আগের সেই ভয়ঙ্কর চেহারা নেই। ছোট ছোট ঢেউ। অল্প অল্প বাতাস বইছে। আকাশে মেঘ ছিল। ঝির ঝিরে বৃষ্টি। চটকা বাতাস। ধুপছায়া মেঘ উড়ে যাচ্ছে। অশান্ত টালমাটাল ভাবটা যেন অনেক কেটে গেছে। নদীর কিনারে বক, গাঙচিল, কাদা-খোঁচার ভিড়। অসংখ্য চিতি-কাঁকড়ার গর্ত, তড়বড়ে ছোটাছুটি। জলে এবার টান ধরবে। তাহলেও ভয় নাকি এখনো পুরোপুরি কাটে নি। এখনো দু একটা ভয়ঙ্কর রকমের ঝড় বাকি।

বামনখালি পৌঁছোতে পৌঁছোতে আমার বিকেল হয়ে গেল। সেই ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। বারোটার মধ্যেই কাকদ্বীপ পৌঁছে গেলাম। সামান্য মিষ্টি-টিষ্টি খেয়েছি। একবার ভাবলাম, কাকদ্বীপে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে যাই। পরক্ষণেই আবার মত পাল্টে ফেলেছি। এই ভর-দুপুরে যাওয়া মানে, লোককে শুধু শুধু বিব্রত করা। এর চেয়ে ওপারে চলে যাওয়াই ভাল। সোজা ফেরী-ঘাটে চলে এলাম। নৌকো ছাড়ল আরো অনেক দেরি করে। তখনো ভাঁটা শেষ হয় নি। খানিকটা বাকি। ভাঁটা শেষ হয়ে একসময় জোয়ার শুরু হল। চার পাঁচ কড়া জল বাড়লে তবে নৌকো ছাড়ল। নদীর মুখের কাছে বড় একটা চড়া জলে না ডুবলে নৌকো নিয়ে যাওয়া খুব অসুবিধে। তাছাড়া খালেও জল একেবারে তলায়। এক এক করে লোক উঠল। ঠাসাঠাসি করে বসল। নদীর মেজাজ আজ অনেক শান্ত। এপারে এসে কলতলায় ভাল করে হাত পা ধুয়ে নিলাম। সুরেন হাতীর দোকানে চা বিস্কুট-টিস্কুট খেলাম। এবার ধীরে সুস্থে গেলেই হল। আরো খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে একটা রিক্সা নিলাম। নোনা মাটির

গন্ধ। বৃষ্টি থেমে গেছে। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। মাঠঘাটের চেহারাই যেন এখন পাল্টে গেছে। বাবলার সাঁই সাঁই শব্দ। মেঘ ঠেলে আলো উঁকি দিল। আবার একটা মেঘের চাঙ্গড় ছুটে আসছিল। মাঠের ওপর আলো-ছায়ার খেলা। কেউ কাউকে ধরতে পারে না। কেবল ছুটোছুটি। টুকরো টুকরো মেঘের ভেতর দিয়ে যেন রোদের জোয়ার বইছে। রাস্তার ধারে ধারে কেউ কেউ মাছ ধরছে। ওদের হাতে এখন অঢেল সময়। কিছু বক মাছের লোভে ঘাপটি মেরে বসে আছে। কটা পানকৌড়ি জলে ডুবছে, ভাসছে। বাবলার ডালে মাঝে মাঝে কয়েকটা মাছরাঙা চোখে পড়েছে। দেখতে দেখতে দু মাইল পথ কখন শেষ হয়ে গেল। এই সেই পরিচিত জায়গা। ভাড়া মিটিয়ে রিক্সা ছেড়ে দিলাম।

মহাদেবদার দোকানের সামনে কিছু লোকজন। ওষুধ কিনছে। আমাকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে বেরিয়ে এলেন তিনি। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে পান খেতে খেতে বললেন, 'নমস্তে মাস্টারমশায়।'

'নমস্তে।'

'এই আসা হল নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ভেতরে আসুন, চা-টা খান।'

'এখন নয়, পরে।' আমি ক্লান্তি বোধ করছিলাম।

'আসছেন ত ঠিক?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আসব।'

আমার গলা শুনে বনমালী সাউও বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে খুব খুশি হল। হেসে হেসে বলল, 'যাক, এসে গেছেন, খুব ভাল হয়েছে।'

আমি মুচকি হেসে শুধোলাম, 'এদিকের খবর কি?'

'সে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে। সবই শুনতে পাবেন মাস্টারমশায়।'

'তাই নাকি ?' আমি সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে থাকলাম একটুক্ষণ।

আমি আসার খানিকক্ষণ আগেই স্কুল ছুটি হয়েছে। অনেকেই তখন চলে গেছেন। বারান্দায় দুটো চেয়ার বের করে নিয়ে পণ্ডিতমশায় আর অনাদিবাবু গল্প করছিলেন। অনাদিবাবু বিড়ি টানছিলেন। টিউবওয়েলটার কাছাকাছি আসতে পণ্ডিতমশায় আমাকে দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে এলেন। ভীষণ খুশি। হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমিও করলাম। বাড়ির সব কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। বোঝা গেল, তিনি আমার জন্যে বেশ উৎকণ্ঠা বোধ করছিলেন। আমাকে দেখে যেন তাঁর উদ্বেগ দূর হল। ওঁর এই সহৃদয়তায় আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। আমার বুকের মধ্যে তখনো অলক্ষ্য এক তীর বিঁধে আছে। মানুষের প্রেমহীনতার অভিজ্ঞতা তো আমার হয়েছে! কিন্তু এই মানুষটির বুকে তো ভালবাসার কোন অভাব নেই! সামান্য কদিনের পরিচয়। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি কত আপন করে নিয়েছেন। ওঁর এই সরল, আন্তরিক উত্তাপ আমাকে যেন কেমন অভিভূত করল। কিছুক্ষণ আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না। ওঁর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললাম, 'এখন দুশ্চিন্তা কাটল তো ?'

'তা কাটল।' হেসে আবার বললেন, 'একটু আগেও অনাদিবাবুর সঙ্গে আপনার কথা হচ্ছিল।'

কথা বলতে বলতে আমরা স্কুলের বারান্দায় উঠে এলাম। অনাদিবাবু ক পা এগিয়ে এলেন। মুখে হাসি। কপালে হাত ঠেকালেন, বললেন, 'পেন্নাম হই মাস্টারমশায়।'

'নমস্কার।'

"আমাদের তাহলে ভুলে যান নি দেখছি।'

'কি যে বলেন।'

'হেঁ হেঁ, তা আমরা ভাবলাম, আপনিও বুঝি অন্যদের মতন সরে

পড়লেন। স্কুল খুলে গেছে আজ তিনদিন। এলেন না, কোন খবরও পাঠালেন না, এতে কি বুঝব আমরা ?'

'এখন তো বুঝতে পারলেন ?'

'হেঁ হেঁ, তা আর বুঝি না, বুঝি মাস্টারমশায়, সব বুঝি।' বিড়িটা ছোট হয়ে এসেছে। ফেলে দিলেন।

এমন সময় ভীম এসে দাঁড়াল সেখানে। সমকোণের ভঙ্গিতে মুয়ে পড়ে আমাকে প্রণাম করল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আবার ত ঘুর‍্যা আইলাম ভীম।'

সবাই হেসে উঠল। অনাদিবাবু হেসে হেসে বলেলেন, 'বেশ মনে রেখেছেন দেখছি।'

ভীম আমার কথার জবাবে বলল, 'আমান্‌কে তাইলে ভুল নি!'

'না, ভুলব কেনি ?'

অনাদিবাবু বললেন, 'আরও দিন কতক থাউ, অনেক শিখিয়াব।'

পণ্ডিতমশায় এবার তাড়া লাগালেন। ভীমকে বললেন, 'কথা পরে কইব, তাড়াতাড়ি রান্না বুসাব। ভুখে হয়ত বা পেট জ্বলেঠে।'

'হঁ হঁ যাইঠি।'

অনাদিবাবু ফের একটা বিড়ি ধরালেন। বিড়িটা টানতে টানতে বললেন, 'আমি চলি পণ্ডিত, চলি মাস্টারমশায়, আপনি এখন পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন।' মুখে সেই একই রকম মিটিমিটি হাসি। বিনীত ভঙ্গি। ছাতাটা বগলে ফেলে গুটি গুটি পায়ে হাঁটা দিলেন তিনি।

ভীম তখনো দাঁড়িয়ে আছে। আমার মুখের দিয়ে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমাহরে সকলে ভাল-টাল আছে ত ?'

'আছে।'

ভীম অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল। খুব মনোযোগ দিয়ে যেন আমাকে দেখছে ও। কি ভেবে ফের ও বলল, 'তুমি আইস নি

ভাব্যা পণ্ডিতদার মনটা খারাপ হইথ্‌ল, তুমাকে দেখ্যা খুব আনন্দ হইচে।' ও আর দাঁড়াল না।

একে একে বোর্ডিংয়ের ছেলেরা এসে প্রণাম করল। এখনো সবাই আসে নি। চাষের কাজ নাকি একটু-আধটু বাকি রয়েছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই মাঠে ব্যান্ লাগানর কাজ শেষ হয়ে যাবে। পণ্ডিতমশায় বললেন, 'বসুন।'

আমরা দুজনই বসলাম। সুরেনকে ডেকে চা আর বিস্কুট আনতে বলে দিলেন পণ্ডিতমশায়।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকলাম। পণ্ডিতমশায় যেন সামান্য অন্যমনস্ক। ওঁর মুখটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। আবছা অন্ধকার নামছে গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে। মেঘগুলো আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিছু কালচে ধূসর মেঘও আকাশে রয়েছে। একটা গুমোট গরম হচ্ছে এখন। বাতাসটা ঝট করে কেমন পড়ে গেল।

হঠাৎ পণ্ডিতমশায়ের যেন খেয়াল হল। তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'একটা দুঃসংবাদ শুনেছেন ত?'

'না, কি দুঃসংবাদ?' আমিও ওঁর চোখে চোখে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। বুকটা ধড়াস করে উঠেছে।

পণ্ডিতমশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মুখের ওপর বিষাদের ছায়া। চোখ দুটো যেন ওঁর ছলছল করছে। তিনি বলতে গিয়েও যেন বলতে পারছেন না। গলার স্বর বেরোচ্ছে না। দু একবার কাশলেন। পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমাদের বলরাম মারা গেছে।'

আমি চমকে উঠলাম, 'বলেন কি?' গলার সুরটা কেটে গেল।

'হ্যাঁ।' আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি। চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। মুখটা মুছে নিলেন। বুকের ভেতরটা যেন ওঁর তোলপাড় করছে। এখনো তিনি এ শোক ভুলতে পারছেন না।

আমারও বুকটা এখন ভীষণ ধড়ফড় করছে। চোখে-মুখে এক-ধরনের যন্ত্রণা। আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। ছেলেটা শেষ পর্যন্ত মারাই গেল! বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। ওর জন্যে আমারও এক অস্বস্তি ছিল। ঘুমের মধ্যেও ওর কথা ভেবে চমকে উঠেছি। ওর নরম, লাজুক-লাজুক মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এখান থেকে যাওয়ার দিন ও কচুবেড়ে ঘাট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়েছিল। বারবার করে আমাকে ফিরে আসতে বলেছিল। আমি ফিরে এলাম। ও চলে গেল। আমার বুকটাও কেমন ভারী হয়ে ওঠে। টনটন করে। এরকম একটা খবরের জন্যে তো মোটেই তৈরী ছিলাম না। কি যেন একটা বলতে গেলাম। বলা হল না। আবার গলার স্বর কেটে গেল। ঠোঁট কাঁপল থর থর করে। অস্পষ্ট, ভাঙা ভাঙা শোনাল। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছিল ওর?'

'কি আর, সাপে কেটেছে।'

'সাপের সঙ্গে ওর কেন যে এত শত্রুতা ছিল!'

পণ্ডিতমশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'ঘুমের ভিতরে কেটেছে। শিয়র চাঁদা কাটলে যে আর বাঁচার আশা থাকে না!'

আমি আবার নীরব। একে একে ওর সব কথা আমার মনে পড়ছিল। সাপকে বশ করার জন্যে ওর সে কি অবুঝ নেশা! ওর ঠাকুর্দা ছিল এখানকার নামকরা সাপের ওঝা। কত বিষধর সাপ ধরে এনেছে চোখের নিমিষে। সাপের বিষ নামিয়েছে মন্ত্রের জোরে। লোক বাঁচিয়েছে। বলরামের চোখেও এরকমই এক নেশা ছিল। ওর সামনে একবার সাপ পড়লে, সাপের আর রেহাই নেই। তা সে যে সাপই হোক! অথচ সেই সাপের কামড়েই ওকে মরতে হল! বুকের ভেতরটা আবার উথালপাথাল করে। চোখ

ফেটে জল বেরিয়ে এল আমার। ঘুমের মধ্যে চুপি চুপি এসে ওকে শেষ করে দিয়ে গেল! ওর কথাগুলো এখনো যেন আমার কানে বাজছে। মুখটা স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছি। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে নিলাম। কোনরকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বললাম, 'ছেলেটা বড় সরল ছিল।'

সুরেন চা বিস্কুট নিয়ে এল। আমার আর খেতে ইচ্ছে করল না। ঘুরে ফিরে ওর কথাগুলোই মনে পড়ে যাচ্ছে। আমার চোখ দুটো জ্বালা করছিল। মাথাটা টিপ টিপ করছে। বুকের মধ্যে তখনো দুরু দুরু কাঁপুনি। আমার সেই স্বপ্নটাই ফলে গেল! আমার চোখে-মুখে আরো গভীর এক উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক জমে উঠেছে। আর সবাই ভাল আছে তো? হিমাংশুদের ওখানে কি বড় রকমের কোন ঝড়-টড় হয়েছিল? আমি ভয়ে ভয়ে পণ্ডিতমশায়ের চোখে চোখে তাকালাম। ধীরে ধীরে শুধোলাম, 'হিমাংশুকে তো দেখছি না?'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'ও আসে নি এখনো, আসবে কদিন পরে। হয়ত চাষের কাজ শেষ হয় নি।'

খানিকটা দুর্ভাবনা কাটল। তবু আমার বুকের ভেতরে ভারী কি একটা জমে থাকল। কিছুতেই ওটাকে আর সরান গেল না। বাইরের অন্ধকার একটু একটু করে ঘন হচ্ছে। আকাশ থেকে মেঘ সরে গেছে। পরিষ্কার। এ যেন এক ভেলকিবাজির খেলা। ওখানে এখন তারা ফুটছে। দেখতে দেখতে আকাশটা তারায় তারায় ভরে গেল। চা খেয়ে আমি ওপরে উঠে এলাম। ভীষণ খারাপ লাগছিল আমার। ছেলেগুলোর মনেও সুখ নেই। মুখের ওপর বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে। ওরাও বলরামকে খুব ভালবাসত। বোর্ডিংটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। জামা কাপড় ছেড়ে একটা পা-জামা পরে নিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। ভীষণ ক্লান্ত। আর যেন কিছু ভাবতে পারছি না। জানলা দিয়ে এক ফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে। অজস্র তারা। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

এরমধ্যে এখানে আরো অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। একে একে সবই আমি শুনলাম। মোদ্দা কথা, ঘটনাগুলো কেষ্টবাবুকেই ঘিরে। এখনো নানারকম উত্তেজনা, জটিলতা। কেষ্টবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আগের সেই উৎসাহ আর নেই। কেমন যেন একটু মনমরা। বাইরে থেকে অনেকটা নরম মনে হয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এখনো জ্বলুনি আছে। আজকাল নাকি এদিকে কম আসেন। দেখাই যায় না। আমি চলে আসার পর কমিটির একটা মিটিং হয়েছিল। সেই মিটিংয়ে ভীষণ ব্যাপার। চিৎকার, চেঁচামেচি। হাতাহাতি হওয়ার দশা। কেষ্টবাবুর অনেক কথাই সেই মিটিংয়ে ফাঁস হয়ে গেল। আগে থাকতে কেষ্টবাবু নাকি বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারলে হয়ত আসতেনই না, বা অন্যরকম পাল্টা ব্যবস্থা করতেন। কার্তিকবাবুই আগে থাকতে সব ঠিক ঠাক করে রেখেছিলেন। গোবর্ধন এবং আরো কয়েকজন এসে কমিটির সামনে তাদের আবেদন পেশ করল। কার্তিকবাবুই ব্যবস্থা করে দিলেন। তারা তখন কেষ্টবাবুর ওপর ভীষণ খাপ্পা। মেম্বারদের সামনে বলার সুযোগ পেয়ে গর গর করে সব বলে গেল। দু তিন বছরের কোন জমিতে কত ফসল হয়েছে তার একটা হিসেব দিল। কার্তিকবাবু অফিসের হিসেবটা আগে থাকতেই জোগাড় করে রেখেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা সকলের সামনে শুনিয়ে গেলেন। কারচুপিটা বোঝা গেল। কেষ্টবাবুর মুখ চুণ। কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। গলা দিয়ে আর কোন শব্দ বেরোয় না। তার ওপর টাকা খাওয়ার ব্যাপার। এই সুবাদে আরো নানারকম সুযোগ সুবিধে নেওয়া। কমিটির কয়েকজন যাঁরা কেষ্টবাবুকে পছন্দ করতেন না, তাঁরা উৎসাহিত হলেন। কেষ্টবাবু হঠাৎ কেমন খ্যাপে গেলেন। হাত পা নাড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেন। গালিগালাজ করলেন। এসব নাকি তাঁকে অপমান করার মতলব। তাঁর হাত পা কাঁপছিল। মুখের ওপর এভাবে যে কেউ তাঁকে

অপমান করত পারে, তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেন নি। সকলের ওপরই তিনি ভীষণ চটে গেলেন। রেগে-মেগে একসময় তিনি বেরিয়ে গেলেন। সেই মিটিংয়েই ঠিক হল, কেষ্টবাবুর একার ওপর এসব কাজের আর দায়িত্ব দেওয়া হবে না। তিনজনের একটা কমিটি তৈরী করে দিলেন সকলে মিলে। তাঁরাই জমিজমার বিলি ব্যবস্থা করবেন। হিসেবপত্তর রাখবেন। শুধু তাই নয়, বিল্ডিংয়ের জন্যেও একটা আলাদা কমিটি তৈরী হল। এঁদের ওপরই সব কিছুর দায় দায়িত্ব। এ নিয়ে নাকি জল আরো ঘোলা হল। অনেক জল্পনা-কল্পনা। দুটো তিনটে দল হয়ে গেল। মারামারি হওয়ার উপক্রম। থানা পুলিশ হল। এরপর থেকেই নাকি কেষ্টবাবু কেমন চুপসে গেলেন। বনবিহারীরা খুব খুশি। উল্লাসিত।

যাওয়ার সময়ই আমি আন্দাজ করেছিলাম, এরকমই কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু এতটা যে গড়াবে ভাবি নি। এ ঘটনায় অনেকেই খুশি, অনেকেই ক্ষুব্ধ। গোবর্ধনদের এতটা সাহস নাকি বাড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়! একদিন ওরা মাথায় চড়ে বসবে। কেউ কাউকে আর সমীহ করবে না।

আরো একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এরমধ্যে নাকি পরাণ একদিন তাড়ি খেয়ে টলতে টলতে একটু রাত করে অন্ধকারে ঘরে ফিরছিল। খানিকটা পথ সবে এসেছে। কারা যেন হঠাৎ ঘিরে ধরল ওকে। ও তখন নেশার ঘোরে। লোকগুলো ওকে ভীষণ মারধর করল। মরেই যেত। ওর গোঙানি শুনে কিছু লোক ছুটে আসায় ও বেঁচে গেল। কেষ্টবাবুরা রটিয়ে দিলেন, গোবর্ধনরা ওকে একেবারে খতম করে ফেলার মতলব করেছিল। থানায় এজাহার করল। একটা ফৌজদারী মামলা ঠুকে দিয়েছে পরাণ। আসলে কারসাজিটা নাকি কেষ্টবাবুরই। ওঁর লোকেরাই পরাণকে মেরেছে। মেরে দোষ চাপিয়েছে ওদের ওপর। এ নিয়ে কার্তিক-বাবুদের খুব ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। ঘটনা আরো ঘোলা হয়ে

উঠেছে। কেউ কেউ বলে, কেষ্টবাবুর নাকি আরো একটা বদ মতলব ছিল। পরাণের বউটাকে তিনি পুরোপুরি দখল করতে চেয়েছিলেন।

আমি কোনটাতেই কোন মন্তব্য করি নি। শুধু শুনে গেছি। আমার একটা কথাই মনে হয়েছে, এখানকার হাওয়াও ঘুরতে শুরু করেছে। কেষ্টবাবুই তার প্রমাণ।

সতের

নির্মলবাবু ঠিকই বলেছিলেন, এখানকার আকাশ মাটি তরুলতা, নদী ক্ষণে ক্ষণে বেশভূষা পাল্টায়। আকাশের চেহারাটাও এরমধ্যে বদলাতে শুরু করছে। আজকাল সব সময় আর আকাশটা ঘন, পিঙ্গল মেঘে টসটসে হয়ে থাকে না। এখন বেশ পরিষ্কার, ঝক-ঝকে। বর্ষার শেষ, শরতের শুরু। মেঘ আসে, আবার চলে যায়। আকাশে এখন নীলের ছড়াছড়ি। যেন বিশাল এক নীল সমুদ্র। মাঝে মাঝে সাদা ফেনার মতন কিছু কিছু মেঘের টুকরো হালকা, মন্থর মেজাজে ভেসে বেড়ায়। একটু লক্ষ্য করলে এখানে ওখানে এখন কাশফুল চোখে পড়ে। মাঠে এখন যতদূর চোখ যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ। চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। মাঠের এই শ্যামল কচি কৈশোর আমার চোখেও এক আবেশ ঘনিয়ে তোলে। মাঝে মাঝে বাবলার ডালে নানারকমের পাখি এসে বসে। মাছরাঙা চিল পানকৌড়ি বক জলার ধারে ধারে ঘোরাঘুরি করে। আবার কোন ফাঁকে ধূসর মেঘ এসে আকাশ ভরিয়ে দেয়। মেঘলা দিনের মেজাজ। এমনি করেই এক ঋতুর শেষ হয়, অন্য ঋতুর শুরু। এই শেষ এবং শুরুর মধ্যে কেমন যেন এক জড়াজড়ি ভাব থাকে। এ যেন কোন এক যাদুকরের রূপমহল। দেখে দেখে আশ মেটে না।

আজ বেশ গুমোট ছিল। সারাদিনের মধ্যে এক ফোঁটাও হাওয়া ছিল না। মাঝে মাঝে এক একটা দিন এরকম হয়। ভীষণ অস্বস্তি, কষ্ট। গল গল করে ঘাম ঝরে। কোন কাজেই তেমন উৎসাহ পাওয়া যায় না। খেতে ইচ্ছে করে না। শুয়ে বসেও সময়

কাটে না। থেকে থেকে তেষ্টা পায়। জল খেয়েও তৃপ্তি নেই। সারা শরীরে ফোস্কা গলে যাওয়ার জ্বালা। মাথাটা আমার অনেকক্ষণ থেকেই ধরে আছে। চোখদুটোও কেমন কট কট করছে। ভবর দোকানের চা খেয়েও তা কমল না। মহাদেবদার দোকানে বসে খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করলাম। তিনি দুটো বড়ি দিলেন। একটা বড়ি সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিলাম। নির্মলবাবুকে আজ যেন একটু অন্যরকম দেখাচ্ছিল। সামান্য বিব্রত যেন। অসন্তোষের একটা চাপা আগুন। ওঁর মুখের ওপর একধরনের অস্বস্তি।

আমার পক্ষেও আর নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল না। বোধহয়, এরকম এক পরিস্থিতিতে গা বাঁচিয়ে থাকাও যায় না। যেখানে অন্যায়, অবিচার ; সেখানে তার প্রতিবাদ করতেই হয়। কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায়। নির্মলবাবুদের সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্ঠতা, মাখামাখি দেখে অনেকেই বুঝে নিয়েছেন আমিও ওঁদেরই দলে। এজন্যে অবশ্য আমার কোন দুঃখ বা অনুশোচনা নেই। বরং একধরনের স্বস্তি আছে! অন্যায়ের সঙ্গে তো কখনো আপোষ চলে না!

সন্ধ্যের মুখে মুখে আকাশে একটা মেঘ উঠল। আবার হু হু করে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একবার শুরু হলে আর উপায় নেই। যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আঃ, বাঁচলাম।

নির্মলবাবু গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন।

আমি বললাম, 'আজ আপনার কিছু একটা হয়েছে নির্মলবাবু।'

নির্মলবাবু হালকাভাবে হাসবার চেষ্টা করলেন, বললেন, 'না না, কিছু হয় নি।' একটু চুপ করে থেকে আবার তিনি বললেন, 'আজ আমার সঙ্গে চলুন। কাঞ্চন এরমধ্যে অনেকবার আপনার কথা বলেছে।'

আমি অবাক চোখে চেয়ে থেকে বললাম, 'আমাকে তো কাঞ্চন-বউদি চেনে না, আমার কথা কি করে বলল ?'

নির্মলবাবু হাসলেন একটু, বললেন, 'ও আপনাকে চেনে। আমার মুখে শুনে শুনে আপনার সম্পর্কে একটা ধারণাও করে নিয়েছে।'

আমি উৎসাহ বোধ করছিলাম। খুশি খুশি গলায় বললাম, 'চলুন।' ওকে দেখার জন্যে মনে মনে আমারও দীর্ঘদিনের একটা লোভ। ওর সম্পর্কে আমারও কৌতূহল কিছু কম নয়। আর দেরি না করে আমরা উঠে পড়লাম।

বড় রাস্তা ছেড়ে একসময় আমরা মেঠো পথ ধরলাম। হাওয়ায় মেঘ উড়ে যাচ্ছে। দুপাশে ধানের ক্ষেত। এর ভেতর দিয়েই আমরা হাঁটছি। আমাদের সাড়া পেয়ে ঘাস-ফড়িং উড়ে উড়ে যাচ্ছে। মেটে গন্ধ। মাঠের বুকে সবুজের ঢেউ। মাঠের বুকেই একসময় সন্ধ্যে হল। আমরা তাড়াতড়ি করে হাঁটছিলাম। ভয়ও হচ্ছিল। আলের দুপাশে অনেক গর্ত। সাপ-টাপ বেরোতে পারে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে স্বস্তি বোধ করলাম। বুক থেকে ভয়টা যেন নেমেছ। নির্মলবাবু আমাকে বাড়ির লাগোয়া বাইরের ঘরে এনে বসালেন। বাড়ির ভেতরে খবর চলে গেছে। সামনে বাগান। মাটির দেওয়াল। টালির ছাদ। নারকেল গাছ দিয়ে বাড়িটা ঘেরা। ঝাঁকড়া-মাথা দুটো তেঁতুল গাছও আমার চোখে পড়েছে। কাছেই নদী। বাতাসে ঢেউয়ের শব্দ। নির্মলবাবু বললেন, 'বসুন, এক্ষুনি আসছি।'

একটি ছেলে এসে লণ্ঠন রেখে গেল। বাইরে ফিকে অন্ধকার। আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে। ঝোপ-ঝাড়ে, গাছ-গাছালির আনাচে কানাচে জোনাকির আলো। আমি সিগারেট ধরালাম। কাঞ্চন-বউদি তাহলে আমার সব কথা শুনে ফেলেছে!

একটু পরে নির্মলবাবু এলেন। সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'নদীটা খুব কাছেই।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

খাবার এল। প্লেট ভরতি লুচি, হালুয়া, আলুভাজা জল দিয়ে গেল।

আমি বিস্ফারিত চোখে বললাম, 'এ কি করেছে!'

'খান, খেতে খেতে অনেক দেরি হবে। সবে পুকুরে জাল ফেলা হচ্ছে। মুরগী কাটছে।' বলে মুখ টিপে তিনি হাসলেন।

আমি মাথায় হাত দিলাম, 'বলেন কি, এ যে এলাহি ব্যাপার।'

নির্মলবাবু খেতে খেতে বললেন, 'আমি এসব কিছু জানি না, সবই কাঞ্চনের ব্যাপার।'

'এখনো তো মানুষটাকে চোখেই দেখলাম না।'

নির্মলবাবু মুহূর্তে যেন একটু গম্ভীর হলেন। সামান্য বিমর্ষ দেখাচ্ছিল ওঁকে। বুকের ভেতরে যেন হঠাৎ একটা খোঁচা লেগে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললেন, 'দেখলে ওর জন্যে আপনারও খুব কষ্ট হবে।'

আমি বোকার মত খানিকক্ষণ ওঁর দিকে চেয়ে থাকলাম! কিছু বুঝতে পারলাম না।

একটু পরে কাঞ্চন-বউদি ঘরে ঢুকল! দেখেই চিনতে পারলাম। পরনে ছাপার শাড়ি। মুখে হাসি। হাত তুলে নমস্কার করল।

আমিও প্রতি-নমস্কার করলাম। ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে থাকলাম। আমি অবাক। কোন কথা বলতে পারলাম না। ও যেন হাঁপাচ্ছিল।

নির্মলবাবু ওকে বললেন, 'তুমি বসো কাঞ্চন।'

ও বসল। এক ক্লান্ত, বিষণ্ণ প্রতিমা যেন।

আমি মনে মনে ওর সম্পর্কে একটা ছবি তৈরী করে রেখেছিলাম। এখন দেখলাম, আমার সেই ছবির সঙ্গে ওর কোন মিল নেই। ভীষণ রোগা। দুর্বল, ক্লান্ত। গলার স্বর ক্ষীণ। সারা মুখখানায় চোখ দুটো টলটল করছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে ঘন হয়ে। আমার মনে হল, কাঞ্চন-বউদি অসুস্থ। নির্মলবাবু

আমার কাছে এটা কখনো স্পষ্ট করেন নি। তবু মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে ওঁর কষ্টটা বেরিয়ে আসত। আমার কাছে হেঁয়ালির মতন মনে হত। খানিক পরে আস্তে আস্তে বললাম, 'আপনাকে তো খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে কাঞ্চন-বউদি!'

ও টলটলে চোখে তাকাল একবার। ঠোঁটের ওপর ম্লান একটু হাসি। হাসিটা যেন পড়ন্ত বিকেলের মত বিষণ্ণ, মায়া জড়ানো। কেন যেন ওর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অবসন্ন গলায় বলল, 'ও কিছু নয় ভাই। আমার এ রোগ, না মরলে আর সারবে না।'

নির্মলবাবু সামান্য আহত হলেন ওর কথায়। গম্ভীর গলায় বললেন, 'এমন করে বলো না কাঞ্চন। তুমি তো জান, এসব কথা শুনলে আমার খুব খারাপ লাগে।'

ওর মুখের ওপর ক্ষণিকের জন্যে মধুর এক হাসি ফুটল। আবার তা মিলিয়ে গেল।

আমারও খারাপ লাগছিল। আমি তো এমনটা কখনো ভাবতেই পারি নি। ওর কি এমন অসুখ! আমি সাগ্রহে বললাম, 'কলকাতায় গিয়ে একবার বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করালেই তো হয়!'

কাঞ্চন হাসল। আস্তে আস্তে বলল, 'একবার ওদিকে যাব।'

'তুমি আর গিয়েছ!' বলতে বলতে নির্মলবাবু সিগারেটের টুকরোটায় টান দিলেন।

আমার খাওয়া হয়ে গেছে। চা এল। চাকর এসে গ্লাস প্লেটগুলো তুলে নিল।

কাঞ্চন বলল, 'আপনার কথা ওর মুখে খুব শুনেছি। স্কুলের কথা হলেই শুধু আপনার গল্প। আপনাকে দেখার ভীষণ ইচ্ছে ছিল।'

'এখন দেখলেন তো!' আমি সকৌতুকে হাসছিলাম।

'হ্যাঁ। ও ঠিকই বলেছে।'

আমি এবার জোরে জোরে হাসলাম। অনুনয়ের গলায় বললাম,

'বলুন না কাঞ্চন-বউদি, নির্মলবাবু আমার সম্পর্কে কি বলেছেন।'

নির্মলবাবু বললেন, 'আমি খারাপ কিছু বলি নি, ভালই বলেছি, তাই না কাঞ্চন?'

কাঞ্চন মাথা নাড়ে।

নির্মলবাবু যেন তখন অন্য কিছু ভাবছিলেন। একটু গম্ভীর, বেদনার্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার চোখে চোখে চেয়ে থাকলেন অল্পক্ষণ। পরে বললেন, 'কাঞ্চন কিন্তু বরাবর এরকম দেখতে ছিল না অরুণাংশুবাবু।'

'সে আমি বুঝতে পারি।'

কাঞ্চন শাড়ির আঁচলটা দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে ছেলেমানুষী গলায় শুধলো, 'কি বুঝতে পারেন?'

আমি মুখ টিপে টিপে হাসলাম, বললাম, 'এ তো খুব সোজা হিসেব, দেখতে ভাল না হলে কি আর নির্মলবাবু এখানে এসে সাত-পাকে বাঁধা পড়েন!'

কাঞ্চন কৃত্রিম ভঙ্গিতে চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে ওঁকে বলল, 'তুমি বুঝি এসব আজেবাজে কথা বলেছ!'

নির্মলবাবু হেসে ফেললেন, বললেন, 'এটা আজেবাজে কথা হল! তোমার জন্যে নদী ডিঙিয়ে ঝড়-জল তুচ্ছ করে এখানে চলে এসেছি, এ কি কম কথা!'

'থাক, আর বাহাদুরি করতে হবে না।'

'হ্যাঁ, অরুণাংশুবাবুকে আমি সব কথা বলেছি। তোমার ভালবাসাই এখানে আমাকে টেনে এনেছে! এতে তো আর লুকোচুরির কিছু নেই।' বলে তিনি হাসছিলেন অল্প অল্প।

'আমিই জানতে চেয়েছিলাম কাঞ্চন বউদি!'

কাঞ্চনের মুখখানা মুহূর্তে কি এক বেদনায় ভরে গেল। মুখের ওপর একধরনের উদাস, ব্যাকুল ভাব। চোখ দুটো যেন ঝাপসা

হয়ে ওঠে। পুরনো দিনের কথা মনে হলে বুকের ভেতরটা যেন আজো কিরকম গুমরে গুমরে ওঠে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ও বসে থাকল কিছুক্ষণ। পরে থেমে থেমে বলল, 'আমার জন্যে তুমি তো সবই ছাড়লে! এখন ভাবলে খুব খারাপ লাগে!' ওর গলা ধরে আসে।

নির্মলবাবু বললেন, 'তার জন্যে আমার তো কোন দুঃখ নেই কাঞ্চন। আমি তো একবারও তা বলি নি!'

'বল নি বলেই তো এত কষ্ট আমার।'

'তুমি কি আজো আমাকে চিনতে পারলে না কাঞ্চন?'

'চিনেছি বলেই তো আমি আজো মরতে পারি না। তোমার কথা ভেবে আমার খারাপ লাগে!' ওর কথাগুলো জড়িয়ে যায়। ঠোঁট কাঁপে। বুকের ভেতরে যেন ওর খুব কষ্ট। আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে নিল। খানিকটা সামলে নিয়ে ও ফের বলল, 'আমি বুঝতে পারছি গো, আমি আর তোমাদের কাছে বেশীদিন নেই।' গলা ধরে আসে। এসব কথা মনে হলেই ওর চোখ জলে ভরে ওঠে। ভীষণ কান্না পায়। ও মুখ নিচু করে আছে। চোখ ফেটে টস টস করে জল পড়ছে।

নির্মলবাবুরও বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে! আড়ষ্ট গলায় বললেন, 'এরকম করে বলো না তো কাঞ্চন।'

আমি কি বলব, বুঝতে পারি না। পরিবেশটাই দেখতে দেখতে বিষণ্ন হয়ে উঠল।

কাঞ্চন উঠে পড়ল। কোনরকমে অস্ফুটে শুধু ও বলল, 'আমি যাচ্ছি।' চোখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে ও চলে গেল।

নির্মলবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'এখন গিয়ে ও বিছানায় শুয়ে পড়ে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে।' বলতে বলতে তিনিও যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

আমি চুপ করে থাকি। বাইরে হট্টি-টি-টি পাখিটা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। নদীর বুক থেকে যেন এক কান্না উঠে আসছে।

কাঞ্চন-বউদির জন্যে এখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। এসব কথা শুনলে কার না কষ্ট হয়! আসল দুঃখটা যে ওর কোথায় আমি জানি না। আমি তো অন্যরকমই ধারণা করে রেখেছিলাম।

কিছুক্ষণ পর নির্মলবাবুই ধীরে ধীরে বললেন, 'বুঝলেন অরুণাংশুবাবু, কাঞ্চন যেন কিরকম হয়ে গেছে। আগে কিন্তু ও এরকম ছিল না।' ওঁরও গলায় গভীর এক কষ্ট জড়িয়ে থাকে। বলতে বলতে ওঁর চোখ-মুখ মলিন হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, 'ওর রোগটা আসলে কি ?'

নির্মলবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আরো যেন কি ভাবলেন একটু সময়। শেষে বললেন, 'সেটা তো আমিও বুঝতে পারি না। দিন দিনই ও শুকিয়ে যাচ্ছে। পেটের মধ্যে নানারকম জ্বালা-যন্ত্রণা, খেতে-টেতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে শরীর খারাপের জন্যে বিছানা থেকেই ও উঠতে পারে না। উঠলেই মাথা ভন ভন করে। গা গুলোয়। প্রথম প্রথম ও গা করে নি, আমিও না। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলাম, ও রাজী হল না। কাঞ্চন এক অদ্ভুত ধরনের মেয়ে।' নির্মলবাবু চুপ করে থাকলেন কিছু সময়। সিগারেট ধরালেন। তিনি ওর ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। একটু পরে চাপা গলায় বললেন, 'এখন আমারও ভয় হচ্ছে অরুণাংশুবাবু, কিছু যদি একটা হয়ে যায়।' ওঁর গলার স্বর কেটে গেল।

আমি সহানুভূতির গলায় বললাম, 'এখুনি ওকে একবার কলকাতায় নিয়ে যান। রোগ হলে ওষুধ তো চাই!'

'এটাই ওকে বোঝাতে পারি না।'

আমার কাছেও ব্যাপারটা জটিল, দুর্বোধ্য মনে হয়। নিশ্চয়ই ওর মনে গভীর কোন দুঃখ আছে। দুঃখ নির্মলবাবুর মনেও।

আকাশে এখন আরো তারা ফুটেছে। বাইরে অন্ধকারটা আরো গাঢ় হচ্ছে। এখানে আজ না এলে, নির্মলবাবুর মনের আর একটা দিক আমার কাছে অজানা থেকে যেত। আমারও বুকের

ভেতরটা দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে। মানুষের মন বড় বিচিত্র, বড় জটিল। রহস্যের পাকে পাকে জড়ানো। ভালবাসার ঋণ কি এভাবেই শোধ করতে হয়! বাতাসে এখন কার কান্না ভেসে বেড়ায়! আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

আঠার

সেই লোকটি আবার এল। চাঁপাতলার দীনু গায়েন। বয়েস পঁয়ত্রিশ-টয়ত্রিশ হবে। শক্ত মজবুত চেহারা। ওদের অবস্থা ভাল। আগে নাকি আরো ভাল ছিল। একসময় ওদের বহু জমিজমা ছিল। এখন শরিকে শরিকে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। তারপরও ওর ভাগে যা পড়েছে, তাও নাকি অনেক। ওর ছেলে গোপাল ক্লাস ফাইভে পড়ে। আজ কদিন ধরেই গোপালের বাবা পণ্ডিতমশায়ের কাছে খুব ঘোরাঘুরি করছে। ছেলেটাকে পড়ানোর জন্যে বাড়িতে একজন মাস্টারমশায় রাখতে চায়। তিনি নিজের লোকের মতন বাড়িতে থাকবেন, খাবেন আর ছেলেটাকে একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দেবেন। ওরাও এতে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পারবে। অন্য কেউ হলে চলবে না। গোপালের নাকি আমাকে খুব পছন্দ।

পণ্ডিতমশায় সবই আমাকে বলেছেন। আমি তখনো মন ঠিক করতে পারি নি। অপরিচিত কারো বাড়ি গিয়ে থাকার কোন অভিজ্ঞতাই আমার নেই। এ ব্যাপারে আমার একধরনের সঙ্কোচ আছে। পণ্ডিতমশায় বলেছেন, 'এমনিতে আরামেই থাকবেন। খাওয়া-দাওয়াও ভাল। কিছুদিন গিয়ে থাকুন না, ভাল না লাগলে চলে আসবেন। এত করে যখন বলছে, তখন যান একবার।'

'ছেলেটা তো পড়াশুনোয় বেশ ভালই।'

পণ্ডিতমশায় কি ভেবে হেসে ফেলেছেন। হাসতে হাসতে বলেছেন, 'দীনু অবশ্য এসবের খবর-টবর কিছু রাখে না। আমি ত প্রথমে চমকেই গিয়েছিলাম, ছেলের ব্যাপারে ত ওর এরকম উৎসাহ

আগে দেখি নি, ব্যাপারটা কি! পরে বুঝতে পারলাম।' বলেই আবার হাসতে লাগলেন জোরে জোরে।

আমিও অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি। ওঁর কথার ভেতরে যেন আরো কোন রহস্য আছে। আমি তো লোকটার মধ্যে উৎসাহের কোন অভাব দেখছি না। বারবার এসে ঘুরে যাচ্ছে। অনুনয় বিনয় করে কথা বলছে। আমাকে না নিয়ে গেলে যেন ওর ভীষণ ক্ষতি-টতি হয়ে যাবে, এরকম একটা ভাব। ছেলেটার জন্যে এখন থেকেই যেন ওর কত ভাবনা! আমার হাতে ছেলেটার একবার দায়িত্ব দিতে পারলে যেন ও খুব নিশ্চিন্ত হয়। অথচ পণ্ডিতমশায় অন্যরকম বলছেন! আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, 'তার মানে?'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'মানে খুবই সোজা। সংসার নিয়ে এত ভাবনা-টাবনার দীনুর সময় কোথায়! নেশা করেই ত ওর দিন রাত কেটে যায়। ওর বউটা আবার অন্যরকম। ওর বউয়ের হাতেই সংসারের হাল। একটু লেখাপড়াও জানে। ছেলের ব্যাপারে ওর বউয়েরই ভাবনা বেশী। ছেলেটা গিয়ে হয়ত আপনার কথা-টথা খুব বলেছে। সেজন্যেই আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এত ঘোরাঘুরি করছে।'

'ওরে বাবা, নেশা করে শুনলেই যে কেমন ভয় করে!' আমি মুখ টিপে টিপে হাসি।

পণ্ডিতমশায়ও আমার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'না, ভয় পাওয়ার মতন কিছু নয়, ও আপনার সামনেই দেখবেন আসবে না। সে-সব দিকে জ্ঞানের নাড়ি টন টনে।'

অনেকক্ষণ থেকেই দীনু বসে আছে। পণ্ডিতমশায়কে একসময় ও বলল, 'আপনি ওঁকে সব কথা কইচ ত?'

'আমি ত কইচি। কিন্তু উনি যে এখানটা ছাড়্যা যাইতে চাঠে নি।'

দীনু কিছুতেই যেন শুনবে না। আরো বিনীত কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা কর্যা দিতেই হবে পণ্ডিতমশায়।'

'বারে, আমি এর কি করব!'

'সে আমি জানি না। আপনিই ওঁকে মত করাতে পারবেন।' ওর গলায় কাকুতি মিনতি।

'আমি ত অনেকবারই কইচি! এবার তুমি নিজে একবার ওঁকে ভাল কর্যা কও না!'

দীনু আরো কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বলল, 'আপনাকে মাস্টারবাবু আমার এই উপকারটা করতে হবে।'

এরপর ওকে ফিরিয়ে দিতে আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগছিল। ওর এই বলার মধ্যে আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। আমি মৃদু হেসে বললাম, 'এক কাজ করলে হয় না!'

'আপনি কও না কি কাজ?' ও আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ও-ও যেন খানিকটা উৎসাহ বোধ করছিল।

'ওকে স্কুল বসবার কিছু আগে এখানে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? আমি নিশ্চয়ই দেখিয়ে-টেখিয়ে দেব।'

আমার এ প্রস্তাবে ও ঠিক খুশি হল না। মুখটা কিরকম কালো হয়ে গেল। হাত কচলে সেই একই রকম ভঙ্গিতে ও বলল, 'আমার এঠি আপনার থাকা-খাওরার কোন অসুবিধা হবে নি মাস্টারবাবু।'

'ঠিক তার জন্যে নয়!' আমার গলার স্বর খানিকটা নরম।

'তাইলে আর আপত্তি করব নি মাস্টারবাবু। দয়া কর্যা মত কর্যা ফ্যাল।'

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে আমি আবার বললাম, 'ভাবছি রোজ রোজ এতটা পথ হাঁটাহাঁটি করতে পারব কিনা!'

'অত হাঁটব কেনি। আমার ত সাইকেল আছে। আপনি সাইকেলে যাওয়া আসা করব।'

আমি এবার হেসে ফেললাম, 'আপনি দেখছি আমাকে না নিয়ে ছাড়বেনই না!'

দীনু সবিনয়ে সরল গলায় বলল, 'না মাস্টারবাবু, এটা আমার একটা আবদার, আপনাকে তা রাখতে হবে। টকাটা আপনার কথা খুব কয়।'

পণ্ডিতমশায় মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন। এবার সরস হালকা গলায় বললেন, 'মাস্টারমশায়কে ত লিয়া যাউঠ্। নেশা-টেশা কর্যা আবার ওঁর ছামু-টামু আসবু নি।'

দীনু লজ্জায় যেন মুখ তুলতে পারে না। কেমন আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে ও বসে থাকল কিছুক্ষণ। একটু পরে ও বলল, 'তাইলে কত্‌বালা আস্যা লিয়াব কও!'

'কদিন পরে গেলে হয় না?'

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'একই কথা! সেই যেতেই যখন হবে, তখন আগেই যান না। আপনি গেলে ওর ঘাড় থেকেও একটা বোঝা নামবে।' বলে মুচকি হাসলেন তিনি।

আমিও হাসি হাসি মুখ করে বললাম, 'তাহলে কাল বিকেলেই আসুন।'

দীনু মহা খুশি। ও উঠে পড়ল। শরীরটা অর্ধেক নুইয়ে হাত জোড় করে ও একবার পণ্ডিতমশায়কে, একবার আমাকে প্রণাম করল। ও কথা পেয়ে গেছে, আর কোন ভাবনা নেই। ওর মুখের ওপর থেকে মলিন ভাবটা মুহূর্তে সরে গেল। ও যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'আমাদের মাস্টারমশায়কে ত খুব লিয়া যাউঠ্ দীনু, মনে থায় যেন, মাঝে মাঝে তোমার পুকুর নু ভেটকীমাছ-টাছ ধর্যা পাঠি দুবু।' বলে জোরে জোরে হেসে উঠলেন তিনি।

দীনু সবিনয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, 'এ আর এমন একটা কি কথা! এর ভিত্‌রেই পাঠি দুব।'

আমি এখান থেকে চলে যাব শুনে ছেলেগুলোর মন খারাপ হয়ে গেল। ওরা যেন এটা ভাবতে পারে নি।

আমি ওদের বুঝিয়ে বললাম, 'বেশ তো, খারাপ লাগলে চলে আসব। এমন করে ধরেছে যে আর না করা গেল না।'

সরোজ বলল, 'আপনারই ত কষ্ট হবে। রোজ এতটা পথ হাঁটতে পারবেন?'

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললাম, বললাম. 'দেখাই যাক না কদিন।'

সুরেন আবদারের ঢঙে বলল, 'ওসব আমরা কোন কথা শুনতে চাই না, কদিন পরেই আপনি এখানে চলে আসবেন কিন্তু।'

অর্ধেন্দুও মুখ বেজার করে বলেছে, 'তার চেয়ে গোপালকে এখানে পাঠিয়ে দিলেই পারত। পয়সা আছে ত, খালি বড় মানুষী চাল!'

আমি চোখ বড় বড় করে গলায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললাম, 'ওদের বুঝি অনেক পয়সা!'

অর্ধেন্দু ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'হঁ্যা স্যার, ওদের অনেক জমিজমা!'

আমি বুঝতে পারছি, ওরা আমার যাওয়াটা চাইছে না। কিন্তু এখন তো আর কোন উপায় নেই। আমি বললাম, 'তোমাদের সঙ্গে তো রোজই দেখা হচ্ছে।'

সরোজ বলল, 'হোক, তবু আমরা আপনাকে ছাড়ব না।'

'এখন তো কথা দিয়ে ফেলেছি। কি আছে, কটা দিন থেকেই আসি না!'

'কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসতে হবে।'

পরের দিন স্কুল ছুটির আগেই দীনু চলে এল। আমি ছুটির পর একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করে নিলাম। নির্মলবাবু কার্তিকবাবুর সঙ্গেও এ ব্যাপারে একটু কথা বললাম। ওঁরা খুশিই হলেন। ওঁদের

বিশ্বাস, পণ্ডিতমশায় যখন বলে দিয়েছেন তখন আর চিন্তার কিছু নেই। জামা কাপড়গুলো গোছগাছ করে নিলাম। গোপালও ওর বাবার সঙ্গে বসে ছিল। আমি ওকে বললাম 'তুমি বাড়ি চলে যাও গোপাল। তোমার আর বসে থাকতে হবে না।'

গোপাল আমার কথা শুনে আরো লজ্জায় পড়ল। কেমন আড়ষ্ট, জড়সড় ভঙ্গি। ও একবার ওর বাবার মুখের দিকে তাকাল।

দীনু ফিস ফিস করে ছেলেকে বলল, 'ঠিক আছে, তুই তাইলে ঘর চল্যা যা। ঘরে যায়া মাকে কইবু খাবার-টাবার কর্যা রাখতে।'

গোপাল চলে গেল। আমরা আরো কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে পড়লাম। সুরেন অনিল ওরাও সঙ্গে এল। অনেকখানি পথ এগিয়ে দিল ওরা। তখনো সন্ধ্যে হয় নি। আকাশ নীল। আশপাশে সবুজ কচি ধানের চারাগুলো বাতাসে দুলছিল। কেমন ঢেউ খেলে খেলে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সাদা বক উড়ে উড়ে যাচ্ছে। শালিখ, কাদা-খোঁচা, ফিঙে, আরো অনেক পাখি চোখে পড়ল। মাঠের বুক থেকে দিনের আলো যেন দৌড়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। পেছনের ছায়াটা ক্রমে ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে। সবুজ মাঠের বুকে যেন আলোছায়ার এক খেলা চলছে। আমি খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে এসব দৃশ্য দেখলাম। আমরা হাঁটছি তো হাঁটছিই। পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। আমি একসময় দীনুকে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি, আর কতদূর ?'

'এই ত আসিচি ,'

হঠাৎ সুরেন ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল, 'আর যাব না স্যার, ওই ত বাড়ি দেখা যায়।'

দীনু বলল, 'তা হবে নি। আইজ তন্‌কে আমান্‌কের এঠি রইতে হবে।'

'না না, তা হবে নি দীনুদা। পরে একদিন আইলে হবে।' ওরা আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

আমরাও সন্ধ্যের মুখে মুখে বাড়ি চলে এলাম। গোপাল তাড়াতাড়ি করে বাইরে বেরিয়ে এল। ওর মুখে বিনীত, নম্র হাসি।

'আইস মাস্টারবাবু।' দীনু সসম্ভ্রমে ডাকল।

আমি দেউড়ি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বড় বড় ঘর। ঘরের সঙ্গে দাওয়া। মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে। শণের চাল। চালটা অনেকখানি ঝুলে আছে। উঠোনটা পরিষ্কার, নিকান। ঝক ঝক করছে। একটা কুটোও পড়ে নেই। বাড়িটার মধ্যে শ্রী আছে যেন। পা দিয়েই সেটা টের পাওয়া যায়। দূরে গোয়াল-ঘর। বাড়ির সামনে বড় একটা পুকুর। বাঁধান ঘাট। পুকুরের তিন পাশে নারকেল গাছ, কলাগাছ। নারকেল গাছে অনেক ফল ধরে আছে। দেখতে দেখতে আনাচে কানাচে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। পায়ে পায়ে যেন অন্ধকারটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মাটি গোবর, ঘাস পাতা, গাছ-গাছালির পাঁচ মিশেলী একটা গন্ধ এসে নাকে লাগছে। এরও যেন অদ্ভুত এক মাদকতা আছে। প্রথমে তুলসী তলায় সন্ধ্যে-বাতি দেখিয়ে ঘোমটা টেনে গোপালের মা আস্তে আস্তে ঘরে ঘরে বাতি দেখাল। আমি যেন মুহূর্তের জন্যে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বুকের ভেতরে খানিকটা বায়ু যেন আটকে গেছে। সেটা বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করছিল। আমি বারান্দায় এসে বসলাম। আগেই সেখানে চেয়ার সাজানো রয়েছে।

দীনু বলল, 'আগু হাত-পা-টা ধুয়্যা লও।'

গোপাল হাতে গামছা, জল নিয়ে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার খুব লজ্জা করছিল। অস্বস্তিও। এত ভক্তি, যত্ন তো আমি আশা করি নি! বারণ করা সত্ত্বেও ও আমার পায়ে, হাতে জল

ঢেলে দিল। গামছাটা বাড়িয়ে দিল। খড়ম জোড়া এগিয়ে দিল। আমি হাত-মুখ ধুয়ে এসে আবার চেয়ারে বসলাম।

দীনু ছেলেকে আস্তে করে বলল, 'তোর মাকে একবার আসতে কইব ত।'

গোপাল মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেল।

একটু পরে গোপালের মা এসে সামনে দাঁড়াল। মুখের ওপর সামান্য ঘোমটা। আমি একবার মুখ তুলে ওকে দেখলাম। পরনে ছাপার একটা শাড়ি। মুখটা ভাল করে দেখা গেল না। ঘোমটার ভেতর থেকে টালুরটুলুর চোখে আমাকে দেখছে। ওর ঠোঁটের কোণায় পাতলা একটু হাসি। আমার কেন যেন মনে হল, ওর চোখের ভেতরে কেমন গভীর এক কৌতূহল, মায়া। বুকের ভেতরটা যেন ধক করে ওঠে। কোন কোন চোখ আছে, একবার সেই চোখের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরান যায় না। অদ্ভুত যেন টান থাকে। গোপালের মার চোখেও যেন ওরকমই কোন জাদু আছে। ওর গায়ের রঙ ময়লা, শরীর স্বাস্থ্য ভাল। একটু নিচু গলায় ও বলল, 'কও ত ডাকল কেন?'

দীনুর চোখে-মুখে খুশির আমেজ। বুকটা টান টান করে ও বলল, 'প্রথমে ত মাস্টারবাবু আসতে চায় নি। অনেক সাধাসাধি কর‍্যা তবে ত লিয়াস্‌চি। দেখবু, যত্ন-টত্নের যেন কোন অসুবিধা না হয়।'

আমি সঙ্কোচের গলায় বললাম, 'না না, এত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। অসুবিধে হলে আমিই বলব।'

'শুন্যা খুব ভাল লাগল মাস্টারবাবু। নিজের লোকের মতন এঠি রইব। যখন যা দরকার হবে কইব। কোন লজ্জা করব নি।'

'না, লজ্জা করব কেন?' আমার বলার মধ্যে তখনো বুঝি খানিকটা অস্বস্তি, আড়ষ্টতা ছিল। আমি তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলাম। মুখ টিপে হাসছিলাম।

গোপালের মা কি ভেবে সরাসরি নম্র গলায় আমায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি চা খাও ত?'

আমি হেসে হেসে বললাম, 'নেশা বলতে যা বোঝায় আমার ওই একটাই।'

দীনুর মুখে একগাল হাসি। চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে ও বলল, 'বুঝচ মাস্টারবাবু, গোপালের মারও চা খাবার খুব নেশা।'

আমি তাকালাম। গোপালের মা-ও আমার মুখের দিকে তখন একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ওর মুখের ওপর থেকে ঘোমটাটা অনেকখানি সরে গেছে। ওর চোখের তারায় সেই ঘুম ঘুম এক রহস্য ঘন হয়ে আছে। টানা টানা ডাগর চোখ। মুখের গড়নে বাড়তি এক টান আছে। দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ও বলল, 'তাইলে চা কর‍্যা লিয়াসি।' ও চলে যাচ্ছিল।

দীনু বলল, 'মাস্টারবাবুকে আইজ খাবিবু কি!'

গোপালের মা ফিরে তাকাল। চোখের কোণে হাসি ঝিলিক মেরে উঠে। ভুরুটা খানিক কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে কামড়ে বলল, 'সে ত খাওয়ার সময় দেখা যাবে।' ও চলে গেল।

উনিশ

পণ্ডিতমশায় কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলেন নি, গোপালের মার হাতেই সংসারের আসল চাবিকাঠি। কদিনের মধ্যেই আমি তা টের পেয়েছি। সব দিকেই ওর সতর্ক নজর। সংসারের কোন কাজই ওর কথা ছাড়া হয় না। এখানে আসার পর থেকে দেখেছি, আমার ঘুমটা যেন আরো তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। ভোরে কাক ডাকার কিছু পরেই আমি উঠে পড়েছি। গোপালের মার ঘুম ভাঙে আরো অনেক আগে। সেই অন্ধকার থাকতে থাকতেই বুঝি ও উঠে পড়ে। না উঠে যেন পারেও না। জেগে উঠে অনেকদিন দেখেছি, গোপালের মা সারা উঠোনটা ঝাঁট দিয়ে গোবর-ছড়া ছিটিয়ে দিচ্ছে। কখনো বা নিপুণ হাতে ভিটের দেওয়াল মুছে নিচ্ছে। আবার কখনো এগুলো সেরে-সুরে গরুগুলো বাইরে বের করে গোয়াল-ঘর পরিষ্কার করছে। একটু আলো ফুটলে ছেলেকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে। ওর মুখ-হাত ধুইয়ে দিয়েছে। এই করতে করতে সকালের রোদ যখন একসময় উঠোনে এসে হুড়মুড় করে পড়ে, তখন ওর অনেক কাজ সারা। এরপর আবার কাজের অন্য একটা ধাপ শুরু হয়। সারাক্ষণই যেন ব্যস্ত, চটপটে ভাব। এরই মধ্যে একটু হাসি-টাসি, ঠাট্টা-তামাসা, সামান্য রঙ্গ রসিকতা। কোন রকম ক্লান্তি নেই।

আবার মুখ ধুয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরই মধ্যে চা নিয়ে এসে হাজির। আমাকে বলতেও হয় না। মুখ দেখেই বোধহয় গোপালের মা আমার মনের কথাটা ধরতে পারে। হাতের কাজ ফেলে রেখে

ঝটপট চা করে নিয়ে আসে। আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছি। অস্ফুট গলায় বলেছি, 'এরই মধ্যে চা হয়ে গেল?'

গোপালের মার চোখ-মুখ হাসিতে চকচকে হয়ে ওঠে। আমাকে ভরাট চোখে একপলক দেখে নেয়। পরে চোখ নামিয়ে নিতে নিতে সকৌতুকে বলেছে, 'আপনার তরে আমারও অখন একটু চা খাওয়া হয়।'

আমিও ওর চোখে চোখে তাকাই। মুচকি হেসে বলি, 'চা খেলেই যেন ম্যাজ-ম্যাজে ভাবটা কেটে যায়।'

গোপালের মা ডাগর চোখে আবার একবার আমাকে দেখে। ওর চোখের ভেতরে এক রহস্যের ছায়া তির তির করে। একটু পরে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে ও ধীরে ধীরে চোখটা অন্যদিকে সরিয়ে নেয়। ওর বুকটা যেন দ্রুত ওঠানামা করছে। কি ভাবতে ভাবতে ও আবার আমার মুখের দিকে চোখ টান টান করে তাকিয়েছে। পরে মুচকি হেসে নরম গলায় ও বলেছে, 'চা নেই খাইলে ত আমার খুব মাথা ধর্যা যায়।'

'আমিও চা-টা একটু বেশী খাই।'

হাসতে হাসতে ও চলে যায়।

প্রথম দু একদিন আমাকে দেখে গোপালের মা ঘোমটাটা সামান্য টেনে দিয়েছে। একটু যেন আড়ষ্ট ভাব। আমাকে এত ভোরে উঠতে দেখে সামান্য অবাক হয়েছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসত মুখ টিপে টিপে। চোখ দুটোতে যেন আরো গভীর কোন কথা উঁকি মেরে চলে যেত। আমি ওর এই হাসির কোন কারণ খুঁজে পেতাম না। আমি এটা বুঝতে পারতাম, আমাকে দেখে ওর চোখ-মুখ যেন খুশিতে আরো ঝকমকে হয়ে উঠত। চোখের তারায় কিসের যেন এক চপলতা ফুটত। মুখের ওপর অন্যরকম এক আভা ছড়িয়ে থাকত। চোখের চাউনিতে কেমন এক মজা, কৌতুক। কাজ করতে করতে বুকের আঁচলটা

হয়ত সামান্য সরে গেছে, কিন্তু সেদিকে ওর কোন খেয়াল নেই। নিচু হয়ে উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে আমাকে আড়চোখে দেখত, হাসত। প্রথম দিকে আমারই কেমন লজ্জা করত। শাড়িটা কখনো ও শরীরের সঙ্গে শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়েছে। আবার কখনো কেমন ঢিলেঢালা, অগোছাল। আমার সামনে এজন্যে যেন ওর কোনরকম সঙ্কোচ নেই। অপরিচয়ের বাধাটা ও এমনি করেই যেন কখন সরিয়ে ফেলেছে। আমি যেন ওদের কাছে কোনকালেই অপরিচিত ছিলাম না। ওরা আমাকে ওদেরই ঘরের একজন করে নিয়েছে। গোপালের মার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ক্রমশই সহজ, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছিল।

আমার যাতে কোনরকম অসুবিধে না হয়, সেজন্যে ওর যেন ভাবনার শেষ নেই। এরকম যত্ন-আত্তি এর আগে আর কেউ কখনো আমাকে করে নি। মাঝে মাঝে আমারই খারাপ লাগে।

গোপালের মা এরমধ্যে একদিন আমাকে হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি অত সকালা উঠ কেনি, আরো দেরি কর্যা উঠতে পার ত?'

আমি ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। পরে হাসি হাসি-মুখ করে বললাম, 'একবার ঘুম ভেঙে গেলে বিছানায় মটকা মেরে পড়ে থকেতে আমার আর ভাল লাগে না।'

গোপালের মাও ঠোঁট কামড়ে কামড়ে হাসছিল। শাড়িটা আরো শক্ত করে আমার সামনেই শরীরে পেঁচিয়ে নিতে নিতে বলল, 'আমাকে ত রাত রইতে উঠতে হয়।'

আমি একগাল হেসে ফেলেছি। আমার দৃষ্টিটা যেন কোন অবাধ্য, দুষ্ট ছেলের মতন ওর গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। ওর সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বললাম, 'আপনিও তো আরো পরে উঠলে পারেন!'

গোপালের মা কি ভেবে খিল খিল করে হেসে উঠল। চোখ গোল গোল করে তাকাল। আমার কথা শুনে ও যেন খুব অবাক

হয়ে গেল। আমার মুখের দিকে অপলকে ও চেয়ে থাকল অল্পক্ষণ। খানিক পরে সরল গলায় ও বলল, 'আমার কি আর তার উপায় আছে! সংসারের কত কাজ বলুন, আমাকে একলা সব করতে হয়, বুঝলেন ত?'

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'এখানে এসে দেখছি, আমারও খুব তাড়াতাড়ি করে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে!'

'নোতন জায়গা বল্যা হয়ত এর্‌কমটা হঠে!'

'এটা অবশ্য একটা কারণ। তবে সকালে উঠলে তো ভালই লাগে।' আমি হেসে ফেললাম।

গোপালের মা কি ভেবে আবার আমার মুখের দিকে অমিমেষ চোখে চেয়ে থাকল একটুক্ষণ। ওর মুখের ওপর আবার সেই হাসি। আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার কোন অসুবিধা হঠে নি ত মাস্টারবাবু?'

'সেরকম বুঝলে নিশ্চয়ই বলব। এজন্যে আপনি এত ব্যস্ত হবেন না তো!' আমিও হাসলাম।

গোপালের মার চোখ দুটো কি গভীর এক আবেশে নরম হয়ে রয়েছে। ওর মধ্যে যেন আরো কিছু আছে। আস্তে আস্তে গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'কইব কিন্তু, কোন লুকিব নি।'

গোপালের মা হঠাৎ যেন কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুহূর্তে ওর মুখ-চোখের রঙ পাল্টে যায়। একটু চকিত, ত্রস্ত ভাব। বাইরের দিকে ঘন ঘন তাকায়। কান খাড়া করে রাখে। কি শোনে, ওই জানে! হঠাৎ যেন ওর খেয়াল হয়, এই সাত-সকালেই এরকম গল্প শুরু হলে আর কোন কাজ হবে না। তাছাড়া অন্য কেউ দেখলে-টেখলেও কিছু ভাবতে পারে! অনেকেই উঁকিঝুঁকি মারে। লাগোয়া আরো অনেক ঘর। আত্মীয় কুটুম্ব। সকলেই কৌতূহলের চোখে আমাকে দেখে। ভোরের কালচে ভাবটা কেটে যাচ্ছে। একজন একজন করে লোক উঠতে শুরু করেছে। গোপালের মা চোখ দুটো ছোট করে মজার ভঙ্গিতে হাসল। তারপর শরীরে একটা

ঢেউ তুলে একটু ছেলেমানুষী গলায় ও বলল 'ওরে বাবা, অখনো আমার কত কাজ পড়্যা আছে। আমি অখন যাই মাস্টারবাবু, পরে আবার গপ্প করব, হ্যাঁ ?' খুশি খুশি পায়ে ও চলে গেল।

গোপালের মা চলে যাবার পরও আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। ওর বলার মধ্যে একধরনের আন্তরিকতা ছিল। ও-ই যখন তখন আমার এখানে আসে। গল্প-টল্প করে। আবার চলে যায়। তবে ওর কথা বলাব মধ্যে অদ্ভূত এক মাদকতা আছে। ও এলে ভাল লাগে। সময়টা কেটে যায়। এরকম না করলে বোধহয় সময় কাটানই আমার কাছে এক সমস্যা হত। গোপালের বাবার সঙ্গে এখন আর বেশী দেখা-টেখা হয় না। ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে। আমি স্কুলে চলে আসার আগে একটু-আধটু যা দেখা হয়। তখন কটা আর কথা হয় ! সকালে ঘণ্টা দুয়েক পড়াবার পর গোপাল চলে যায়। রাত্রেও ঘণ্টা দুয়েক। তারপরই খেয়ে-দেয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে। আমার আর সময় কাটে না তখন। গোপালের মা সেটা বুঝতে পারে। আস্তে আস্তে ঘরে আসে। চোখে-মুখে নানারকম ভাবনার কাটাকুটি দাগ। হাসি যেন উপচে পড়ে। অনেক রকমের গল্প হয়। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় ! শুধু কি আমারই নিঃসঙ্গতা ? গোপালের মাও যেন আমাকে পেয়ে খুশি হয়েছে। ওরও কথা বলার মানুষ কোথায় ! কথা যেন আর শেষ হয় না। হাসি-ঠাট্টাও চলে। আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও ওর দুর্ভাবনা যায় না। মাঝে মাঝে পুকুরের মাছ তো আছেই, মাছ না হলে ডিম বা মুরগীর মাংস। স্কুল থেকে আসার পর মুড়ি নারকেল, বা চিড়ে দুধ কলা, বা লুচি, মোহন-ভোগ। দু তিনবার চা। সকালেও মুড়ি, লুচি-টুচি। একেক বেলা একেক রকম। অতি আপ্যায়নে প্রথম দিকে আমার খুব লজ্জা করত। এখন আমি ওকে ফিরিয়ে দিই, রাগ করে বলি, 'এরকম করলে কিন্তু আমি এখান থেকে চলে যাব।'

গোপালের মা উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকাত। একটু ঘাবড়ে গিয়ে ও বিমর্ষ গলায় জিজ্ঞেস করত, 'কেনি কও ত। আমি কি দোষ করচি ?'

আমি কপট গাম্ভীর্য নিয়ে বলেছি, 'হ্যাঁ, ভীষণ দোষ করেছেন।'

গোপালের মার মুখ কিরকম ফ্যাকাসে, বিবর্ণ হয়ে যায়। ও কেমন অপরাধীর চোখে চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে।

আমি এবার জোরে জোরে হেসে ফেলেছি। হাসতে হাসতে বলেছি, 'আমি তো বলেছি আমার জন্যে এত ব্যস্ত হবেন না। যখন যা দরকার হয় চেয়ে নেব। এসব দেখে মনে হয় আমি যেন এখানে এক মহামান্য অতিথি।'

গোপালের মা এতক্ষণে টের পেয়েছে। খিল খিল করে হেসে বলেছে, 'সে ত একশবার।'

গোপালের মার সঙ্গে এরকম করেই দিন দিন আমার মাখামাখি বাড়ছিল। ওর সঙ্গে মিশে আমি এটুকু বুঝেছি, ওর মধ্যে এক অকপট সরলতা আছে। মনটা খুবই নরম। সহজেই আপন করে নিতে পারে। ও আমার জামা কাপড়গুলো পর্যন্ত কেচে দেয়। আমি বারণ করেছিলাম। শোনে নি। বরং আমার ওপর কপট রাগ করে বলেছে, 'এগুলা ত আমান্‌কের কাজ। আপনাকে আর সে লিয়া ভাবতে হবে নি।' ওর চোখে-মুখে চাপা কৌতুক।

আমি আমতা আমতা করে বলেছি, 'গেঞ্জীটা আমি নিজে কেচে নিই!'

'না না, কইলি ত আপনাকে কোন কাচতে হবে নি।' একটু চুপ করে থেকে ও আবার হাসতে হাসতে চোখ নাচিয়ে বলেছে, 'কাই, আপনি ত অখনো আমান্‌কে নিজের লোক বল্যা ভাবতে পার নি! খালি ত মুখে কও যা।'

আমিও হালকা, মজা করে বলেছি, 'ওরে বাপ্‌স, এরপর আর না ভেবে কোন উপায় আছে নাকি!'

'হ্যাঁ, মনে থায় যেন এরপর আর কখনো এর্‌কম কথা কইবু নি!' চোখ টান টান করে হাসল।

আমি ঘরে ফেরার আগেই ঘরদোর পরিষ্কার, ঝকঝকে। আমার বিছানাটাও সুন্দর করে পেতে রাখে। টেবিলের ওপর সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। ঘরের মধ্যে যেন এক স্নিগ্ধ মাধুর্য সারাক্ষণ বিরাজ করছে। চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মনটা কি এক তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। মাটির ঘরেরও যে এক মন হরণ-করা রূপ আছে, তা এই প্রথম টের পেলাম। সব ক্লান্তি যেন দূরে চলে যায়। টেবিলের ওপর একগ্লাস জলও ঢাকা দিয়ে রাখে গোপালের মা! ও যেন আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে গেছে। আজকাল মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি, এ সবই কি নিছক কর্তব্যের খাতিরে করা! মাঝে মাঝে ওর কথা ভাবতে ভাবতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। মনে মনে অনেক সময় ওর কাজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসেব করতে গিয়ে দেখেছি, আমার হিসেব ঠিক মিলছে না। কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। আমার বুকের ভেতরটা থেকে থেকে কেন যেন ভারী হয়ে ওঠে। নিজের ছায়া দেখে নিজেই আঁতকে উঠি। আমি কি আরো কোন ভাবনায় জড়িয়ে পড়ছি? ঠিক বুঝতে পারি না। গোপালের মাও কিরকম এক চোখ করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। হাসতে হাসতে হঠাৎ করে ওর মুখের ওপর থেকে হাসিটা মিলিয়ে যায়। ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ওর চোখ দুটো গভীর এক আবেগে খালি জড়িয়ে জড়িয়ে আসে। কেমন ঢুলুঢুলু, ঝিমঝিম ভাব। আমি তখন ওর সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না। আমারও বুকের তলায় মৃদু কাঁপুনি। গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চায় না। ভীষণ এক তেষ্টা পায়। কিছুক্ষণ পরই গোপালের মার ঘোর কাটে। খিল খিল করে হেসে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে সব এলোমেলো ভাবনা

ছিঁড়ে-ছুঁড়ে যায়। মনের অন্ধকারটাও যেন তখন কোথায় উধাও। আমারও আর কোন অস্বস্তি থাকে না।

এর ভেতরেই একদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

গোপাল পড়া-টড়া শেষ করে উঠে পড়েছে। রাত তখনো তেমন কিছু নয়। আটটা সাড়ে-আটটা বাজে। ও খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমারও মন মেজাজটা ভাল ছিল না। বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। কদিন ধরে কোন চিঠিপত্তর পাচ্ছি না। কলকাতা যেন এখন আমার কাছে এক স্মৃতির ব্যাপার। লণ্ঠনের আলোটা সামান্য কমিয়ে দিয়ে একটু অলস মেজাজে শুয়ে পড়লাম। খুট করে একটা শব্দ হল। গোপালের মা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল। অলোটা বাড়াবার জন্যে উঠে বসলাম। মনে মনে ওর কথাই যেন ভাবছিলাম। ওকে দেখে খুশিই হলাম একটু।

গোপালের মা মিটি মিটি হাসছিল, বলল, 'থাউ না, ওর্‌কম ত ভাল লাগচে।'

আমি হাতটা আবার সরিয়ে নিলাম। ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসলাম।

আবছা আলোয় ওকে যেন একটু অন্যরকম দেখাচ্ছিল। প্রথমটায় আমি ঠিক ধরতে পারি নি। আসলে ও আজ সামান্য সাজ-গোজ করেছে। সাজলে-টাজলে যেন ওকে আরো ভাল দেখায়। ওর মুখ-চোখের গড়নে আলাদা এক শ্রী আছে। তার ওপর স্বাস্থ্যও ভাল। ও আজ জংলা ধরনের একটা ছাপার শাড়ি পরেছে। উঁচু করে খোঁপা করেছে। একটু লম্বা গলা। চোখে কাজল। কপালে বড় এক সিঁদুরের টিপ। মুখে স্নো মেখেছে। তার গন্ধ এসে নাকে লাগছে। আমি মুখ টিপে হাসছিলাম।

গোপালের মা দাঁড়িয়ে পড়েছে। দরজার কাছে বাঁশের খুঁটিটায় হেলান দিয়ে গালে একটা হাত রেখে মুচকি মুচকি হেসে ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনি হাসঠ যে মাস্টারবাবু!'

'এমনি।' আমার চোখে-মুখে তখনো হালকা হাসি।

গোপালের মা মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলল, 'আমি জানি, কেনি হাসঠ।'

'কেন বলুন তো?'

গোপালের মার চোখে কৌতুক। চপল হাসিতে যেন ও ফেটে পড়ল, 'আমি আইজ একটু বেশভূষা হইচি, তারু তরে, ঠিক কিনা কও দেখি?' ও চোখে চোখে চেয়ে থাকে।

আমি বললাম, 'মাঝে-সাঝে এরকম সাজলেই তো পারেন।'

গোপালের মা চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। দেখতে দেখতে চোখ দুটো যেন কেমন বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। বুকের ভেতরে কি এক যন্ত্রণা গুমরে মরে। চোখের দৃষ্টি আনত। আমিও সামান্য অপ্রস্তুত। আমার এই কথা শুনেই ও কিরকম হয়ে গেল। আমি না জেনেই যেন ওকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। আমাকে মনমরা দেখে গোপালের মা আবার হাসল। হাসিটা ম্লান, শুকনো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেমন দুঃখীর মতন আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকল একটুক্ষণ। পরে বিমর্ষ গলায় বলল, 'আগে আগে ওর্‌কম অনেক সাজতাম মাস্টারবাবু, তখন অনেক শখ থাইল। অখন আর সাজি-টাজি না। ইচ্ছা করে নি। মেলা দিন পরে এই আইজ একটু সাজতে ইচ্ছা হইল।'

'ভাল করেছেন, কেন সাজবেন না! মেয়েদের একটু না সাজলে-টাজলে ভাল লাগে না।'

গোপালের মা এগিয়ে এল। একটা মোড়া টেনে নিয়ে আমার সামনে বসল। মুখের ওপর থেকে বিষণ্ণতার ছায়াটা সরে গেছে। আবার চোখ-মুখ হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ও ভাবল। ওর চোখের মধ্যে এক আবেশ গাঢ় হয়। আস্তে আস্তে ও বলে, 'আজকাল আপনার ভিত্‌রে যেন কি একটা হইচে।'

'কি করে বুঝলেন ?'

'আমি সব বুঝতে পারি মাস্টারবাবু!' ওর গলায় এক ছেলে-মানুষী হালকা ঢঙ।

আমি চুপ করে থাকি কিছুক্ষণ। গোপলের মার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ও ঠিকই ধরেছে। আজ কদিন ধরে আমার মধ্যেও নানারকম চিন্তা এসে ভর করছে। বাড়ির কোন খবর নেই। নানা কারণে উদ্বিগ্ন। স্কুলের মধ্যেও ভুল বোঝাবুঝি বেড়েছে।

গোপালের মা ঘাড়টা সামান্য কাত করে একটু চোরা ভঙ্গিতে আমাকে দেখছিল। ওর চোখের ভেতরে আবার যেন কি উঁকি মারে। ঠোঁটটা কি ভেবে মাঝে মাঝে কামড়ে ধরছে। ও কি একটা যেন বলতে চায়। বলতে গিয়েও কথাটা আটকে যাচ্ছে। বলতে পারছে না! একটু যেন দ্বিধা। অথচ না বলেও যেন থাকা যাবে না। ভেতরে ভেতরে কৌতূহলটা ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বের করে না দিলে ছটফটানিটা কমবে না। চোখের ঠাট ঠমকই আলাদা। দৃষ্টি আনত। চোখের পাতা কাঁপছে। আস্তে আস্তে খানিকটা চোখ তুলে ও তাকাল। অনেকটা আধবোজা ভঙ্গিতে ও বলল, 'গটে কথা জিগ্‌সিব মাস্টারবাবু?'

'হুঁ—।' আমি তখনো ওর মুখের দিকে চেয়ে আছি।

আস্তে আস্তে মুখটা ও আরো অনেকখানি তুলল। আমার মুখের ওপর ওর দৃষ্টি স্থির, অপলক। আমার চোখেও বুঝি তখন কিছু অনুচ্চারিত কথা ফুটে উঠেছে। ও মজা করে চোখের বিশেষ এক ভঙ্গি করল। ওর এরকমভাবে তাকান, কথা-বলা আমাকে যেন একটু একটু করে কিরকম অবশ করে দিচ্ছিল। বুকের ভেতরে যেন কিরকম শব্দ। কিছু হাওয়া যেন আটকে গিয়ে ছটফট করছে। বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ওর চোখ-মুখ নানা কারুকাজে যেন ভরে ওঠে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। আবার তা

মিলিয়ে যায়! ওর চোখে-মুখে তুর্নিবার এক রহস্য খেলা করে বেড়ায়। আমি মুগ্ধ, বিস্মিত, খানিকটা অভিভূতের মতন সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকি। আমার গলাটা যেন আঠা আঠা লাগে। কি ভেবে হঠাৎ ও খিল খিল করে হেসে উঠে। চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে একটু রঙ্গ করা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'ঘরে কি আপনার বউ আছে মাস্টারবাবু?' ও গালে একটা হাত রেখে ঠোঁট কামড়ে কামড়ে হাসছিল। ওকে যেন আজ অন্য কিছু একটা ভর করেছে।

আমিও ওর কথা শুনে হেসে উঠলাম। হাসতে হাসতে বললাম, 'আমাদের ওখানে এত তাড়াতাড়ি কারো বিয়ে হয় না গোপালের মা!'

গোপালের মা অবাক হওয়ার ভান করে। আবার খুশি খুশি মেজাজ। একটা ঢোক গিলে কি ভেবে হাসতে হাসতে ও বলল, 'আমাকে আর আপনি গোপালের মা বল্যা ডাকব নি ত মাস্টারবাবু!' ও চোখ সরিয়ে নেয়। ওর গলায় অন্য এক আবদার। লুকিয়ে লুকিয়ে হাসছিল।

আমি চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। আজ যেন ওর কথা-টথা-গুলো কেমন হেঁয়ালির মতন মনে হচ্ছিল। কিছু একটা ওর হয়েছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। অথচ ওর মুখের ওপর থেকেও আমার চোখ সরিয়ে আনতে পারছি না। ওর চোখে-মুখে এক আবেশ আবেশ ভাব। কিসের এক উত্তাপে মাখামাখি। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'কি, চুপ কর‍্যা রইল যে মাস্টারবাবু?'

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'তাহলে কি বলে ডাকব, বলে দিন।'

'ওসব আপনি-টাপনি কইব নি আর আমাকে!' বলে আবার খিল খিল হাসি। পরে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। সামান্য অন্যমনস্ক হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে ও বলে, 'আমার গটে নাম আছে মাস্টারবাবু, টগর নামটা কি

খুব খারাপ ? আপনি আমাকে টগর বল্যা ডাকব।' ওর চোখে যেন তখন অন্যরকম এক মায়া ছড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে ও চোখ পিট পিট করে আমার দিকে তাকাল একবার। হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি মাস্টারবাবু, আমার কথা শুন্যা রাগ করল নি ত ?' শাড়ির আঁচলটা ও বারবার আঙুলে জড়াচ্ছে আর খুলছে। মুখের ওপর পরিহাস করার এক অবাধ্য লোভ। ঠোঁটের কোণে পাতলা একটু হাসি। কি এক মজার খেলায় যেন ও মেতে উঠতে চাইছে। কথা বলার মধ্যে নানা রঙ্গ, চটুলতা! চোখে নানারকম মনোহর ভঙ্গি, ভ্রূবিলাস। ওর বয়েসটা যেন অনেক কমে গেছে। কিশোরী মেয়ের মত হাবভাব।

আমার ভালই লাগছিল। মাথা ঝাঁকিয়ে সহাস্যে বলি, 'না না, রাগ করব কেন!'

টগর চোখ টান টান করল। হাসল শব্দ করে। যেন ফুলঝুরির কতগুলো ফুলকি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরে সরস ভঙ্গিতে আগের কথার জের টেনে বলল, 'আমি আরো ভাবচি, ঘরে বউ-টউ আছে, বউয়ের তরে মন খারাপ কর‍্যা আছ! আইজ কদিন ধর‍্যা আমি এটা দেখিঠি। ওমা, অখন দেখিঠি ব্যা কর নি।' আবার ও হাসতে হাসতে ঢলে ঢলে পড়ে।

ওর কথা শুনে আমারও হাসি পায়। একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, 'ওই একজন ছাড়া ঘরে আর সবাই আছে। মা, বাবা, ভাই বোন সব।'

টগরের চোখে তখনও ঠাট্টা করার নেশা, গলায় কৌতুক। গালে একটা আঙুল রেখে অবাক হওয়ার ভান করে ও বলল, 'অখনো ব্যা না কর‍্যা কির্‌কম আছ মাস্টারবাবু!' ওর চোখের ভেতরে রহস্যটা যেন আরো ঘন হয়। ও একপলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। কি ভেবে আবার ধীরে ধীরে বলল, 'আমান্‌কের এঠি খুব আগু আগু ব্যা হয়্যা যায়।'

আমি হাসলাম, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে টগর একসময় জিজ্ঞেস করল, 'তবে আর ওর্‌কম মন খারাপ কর‍্যা থাউ কেন?'

আমার মুখের ওপর আবার যেন দুশ্চিন্তার এক ছায়া নেমে এসেছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'তুমি ঠিকই ধরেছ টগর, আজ কদিন ধরে মনটা আমার ভাল নেই।'

'তাইলে বুঝচ ত মাস্টারবাবু, আমার চোখে ফাঁকি দেওয়া যায় না!'

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সামান্য উৎকণ্ঠার গলায় বললাম, 'বাড়ির জন্যে আমার না খুব ভাবনা হচ্ছে টগর।'

'কেনি?' এবার আর ও হাসে না। ও যেন আমার যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছে অল্প অল্প।

আমি বিষণ্ণ গলায় বললাম, 'মার শরীরটা খুব ভাল নয় টগর। নানারকম অসুখ-বিসুখে ভুগছে। যখন তখন মরে যেতে পারে। কদিন ধরে কোন চিঠিও পাই না!' বলতে বলতে আমার গলাটা কেমন ধরে এল। চোখে-মুখে এক অস্থির যন্ত্রণা।

টগর অবাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ওর মুখ-চোখও মুহূর্তে আবার অন্যরকম হয়ে গেল। মুখখানা গভীর মমতা ও সহানুভূতিতে ভরে উঠল। খানিকক্ষণ পরে একান্ত প্রিয়জনের মতন করে ও বলল, 'তাইলে ত মন খারাপ হবেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল। আরো কি যেন ভাবল গভীরভাবে। পরে আবার চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল 'কলকাতা এঠি নু অনেক দূর, তাই না মাস্টারবাবু?'

'হ্যাঁ, দূর তো বটেই। তবে একদিনেই যাওয়া যায়।'

টগরের মুখে যেন খানিকটা হাসি ফোটে। উৎসাহের গলায় ও বলল, 'আপনি তাইলে একবার কলকাতা নু ঘুর‍্যা আইস না!'

'দেখি কি করি।'

টগর বলল, 'আমি না কারো কালো মুখ দেখতে পারি নি মাস্টারবাবু। ওরকম দেখলে আমারও খুব কষ্ট হয়।' ওর গলায় এক আন্তরিকতা ছিল।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। কথাটা ও মিথ্যে বলে নি। ওর চোখেও এক বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে। আমার বেদনা যেন ওকেও স্পর্শ করেছে। একজন আরেক জনের দুঃখ যে কত সহজে ভাগ করে নিতে পারে, এ যেন আমার জানা ছিল না। আমি তো দেখেছি! আমার দুঃখ অনেকখানি ভাগ করে নেবে বলে একদিন যাকে বিশ্বাস করতাম, সেই আমাকে আরো দুঃখ দিয়ে চলে গেল! একবারও আমার মনটা বোঝবার চেষ্টা করল না! এই নিষ্ঠুর সত্যটা মেনে নিতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। এখনো এসব কথা মনে হলে আমার বুক ভারী হয়ে ওঠে। ঘুমোতে পারি না! বুকের ভেতরটা জ্বলে-পুড়ে যায়। টগরের সঙ্গে আমার কদিনেরই বা পরিচয়! কিন্তু ওর এই মমতা, প্রীতির মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। মনে হয়, ওদের সঙ্গে যেন আমার অনেককালের আত্মীয়তা। সংসারটা বোধহয় এরকমই। অঙ্কের নিয়মে জীবনটা ঠিক মেলান যায় না। জীবন জীবনই। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

টগর আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে হালকা গলায় হেসে উঠল। পরিবেশটা যেন ভারী হয়ে উঠছিল। হাসতে হাসতে ও বলল, 'আমার না সহরটা একবার খুব দেখতে ইচ্ছা করে!'

আমিও ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসলাম সামান্য, বললাম, 'একবার গেলেই হয়।'

'কে আর আমাকে লিয়াবে মাস্টারবাবু?'

'আমার সঙ্গে চল!'

ও চেয়ে থাকে আমার চোখে চোখে। কথাটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। পরে হেসে হেসে বলল, 'আমার কায়ও আর

যাওয়ার উপায় নেই মাস্টারবাবু। এই ঘরদোর কার ওপর ফেলি দিয়া যাব।'

'কেন, গোপালের বাবা দেখবে।' আমি মুখ টিপে টিপে হাসছিলাম।

'তাইলে লোক চিনচ খুব।' চোখ মটকে হাসল ও।

'কি ব্যাপার বল তো, ওর সঙ্গে তো দেখাই হয় না, কোথায় থাকে?'

টগরের চোখে রহস্য, টেনে টেনে একটু গভীর গলায় ও বলে, 'যেঠি থাকার সেঠি থায়। কি যে পাপ করচি মাস্টারবাবু। আমার এই জীবনটা শেষ হয়্যা গেল।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

কুড়ি

আমার কেন যেন আগেও মনে হয়েছিল, টগরের এই হাসি-খুশির চেহারাটাই সব নয়। এর আড়ালে ওর একটা দুঃখী মন আছে। সংসারের সাত কাজের মধ্যে এভাবে নিজেকে যে ও ব্যস্ত রাখে, তার অন্য একটা কারণও আছে। আসলে, এরকম করেই ও সেই মনটাকে ভুলিয়ে রাখে। অনেক চেষ্টা করেও সব সময় তা আর পারে না। বুকের ভেতরটা ছটফট করে। একধরনের অস্থিরতা ওর ওপর ভর করে। তখন যেন ও কিরকম হয়ে যায়। কারো জন্যেই ওর তখন কিছু করতে ইচ্ছে করে না। এক উদাস-উদাস ভাব। নিজের ব্যাপারেও ওর এক বৈরাগ্য। উন্মনা ভঙ্গিতে বসে থেকে ও কত কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবে। পিঠময় ছড়ানো চুল। খোঁপাটা বাঁধতেও যেন ওর ভীষণ কষ্ট। বুক থেকে আঁচল সরে গেলেও কোন খেয়াল থাকে না। আশপাশের দিকে যেন কোন নজরই নেই। ঠিক মতন খায়-টায়ও না। চান-টানের কোন সময়-গময় থাকে না। এরকম অবস্থায় ওর দু তিন দিন কেটে যায়। কেমন এক আচ্ছন্ন, ঘোর-লাগা চেহারা। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যায়। তখন ও যেন আরো বিব্রত, সঙ্কোচ বোধ করে। সলজ্জ, কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে একসময় ও বলে, 'ছি ছি, আপনার খাওয়া-দাওয়ার ত খুব কষ্ট হইচে মাস্টারবাবু।' ও যেন ভীষণ এক অপরাধ করে ফেলেছে এমন এক নম্র, অনুতপ্ত ভঙ্গি।

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে স্বস্তি বোধ করেছি। যাক, ওর ঘোর যে কেটেছে এই ঢের। আবার আগের মতনই ও সুস্থ,

স্বাভাবিক। আবার হাসি-খুশি, ঝলমলে। মৃদু হেসে বলি, 'আমার চেয়ে তো তোমারই বেশী কষ্ট হয়েছে টগর।' আমার গলায় আন্তরিকতা ও সমবেদনা ছিল। ওর এই তাড়াতাড়ি সেরে ওঠায় আমিও খুব খুশি। দৃষ্টি সরিয়ে নিই।

টগর হালকা গলায় হাসে। হাসতে হাসতে ও বলে, 'ও কোন নয় মাস্টারবাবু! মাঝে মাঝে আমার এর্‌কম হয়। মনটা হঠাৎ কির্‌কম আউলা-ঝাউলা হয়্যা যায়। কোনমতে মনটাকে তখন ঠিক রাখতে পারি নি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নরম, অন্তরঙ্গ গলায় শুধোই, 'তখন বুঝি কাউকে আর চিনতে পার না, না?'

টগরও তাকায়। ওর সঙ্কোচ যেন এতে আরো বাড়ে। জিভ কামড়ে সেই লজ্জা ঢাকতে চায় যেন। বুকের ভেতরটা আবার যেন ভার ভার লাগে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। পরে আস্তে আস্তে ও বলে, 'চিনতে পারব নি কেনি মাস্টারবাবু! চিনতে ঠিকই পারি। তখন আমার মাথাটা যে কির্‌কম হয়্যা যায়, আমিও ঠিক বুঝতে পারি-নি। বুকের ভিত্‌রে খুব এক ব্যথা। ফোড়া-টোড়া পাকলি যের্‌কম টনটন করে, সোর্‌কম এক কষ্ট। কোন ভাল লাগে নি।'

আমি হাসি হাসি মুখে বলেছি, 'এটা কিন্তু ভাল কথা নয় টগর। এর থেকেই একদিন কঠিন কোন রোগ-টোগ হয়ে যেতে পারে।'

কির্‌কম হয় মাস্টারবাবু?' ও চোখ টান টান করে তাকায়। মুখের ওপর এক সারল্য।

'তা আমি জানি না, তবে খারাপই হয়।'

মুহূর্তে ওর মুখখানা মলিন দেখায়। ওর বুকের গভীর থেকে বুঝি আবার কোন যন্ত্রণা উঠে আসে। একটা দীর্ঘশ্বস ফেলে

সামান্য আর্ত গলায় ও বলে, 'তাইলে ত বাঁচ্যা যাই মাস্টারবাবু। জানেন, আমার না আর বাঁচতে ইচ্ছা করে নি।' ওর চোখ দুটো গভীর এক বেদনায় ভিজে রয়েছে। ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। ভীষণ এক কষ্ট ও প্রাণপণে গোপন করার চেষ্টা করছে, পারছে না।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কি বলব ঠিক বুঝতে পারি না। আমি তো আর ওর সব খবর জানি না! আমার মনে হল, এগুলো নিয়ে আর বেশী টানাটানি করা ঠিক নয়। এসব নিয়ে বেশী ভাবলেই, আরো মন খারাপ হবে, আরো ভেঙে পড়বে। ওর যেন কি একটা হয়েছে। আমি হাসিমুখে বলেছি, 'এসব কথা তুমি আর কখনো বলবে না তো। এসব চিন্তা মনে আনাও পাপ।'

টগর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, 'আপনি ত আর আমার সব কথা জান নি!'

আমি চুপ করে থাকি। এসব কথা থেকেই বোঝা যায়, ওর ভেতরে গভীর এক কষ্ট আছে। কিন্তু কেন ওর এই কষ্ট, আর কষ্টটাই বা কি, তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। ও আমাকে কিছু বলে নি। আমিও তা কখনো জানতে চাই নি। কারণ, এসব ব্যাপারে, আমার কোন উৎসাহ বা কৌতূহল থাকা উচিত নয়। তবে আভাসে ইঙ্গিতে এটুকু বুঝতে পেরেছি, ওর মধ্যে গভীর এক দুঃখ লুকনো আছে। কোন কোন অগোছাল মুহূর্তে তা বেরিয়ে আসে।

কথায় কথায় ওকে আমি একদিন বলেছিলাম, 'তুমি তো লেখা-পড়া জান টগর, কিছু গল্পের বই-টইও তো পড়লে পার। দেখবে মন-টনটা অনেক ভাল হয়ে গেছে।'

টগর আমার কথা শুনে চমকে উঠেছিল। ওর চোখ দুটো বিস্ময়ে, পুলকে যেন চক চক করছিল। পরে টেনে টেনে বলেছিল, 'আপনি জানল কি কর‍্যা যে আমি লেখাপড়া জানি!'

আমার মুখে হাসি। বলেছি, 'আমি সব শুনেছি।'

টগর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ওর বুকের ভেতরটা যেন কিরকম একটু তোলপাড় করছিল। হঠাৎ একরাশ আবেগ এসে ওর চোখ-মুখ ঢেকে ফেলেছিল। কিছুক্ষণ পরে আবার ও বলেছিল, 'একে লেখাপড়া জানা বলে না মাস্টারবাবু! ক্লাস নাইন-এ ত উঠেছিলাম। আর পড়লি কাই! আমার খুব শখ থাইল। তা আর হইল নি।' ওর মুখের ওপর একধরনের দুঃখ ফুটে ওঠে।

আমি বললাম, 'তার জন্যে এখন তো আর মন খারাপ করে লাভ নেই!'

টগর বিমর্ষ স্বরে বলল, 'জান মাস্টারবাবু, পড়াশুনায় আমি খুব খারাপ ছিলাম না। হাজিপুরে পড়তি, হোস্টেলে থাইতি, এক ছুটিতে ঘর আইলি। ব্যাস, আমার ব্যা দিয়া দিল। বাপ-মা মনে বরের স্বভাব-চরিত্র কিছু জানল নি। কেবল বরের বাপের ঘরের জমি জায়গা দেখচে! এন্নে আমাকে সক্কলে শেষ করা। ফেলিচে মাস্টারবাবু।' ওর গলা ধরে আসে। চোখ ছল ছল করে।

বুঝতে পারি, এরকম আশা-ভঙ্গের জন্যে ওর এখনো এক খেদ আছে। কিন্তু এতদিনে তো এসব ওর ভুলে যাওয়ার কথা! অথচ আজো টগর পুরনো দিনের কথা ভুলতে পারে না। থেকে থেকে মনে পড়ে যায়। আমার কিরকম যেন খটকা লাগে। অনেক সময় ভেবেছি, এটাই কি ওর মনোবেদনার একমাত্র কারণ? আমার তা মনে হয় না। পড়াশুনো তো এখানে অনেকেই করতে পারে নি! পারেও না করতে। বিশেষ করে মেয়েদের লেখাপড়াটা তো এখানে সবে শুরু হল। তাছাড়া সংসারের সুখ শান্তি তো আর শুধু এর ওপরই নির্ভর করে না! বরং টগরদের অবস্থা খুবই ভাল। আর্থিক সচ্ছলতা অনেক বেশী। খাওয়া পরার সুখ থাকলে আর চাই কি! সেদিক থেকে টগরের কোন অভাব নেই। এই প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও ওর মনে সুখ নেই। ওকে মাঝে মাঝে বড় দুঃখী মনে হয়। নিশ্চয়ই, ওর মনের কোথাও বড় রকমের একটা ফাঁক আছে। ওর

এই শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলতে পারত ওর স্বামী। অথচ এখানেই একধরনের উপেক্ষা, অবহেলা। এদিকে গোপালের বাবার কেমন এক নিরাসক্ত ভাব। মাঝে মাঝে গোপালের বাবার প্রসঙ্গ এলে, আমি লক্ষ্য করেছি, টগর যেন কেমন বিরক্ত হয়। স্বামীর ওপর ঠিক প্রসন্ন নয় ও। আমার মনে হয়েছে, ওর এই মনোবিকারের পেছনে দীনুর ভূমিকা অনেকখানি। বোধহয় সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এ নিয়ে টগর কোনদিন সরাসরি আমার কাছে কোন অভিযোগ করে নি। একদিন নিজের চোখেই তা দেখলাম।

রাত তখন কত জানি না। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। খুব কাছেই গোঙানির একটা শব্দ। কান খাড়া করে রাখলাম। গলাটা টগরের মনে হল। আমি তাড়াতাড়ি করে উঠে বসলাম। বাইরে বেশ একটা হইচই হচ্ছে। আমি বেরিয়ে এসে তো রীতিমতন চমকে উঠলাম। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না।

দীনু নেশা করেছে। ওকে ভীষণ ক্ষিপ্ত, উন্মত্তের মতন দেখাচ্ছে। ওর পা টলছে। ঠিক মতন দাঁড়াতে পারছে না। মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে। ওর হাতে মোটা একটা কাঠের চেলা। ও হাঁপাচ্ছে। ওর চোখ-মুখ হিংস্রতায় ভরে আছে। ও টলতে টলতে আবার ক পা এগিয়ে এল। তারপর চেলা-কাঠের টুকরোটা দিয়ে টগরের গায়ে এলোপাথাড়ি কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'এই শালী, চুপ করা্যা আছু? কেন তোর কাছে নিকুঞ্জ লুইয়ের বেটা অত ঘচ ঘচ আইসে। ও কি তোর পিরীতের কুটুম সাজচে রে! রসে যে গতরখান বড় ডগ্‌মগ্‌ করে।'

টগরের কপাল বেয়ে তখন রক্ত পড়ছে। ও মার খেয়েও গলা দিয়ে জোরে শব্দ করছে না। শুধু গোঙানির মতন অস্ফুট এক যন্ত্রণা। ওর চোখ-মুখে এক জেদ। ঠোঁটটা থেকে থেকে কামড়ে ধরছে।

দীনু আবার ওর চুলের মুঠি ধরে ঠেলে ফেলে দিল, 'আমি শালা

বুঝি টের পাই না কোন। খুব মজা পাইচ, না রে ঢেমনা মাগী!'

টগর পড়ে গেল মাটিতে। উঠে বসল। বিড় বিড় করে শুধু বলল, 'মার, আরো মার, মার্‌য়া মার্‌য়া শেষ কর্‌য়া ফেল।'

দীনুর জেদ আরো বাড়ছিল। টলতে টলতে আবার অসহিষ্ণু, উত্তেজিত গলায় ও বলল, 'কি রে মাগী, খুব যে তোর সাহস বাড়িচে দেখিঠি, হুঁ?'

টগর নিরুত্তর। ওর চোখে-মুখে নিদারুণ এক তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ফুটে আছে। ওর এই অনমনীয় অবজ্ঞার ভঙ্গি দীনুকে আরো ক্ষিপ্ত করে তুলছিল।

আমিও প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারি নি। একটা জোয়ান ছেলেকে মাঝে মাঝে অবশ্য এখানে আসতে দেখেছি। অনেকেই তো এখানে আসে। গল্প-টল্প করে। আবার চলে যায়। পাড়া-পড়শীর সঙ্গে তো কত রকমের সম্পর্কই থাকে! ওই ছেলেটাও মাঝে মাঝে এসে টগরের সঙ্গে গল্প-টল্প করে চলে যেত। এতে যে গর্হিত কিছু থাকতে পারে, আমার তা ধারণা ছিল না। এখনো আমার বিশ্বাস হল না। আমার সঙ্গেও তো ওর অনেক গল্প-টল্প হয়। হাসাহাসি। কত রকমের ঠাট্টা! নিশ্চয়ই দীনুর মগজে কোন দুষ্ট লোক এটা আরো পল্লবিত করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। নেশার ঘোরে ওই একটা চিন্তাই ওর মাথায় পাক খাচ্ছে। এটাই ওকে তাতিয়ে রাখছে। তা না হলে রাতদুপুরে এভাবে গরু পেটানোর মতন কেউ কাউকে পেটাতে পারে!

টগর টেনে টেনে বলল, 'সাহসের আর দেখচটা কি, আরো দিনকে দিন দেখব।'

'সাহসটা তোর বাড়্‌কি দেইঠি রে শালী।' বলেই ও চুলের মুঠি ধরে টানল। খামচি দিল শরীরে। রাগে যেন দীনুর শরীর টগবগ করছে। মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'অখনো কইলু নি ওর সাথে এত ঢলানি কেনি?'

টগরের চোখে যেন আগুন ঝরে। আর বুঝি সইতে পারে না। কুপিত ভঙ্গিতে ও বলল, 'তুমি যখন অন্য জায়গায় চল, তার বেলায়?'

'শালীর বিটি শালী, আমি যেখানে খুশি গেলি, যার সাথে ভালবাসা করলি, তোর কি রে! তুই খাওয়ার মালিক খাবু, পরার মালিক পরবু, তোর অত চিড়চিড়ানি কিসের রে মাগী! যদি বেশী বাড়াবাড়ি করু, শিখ পুড়্যা চালি দিব। তুই আমাকে চিনু নি! শেষে কাট্যা গাঙে ভাসি দিব।'

'যাও না, সেঠি যাও। আইজ বুঝি খেদি দিচে?'

'চোপ শালী চোপ, আবার কথা কয়ঠে ঢেমনা মাগী!'

'কেনি চুপ করব! আমিও চকার কর্যা কর্যা সক্কলকে কইব।' ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'ওরে রে শালী!' বলেই দীনু কাঠের টুকরোটা ওর মাথার ওপর তুলল।

'মাগো আমাকে মার্যা পেকিল গো. ওরে বাবা, কে আছু, ছুট্যা আয় রে।'

দীনু আরো রেগে যায়। দুমদাম ক ঘা বসিয়ে দিল। চুলের মুঠি ধরে টানল। রাগে জ্বলতে জ্বলতে বলল, 'তোর মার নাঙ্‌নন্‌কে আবার ডাকতু, হাঁ!'

টগরের জেদও বাড়ে। মুখ ভেংচিয়ে চড়া গলায় ও বলে, 'বেশ করচি. একশবার ডাকব। সারা জীবনটা তুই আমাকে জ্বালি-পুড়ি মারলু, আইজ আমি গাঁয়ের মোড়লের কাছে তোর সব গুণের কথা কয়্যা দিব।'

'যা যা মাগী, অক্ষুনি কইবু চলি যা। আমার ঢের করবে।' বুড়ো আঙুল দেখায় ওকে। লাথি মারে। কাঠটা ওর মাথায় মারবার জন্যে আবার তুলেছে।

ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি করে আমি ছুটে এলাম। মাতাল তো! এখুনি একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়ে যেত। ওর হাত থেকে কাঠটা

টেনে ফেলে দিলাম। এমনিতেই টগরের কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে। আমি বিরক্ত গলায় বললাম, 'এসব কি হচ্ছে ?'

দীনু হঠাৎ কিরকম জড়সড় হয়ে গেল। জোঁকের মুখে নুন পড়েছে যেন। জড়িয়ে জড়িয়ে ও বলল, 'আপনি এঠি নু চল্যা যাও মাস্টারবাবু, আপনি কেন এঠিকে আইল !'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'যান, অনেক তো হয়েছে, এবার গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ুন ?'

দীনুর মুখের চেহারা এরই মধ্যে বদলে গেল। কথা বলতে জিভ ওর জড়িয়ে যাচ্ছে। ভাল করে তাকাতেও পারছে না। থেমে থেমে বলল, 'আপনি কোন জান নি মাস্টারবাবু, ও শালী বড় বজ্জাত।'

আমি বিরক্ত। সামান্য উত্তপ্ত গলায় বললাম, 'এভাবে পেটালে কি ওর বজ্জাতি কমবে ? আর একটু হলেই তো ওর মাথা ফেটে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হত।'

টগর জলভরা চোখে তাকাল একবার। কপালের রক্ত মুছল। রক্তটা এখন চাপচাপ, জমাট বেঁধে গেছে। জায়গাটা জ্বালা করছিল। ঠোঁট কেটে কেটে ও বলল, 'ধরতে গেলেন কেন মাস্টারবাবু। কাজটা ভাল করেন নি।' গলাটা ধরে এল। ভাঙা ভাঙা শোনায় কথাগুলো। ওর বুক ঠেলে যেন গভীর এক কান্না উঠে আসছিল।

দীনুকে এমনিতে তো খুবই নিরীহ মনে হত আমার। ও যে এমন হিংস্র, বন্য হতে পারে, আমার আদৌ তা ধারণা ছিল না। ওর আজকের এই চেহারা না দেখলে আমি কখনো বিশ্বাস করতে পারতাম না। আমি যে এরমধ্যে এসে পড়ব, ও তা ভাবতে পারে নি। অথবা নেশার ঘোরে আমার কথাটা বোধহয় ও ভুলেই গিয়েছিল। এই জংলা নেশার মধ্যেও আমার এই উপস্থিতি ওকে মুহূর্তে কিরকম যেন দুর্বল, অপ্রস্তুত করে তুলল। নিজের এই ঘৃণ্য অপরাধের কথাটা একেবারে অস্বীকার করতে চাইল ও। জড়িত স্বরে বলল, 'নাঃ,

আমি ওকে পিটি নি মাস্টারবাবু। এই টগর, ক না রে, আমি কি তোকে পিট্‌চি, হ্যাঁ?'

'ঠিক আছে আর চেঁচামেচি নয়, ঘরে চলে যান।'

'আপনি কিছু মনে কর নি ত মাস্টারবাবু?'

'না মনে করি নি। এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

কপা গিয়েই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল দীনু। হাতটা কপালে ঠেকাবার চেষ্টা করছে বারবার। পারছে না। পরে বলল, 'ঠিক কইল ত?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলছি।'

ক পা গিয়ে আবার টলতে টলতে ফিরে এল। আমার পায়ের কাছে হঠাৎ ও বসে পড়ল। ও কেঁদে ফেলল, 'আর এরকম হবে নি মাস্টারবাবু।' তারপর টগরের কাছে এল। ওর একটা হাত টেনে নিয়ে বলল, 'আমি কি তোকে ভালবাসি নি রে টগর, ক, তোর একটু ভালবাসা পাওয়ার তরেই ত আমি এরকম করি। তুই আমাকে আইজ-কাইল বড় ঘেন্না করু রে টগর, ঘেন্না করু। আমি বুঝি রে, সব বুঝি!' কথাগুলো কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে গেল।

আমি বললাম, 'টগর, তুমিই ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। তুমি না গেলে ও যাবে না।'

টগর উঠে দাঁড়াল। ওর একটা হাত ধরে বলল, 'আর ঢঙ করতে হবে নি, এখন ঘরে চল।'

দীনু একেবারে বাধ্য ছেলের মতন ওর সঙ্গে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে থকলাম দাওয়ায়। আকাশে অজস্র নক্ষত্র! আবছা আলো ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। মাঝে মাঝে কুকুরের চিৎকার। একটা পাখি চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল। টগরের জন্যে কেন জানি না আমার এইমুহূর্তে ভীষণ এক কষ্ট হল। দীনুর ওপর কেন যে ও এতটা অপ্রসন্ন এবার আমার কাছে স্পষ্ট হল। এ-জীবন নিয়ে কার আর বাঁচতে এত সাধ হয়। স্তব্ধ, বিষাদ জড়ানো রাত। একটু পরে আমিও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমোতে পারলাম না অনেকক্ষণ। কেন যেন ছটফট করে মরছিলাম!

একুশ

এরপর দুদিন আমি আর ওখানে যাই নি। চোখের সামনে সেই ভয়ঙ্কর ছবিটা থেকে থেকে ভেসে উঠেছে। টগরের ক্লিষ্ট, আহত মুখখানা যখনই মনে পড়েছে, আমার খুব কষ্ট হয়েছে। এমনটা কখনো ভাবতে পারি না আমি। চোখে না দেখলে তো কখনো জানতেও পারতাম না। আজো কি আমাদের সমাজে মেয়েরা শুধুই পুরুষের খামখেয়ালীর পণ্য? ওদের এই অভিশাপের জীবন কি আজো শেষ হল না? এই সামাজিক অন্যায়ের কি অবসান নেই? কোন প্রতিবাদ? আর কতকাল ওরা এই লাঞ্ছনার, নিরুপায় জীবন মুখ বুজে সইবে? মানুষের এই বন্য, হিংস্র স্বভাবের কি কোন পরিবর্তন নেই? এ ধরনের আরো নানারকমের প্রশ্ন আমাকে ভীষণ কষ্ট দিত।

টগরও তো দিনের পর দিন নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে। এখন আমি বুঝতে পারি, কেন মাঝে মাঝে ও অন্যরকম হয়ে যায়! সহ্যেরও একটা সীমা থাকে। মাঝে মাঝে তা ছাড়িয়ে যায়। ওর কথা থেকে কখনো কখনো ভেতরের জ্বালা-যন্ত্রণা, অসন্তোষ বেরিয়ে আসত। কিন্তু তার যে এরকম কদর্য, বন্য চেহারা, তা কখনো বুঝতে পারি নি। এটা না দেখলেই যেন ভাল হত। ওর জন্যে আমারও বুকের ভেতরে কেন যেন এক অবাধ্য যন্ত্রণা। অথচ প্রতিকারের কোন পথ আমার জানা নেই। টগরও জানে না, এর হাত থেকে কিভাবে ওর পরিত্রাণ সম্ভব! এভাবেই ওকে চলতে হবে সারা জীবন। এই ওর ভাগ্য, নিয়তি। মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হবে। নিজের জ্বালায় নিজেই জ্বলবে, তিলে তিলে দগ্ধ হবে, অক্ষম আক্রোশে ছটফট করবে। মাঝে মাঝে ওর স্মৃতির জগতও

তোলপাড়, ঘোলাটে হবে। জটিলতা আরো বাড়বে। আবার একসময় ও নিরাময় হয়ে উঠবে। হাসবে, সংসারের নানা কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেবে। এরই মধ্যে কখনো-সখনো স্বামীর সোহাগে, আদরে একেবারে গলে যাবে। আমি আর কজন টগরকে জানি! এরকম আরো অনেক টগরই তো এখানে আছে। তারা কি আরো অসহায়? আরো অভিশপ্ত? কে জানে!

টগর খানিকটা লেখাপড়া শিখে যেন মস্ত ভুল করে ফেলেছে। হয়ত মনে মনে ও একটা স্বপ্নও তৈরী করে ফেলেছিল। যা ভেবে রেখেছিল, তা আর পূর্ণ হল না। ওর সেই স্বপ্ন যে একদিন শূন্যেই মিলিয়ে গেল! দুঃখটা সেজন্যেই যেন আরো বেশী।

স্কুলের ছুটির পর মহাদেবদা কার্তিকবাবু নির্মলবাবু সঙ্গে গল্প-টল্প করে মনটাকে একটু অন্য ভাবনায় ব্যস্ত রাখার আমি চেষ্টা করেছি। গোবর্ধনের ব্যাপারটা নিয়ে এদিকে জল আরো ঘোলা হয়েছে। থানা-পুলিশ করতে হচ্ছে। সকলের মধ্যেই চাপা উত্তেজনা। পরাণকে দিয়ে, কেষ্টবাবু একটা মামলা ঠুকে দিয়েছেন। ধারাল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ওর ওপর হামলা করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এরই ফাঁকে রসাল গল্পও চলে। আসলে পরাণের বউটাকে এখন কেষ্টবাবু নাকি অনেকটা হাত করে নিয়েছেন। পরাণটা তাড়ি খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যায়। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। ঘন ঘন মামলার দিন পড়ে। ডায়মণ্ডহারবার ছোটাছুটি করতে হয়। এর পেছনেও নাকি কেষ্টবাবুর হাত। অনেক দিন পরাণ ফিরতেও পারে না। কেষ্টবাবুর সেদিন ভারী মজা। ওর বউ ওকে আর আমলই দিতে চায় না। কেষ্টবাবু ওকে তাড়ি খাওয়ার পয়সাটা নিয়মিতই দিয়ে যাচ্ছেন। আর এদিকে মজা লুটছেন।

আজ স্কুলের ছুটির পর দেখি গোপাল মুখটা ভার করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সাহাস্যে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি, এখনও ঘরে যাও নি?'

ও আমার কাছে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মা আপনাকে

আইজ যাইতে কয়া দিচে। আপনাকে নেই লিয়া আইজ আর আমি যাব নি স্যার।'

'তাহলে একটু দাঁড়াও, মহাদেবদার দোকান থেকে কটা বড়ি নিয়ে আসি। শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে।'

ভবর দোকানের চা খেলাম। মহাদেবদার দোকানে বসে খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করলাম। পরে ওঁর কাছ থেকে কটা বড়ি নিলাম। গা হাত পা ব্যথা-ব্যথা করছে। কপালের শিরা দপ দপ করে লাফাচ্ছে। একটু জ্বর-জ্বর, ম্যাজ-ম্যাজ ভাব। গলার ভেতরেও কেমন এক জ্বালা-জ্বালা অনুভূতি।

বিকেলের আলো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছিল। অনেকটা পথ যেতে হবে। আর দেরি করা যায় না। গোপাল তখনো অনুগত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। উঠে পড়লাম। যখন ওদের বাড়ি পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তুলসী তলায় ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখান শেষ। টগর কেমন যেন একটু উন্মনা হয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে। আমাদের দেখে ওর উদ্বেগ কাটল।

আমি হাত-মুখটা ধুয়ে নিয়ে জামা ছেড়েই শুয়ে পড়লাম। কপালটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরে বিষ-ব্যথা যেন বেড়েই চলেছে।

একটু পরে হাতে আলো নিয়ে টগর ঘরে ঢুকল। আমাকে এই ভর-সন্ধ্যেয় এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে ও একটু অবাক হল। ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করল, 'এই দুদিন আইস নি কেনি মাস্টারবাবু, কাই থাইল?' লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রেখে আলোটা সামান্য কমিয়ে দিল। তেরছা চোখে আমাকে ও দেখছিল।

আমি ওর দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম। কপালের দাগটা এখনও আছে। ওর জন্যে আমার কেন যেন মায়া হচ্ছিল। ওর মুখখানায় অদ্ভুত এক লাবণ্য জড়ানো আছে। টানা টানা চোখ

দুটোয় কত যে রহস্য! মমতার গলায় বললাম, 'আসতে পারি নি টগর. বোর্ডিংয়ের ছেলেগুলো ছাড়ল না।'

টগর এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবল। মুখের ওপর মলিন এক টুকরো হাসি। ডাগর চোখে যেন কত ক্লান্তি, অবসাদ। আস্তে আস্তে ও বলল, 'আর আমি এদিকে চিন্তায় মরি। দুটা দিন কিভাবে যে আমার যাইচে, তা আপনাকে কইতে পারব নি মাস্টারবাবু!'

'আমি তো গোপালকে দিয়ে খবর দিয়েছিলাম টগর!'

টগর যেন নিজের ঘোরেই আছে। আমার কথা শুনল কিনা বোঝা গেল না। ওর মুখের ওপর ছায়া ছায়া এক ব্যথা ঘুরে বেড়ায়। ধীরে ধীরে ও বলল, 'আপনি আমাকে ভুল বোঝ নি ত মাস্টারবাবু!'

'না টগর, ভুল বুঝব কেন?' আমার গলার স্বরে গভীর মমতা ও সহানুভূতির স্পর্শ ছিল।

ও একদৃষ্টে চেয়ে থাকল আমার দিকে। চোখ দুটো ওর ভারী হয়ে আসে। বুকের ভেতরটা বুঝি তোলপাড় করে। ভেতরে কি এক কষ্ট যেন আটকা পড়ে গেছে। বেরোতে পারছে না। খালি ছটফট করে মরছে! ঠোঁটটা কামড়ে ধরে ও তা সামলাবার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। পরে ধীরে ধীরে ও বলল, 'গোপালের বাপটা একটা জল্লাদ। আমার জীবনটা ও শেষ কর্যা দিল মাস্টারবাবু। মাঝে মাঝে মনে হঠে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢাল্যা আগুন ধরি দিয়া নিজেকে পুড়্যা ছারখার কর্যা দিই।'

আমি ওর কথা শুনে চমকে উঠি। মাথা নেড়ে বললাম, 'না টগর, এসব চিন্তা বড় পাজী, কখনো মাথায় এনো না।'

ওর ঠোঁট কাঁপে থর থর করে। চোখ ছল ছল। অস্ফুটে বলল, 'আমি যে আর পারি নি মাস্টারবাবু। অসহ্য মনে হঠে। মাথাটাই তখন আমার খারাপ হয়্যা যায়।'

আমি কি বলব বুঝতে পারি না। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। ওর বুকের ভেতরে জ্বালা যে কত গভীর, আর কত দুঃসহ, সে তো আমি বুঝতেই পেরেছি। নিজের চোখেই তো দেখেছি, স্মৃতি-বিভ্রম ঘটলে ওর চেহারা কিরকম হয়। তবু বেঁচে থাকার অন্য স্বাদ, অন্য রঙ। বেঁচে থেকেই তো আলো অন্ধকারের পার্থক্য বোঝা যায়, বুঝতে হয়। আমি মনে মনে ওকে বললাম: বুঝলে টগর, এ সংসারে চিরকালের জন্যে কেউ আসে নি, কেউ আসে না। সবাইকেই চলে যেতে হবে। কেউ আগে, কেউ পরে। এমনিতেই তো এ জীবন একদিন ফুরিয়ে যাবে টগর। রাগের মাথায় আগে থেকেই তাকে শেষ করে দিয়ে কি লাভ! বড় বড় গাছগুলো দেখেছ তো, কত ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায়, কত ফুল ফল ঝরে পড়ে। কত ডালপালা ভাঙে, তবু সে শেষদিনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। মেয়াদ না ফুরোলে যেন তার মুক্তি নেই।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললাম, 'তোমাকে গোপালের জন্যেই বেঁচে থাকতে হবে টগর।'

'জান মাস্টারবাবু, ওই টকাটার কথা ভাব্যা মরতে ইচ্ছা করে নি। ও নেই রইলে কবি নু এই পোড়া জীবনটা শেষ কর্যা দিতি।'

'ঠিক তাই, ওকে ধরেই তোমাকে বাঁচবার পথ খুঁজতে হবে টগর, আবার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। তোমার মনের মতন করে ওকে বড় করে তুলতে হবে। তোমাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে কোন নোংরা ওকে ছুঁতে না পারে। ওর মনের মধ্যে তোমাকে এই বোধ ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে ও এসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এমনও তো হতে পারে, ওর ভেতর দিয়েই একদিন এই অনাচার ভ্রষ্টাচারের অবসান ঘটবে! তুমি একা একজন টগর মরে গিয়ে আর কি করতে পার!' আমি কথা শেষ করে হাসলাম সামান্য!

টগর আমার কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেল। কেমন

বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকল আমার মুখের দিকে। ও আবেগ বোধ করছিল। বুকে যেন আবার সাহস ফিরে পেল। চোখ বড় বড় করে ও বলল, 'এরকম করা কেউ আমাকে অত সাহস দেয় নি মাস্টারবাবু।' ওর চোখ-মুখ, কণ্ঠস্বর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

আমার কথায় খানিকটা কাজ হয়েছে। ওর মন থেকে এখন অস্বচ্ছ ভাবনাটা সরে গেছে। ওকে এখন অনেক উৎফুল্ল, সপ্রতিভ দেখাচ্ছিল। এ প্রসঙ্গ আর নয়! আমি এবার হালকা গলায় বললাম, 'আমাকে তো এখনো চা দিলে না টগর!'

'ওমা—!' টগর লজ্জায় জিভে কামড় দিল। তারপর কুণ্ঠিত, নম্র ভঙ্গিতে বলল, 'আমার কিরকম ভুল দেখ মাস্টারবাবু! অক্ষুণ লিয়াইসিঠি।' বলে ও পা বাড়াল।

আমি পিছু ডাকলাম, 'টগর?'

ও ঘুরে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে একটু অবাক চোখে চেয়ে থাকল। হাসি হাসি মুখ করে আমি বললাম, 'তার আগে আমাকে একগ্লাস খাবার জল দিয়ে যেও।'

টগর কি ভেবে কাছে এল। আরো যেন বিস্ময় ওর চোখে-মুখে। আমাকে ভাল করে দেখল। ও এতক্ষণ খেয়ালই করে নি! আমার চোখ-মুখ তেতে উঠেছে। কান দিয়ে তাপ বেরোচ্ছে। ভেতরে ভেতরে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। তার একটা ছাপ আমার মুখের ওপর। এতক্ষণে টগরের তা নজরে পড়ল। একটু উৎকণ্ঠার গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি শরীর খারাপ করেচে মাস্টারবাবু?'

'হাঁ, গা-হাত-পা খুব কামড়াচ্ছে, জ্বর-টর আসবে হয়ত।'

'নিশ্চয় ঠাণ্ডা লাগিচে!' ও উদ্বেগ বোধ করছিল! চোখে চোখে চেয়ে থাকল।

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'তা বোধহয় একটু লেগেছে। জানলাটা সারারাত খোলা ছিল। ঠিক বুঝতে পারি নি।'

'আর কইতে হবে নি, আমি বুঝ্‌চি। যখন তাড়াতাড়ি কর্‌য়া

আইসা শুয়্যা পড়চ, তখন মু মনে আমার কামড় দিচে।' একটু চুপ করে থাকল ও। পরে কৃত্রিম শাসনের গলায় চোখ পিট পিট করে বলল, 'এঠি কেউ দেখার নেই বল্যা কি, যা খুশি তাই করব ?' ও আনত ভঙ্গিতে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। চোখের কোলে রহস্য।

আমি মুগ্ধ চোখে ওকে দেখলাম কিছুক্ষণ। আমার এই অসুস্থতা ওকে যেন কেমন উদ্বিগ্ন, বিচলিত করে তুলছিল। ওর এই বলার মধ্যে গভীর আন্তরিকতা, মমতা ছিল। আমি এবার একটু মজা করার জন্যে বললাম 'কে বলেছে দেখার লোক নেই, তোমরা সবাই তো আছ টগর। কিছু হলে তোমরা কি আমাকে ফেলে দিতে পারবে ?'

টগর চমকে উঠল। বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকল ক মুহূর্ত। কি ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে নিল। খোঁপা করতে করতে চোখ টান টান করে ও বলল, 'উঁহু, আর কোন কথা কইব নি, চুপচাপ শুয়্যা থাউ।' টগর ভীষণ খুশি আজ। ও চলে গেল। খানিক পরে জল দিয়ে গেল।

আমি বড়িটা খেলাম। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল আমার। গ্লাসের বাকি জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে নিলাম। মাথাটা কিরকম টন টন করছে। কপালের শিরা দুটো আরো বেশী করে লাফাচ্ছে। চোখ জ্বালা করছিল। মুখ-চোখে আগুনের আঁচ। আমার শীত শীত করছিল।

একটু পরে টগর এল। হাতে চায়ের গ্লাস, মুড়ির বাটি। আমি উঠে বসলাম। হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিলাম। এক চুমুক চা খেলাম। আদা দিয়েছে চায়ে। খেতে খারাপ লাগছিল না। বললাম, 'চা-টা তো ভালই করেছ।'

'এই ভুজাগুলা খাও।' ওর গলায় আবদার।

'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।' বলে একমুঠো মুড়ি তুলে নিলাম।

'আইসা ত কিছু খাও নি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'আমাকে একটা গায়ে দেওয়ার কিছু দিয়ে যেও তো টগর। খুব শীত করছে।'

'নিজের দোষে এটা করচ।' ওকে একটু বিমর্ষ, উদ্বিগ্ন মনে হল। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলল, 'রাত্তির বেলা কি খাব?'

'ওরে বাপ্‌স, আজ আর কিছু খাব না।'

'নেই খাইলে ত আরো কাহিল হয়্যা পড়ব।' বলে টগর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মুখটা আরো বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। বেজার মনে ধীরে ধীরে ও বেরিয়ে গেল।

আমার জন্যে ওরও অস্বস্তি, উৎকণ্ঠা খানিকটা বেড়েছে। ওর মুখখানা কিরকম কালো দেখাচ্ছিল। আমার কপালটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। গা-হাত-পা টনটন করছে। ভেতর থেকে চোখ টানছে। থেকে থেকে তেষ্টা পাচ্ছে। গলাটা আঠা আঠা লাগছে। আর বসে থাকতে পারছি না। চা-টা শেষ করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। গোপাল এসে একটা কাঁথা দিয়ে গেল। ঘরের টিম-টিমে আলোটাও আর সইতে পারছি না। আলোটা নিবিয়ে দিলাম। আমার মগজে যেন কি দপ দপ করছে। চোখের ভেতরে অজস্র তারা ঝিলমিল, ঝিলমিল করছে। কানের ভেতরে কি কট কট করছে। আমি যেন ক্রমশ কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি। এভাবেই কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ একসময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে ঠিক খেয়াল করতে পারলাম না, কোথায় আছি, আমার কি হয়েছে। কেমন যেন এক তন্দ্রার ঘোর। খানিক টের পাই, পাই না। চারদিকে অন্ধকার। দূরে কুকুরের চিৎকার। অনেক যেন রাত হয়েছে। শান্ত, স্তব্ধ। আমার কপালে একটা ঠাণ্ডা, নরম হাত। আবার সেই হাতটা নড়ে উঠল। আমার ঘোর কেটে গেল। চমকে উঠলাম। অস্ফুটে শুধোলাম, 'কে?'

'আমি টগর মাস্টারবাবু, টগর।' আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে ও বলল।

ওর শরীরের একটা গন্ধ আমার ভেতরে দ্রুত ছড়িয়ে গেল। আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। এই অন্ধকারে ও এখানে কেন এসেছে! আমার অস্বস্তি হল। মগজের ভেতরে যেন আগুনের ঝাঁজ। মিহি, ভাঙা গলায় বললাম, 'আলোটা জ্বালালে না কেন?'

'আলো জ্বাললে আপনার কষ্ট হবে। তার চাইতে অন্ধকারটা ভাল।' বলে ধীরে ধীরে ও আমার কপাল মাথা টিপে দিতে লাগল।

ওর শরীরটা আমার গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। আমি ভয় পেলাম। নিজেকে প্রাণপণে শক্ত রাখার চেষ্টা করছি। আস্তে আস্তে বললাম, 'তোমার একবারও ভয় হল না টগর!'

টগর এরই মধ্যে আরো ঝুঁকে এল। কানের কাছে মুখ এনে অনুচ্চ গলায় ও বলল, 'ভয় আমার মেলাদিন নু কাটিচে মাস্টারবাবু। তাছাড়া আপনি অসুস্থ, আপনার সেবা-যত্ন না করলে আমার পাপ হবে।'

ওর গলার স্বরটা আমার কাছে একটু অন্যরকম লাগল। আমি অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'এখন যদি গোপালের বাবা এসে তোমাকে এরকম অবস্থায় দেখে টগর!'

'দেখু না।' ও চাপা গলায় হেসে উঠল।

আমি অবাক। ও যেন কেমন বেপরোয়া। আমার বুকটা দ্রুত লাফাচ্ছে। আমি সামান্য ভীতু গলায় বললাম, 'আমাকেও তো অন্যরকম কিছু ভাবতে পারে!'

'আপনি যেন কিরকম ভয় পাউঠ মাস্টারবাবু!' আবার হেসে ওঠে ও।

আমি চুপ করে থাকলাম। ও আমার হাতটা টেনে নিল।

ওর কোলের ওপর রেখে হাতটা আস্তে আস্তে টিপে দিল। দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কিরকম লাগচে?'

'এখন একটু ভাল লাগছে।' আমার গলার স্বর কেঁপে গেল।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। আমার মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে। অস্বস্তি, ভয়টা যেন আরো বাড়ছে। আমার মাথাটা ও একসময় কোলে তুলে নিয়েছে। ওর কোনরকম জড়তা নেই। আমিও কোন কথা বলতে পারলাম না। বাধা দেওয়ার শক্তি যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমার আবার কিরকম এক ঘোরঘোর ভাব। আমার তেষ্টা পেয়েছে। গলাটা চটচট করছে। ওর শরীরের গন্ধটা আরো তীব্র হয়ে নেশার মতন আমার শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। গায়ের তাপ কি আরো বেড়েছে? আমি আমার নিজের চারপাশে প্রতিরোধের এক পাঁচিল তুলে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। এই অন্ধকার বড় মায়াবী। বড় জাদু জানে। বারবার আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

একটু পরে টগর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভাঙা ভাঙা কাতর গলায় ও বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই মাস্টারবাবু। আপনাকে আমি কোন বিপদে ফেলিব নি।'

আমি চাপা গলায় বললাম, 'ভয় তোমারই জন্য টগর, এতে তোমারই তো অশান্তি, ঝামেলা আরো বাড়বে!' আমার গলার স্বর কাঁপছিল।

টগর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে পরে বলল, 'ও নেশাখোরটা অন্যের বউয়ের সঙ্গে ঢলা ঢলি করবে, রাত্তির বেলা ঘরে আসবে নি, তাড়ি গিলে আইসা নিজের বউকে পিটিবে, এ আমি আর সহ্য করচি নি মাস্টারবাবু।' ওর গলা ধরে আসে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে। বুকের ভেতরটা যেন ওর তোলপাড় করছে।

দূরে অন্ধকারের ভেতরে কোথায় যেন একটা পাখি কেঁদে কেঁদে উড়ে যায়। ওর কান্নাটা ভেসে ভেসে অনেক দূর চলে যায়। রাত বাড়ে। টগর একসময় চলে যায়। আমার বুকের ভেতরেও একটা কাঁটা বিঁধে থাকে। ও কি আমাকে ভুল বুঝল? আমারও কেন যেন ওর জন্যে এখন ভীষণ এক কষ্ট হল। বড় নিঃসঙ্গ, বড় ক্লান্ত ও। আমার সর্বাঙ্গে ও আজ গভীর এক ভালবাসা, প্রীতি মেখে দিয়ে গেল। ও আমার কাছ থেকে কি নিয়ে গেল জানি না। তবে আজকের কথাটা আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না। ওর জন্যে আমারও বুকের ভেতরটা গভীর এক বেদনায় ভরে ওঠে। চোখের পাতা ভিজে যায়।

বাইশ

দিন দিনই টগরের ওপর আমার মায়া বাড়ছিল। আমার ব্যাপারে আজকাল ওরও একধরনের অতিরিক্ত ব্যস্ততা, আকুলতা। কেমন একটু বাড়াবাড়ি। বললেও কোন কথা শুনবে না। হেসে উড়িয়ে দেবে। ওকে যেন কি এক ছেলে-মানুষীতে পেয়েছে। একটু দেরি করে ফিরলে ব্যাকুল চোখে পথের দিকে চেয়ে থাকে। অভিমানে ঠোঁট ফোলায়। চোখ ভারী করে। খাওয়া-টাওয়ার ব্যাপারেও ওর তদারকির শেষ নেই। জোর-জুলুম করে খাওয়াবে। না খেলে মাথার দিব্যি দেবে। ওদের গরুর দুধ এখন কমে গেছে। কিন্তু তাহলে হবে কি, যেটুকু পায়, তার বেশীর ভাগটাই আমাকে এনে দেয়। আদর-যত্নের বেলায় কোনরকম কার্পণ্য নেই। ও এখন চোখে চোখে ইসারায় অনেক কথা বলে। আমার ভয় হয়। মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে। আমার মনে নানারকমের চিন্তা উঁকি মেরে চলে যায়। ওর এই বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই আরো অনেকের চোখে পড়ছে। কে জানে আড়ালে-আবডালে ওরা কি কানাকানি করে! ওদের চোখে-মুখে আমি কিছু কিছু কুটিল রেখা ফুটে উঠতে দেখেছি। আমিও বুঝতে পারছি, ক্রমশই ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি। হৃদয়ের সম্পর্ক আরো গাঢ় হচ্ছে। এখানে থাকলে আরো জড়িয়ে পড়ব। এতে টগরের অশান্তি বাড়বে। আমি চাই না আমার জন্যে ওর কষ্ট-দুঃখ আরো বাড়ে। ওর অবশ্য সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর সাহসটা এ কদিনে আরো বেড়ে গেছে। এ নিয়ে কখনো কোন দুর্নাম, অপযশ হলেও, টগরের পরোয়া নেই। ওর এই বেপরোয়া উচ্ছল সত্তা যেন

আরো কোন গভীরে নিয়ে যেতে চায়। ওর চোখ-মুখে তার আভাস ফোটে। আমি তা টের পাই। নোনা মাটির নেশা বড় দুরন্ত, বড় দুর্জ্জেয়। এ নেশা আমাকেও একদিন কোথায় নিয়ে যাবে! আমার পক্ষেও একে ঠেকিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়। এখান থেকে আমাকে যেতেই হবে। ও দুঃখ পাবে। কিন্তু কোন উপায় নেই। এর কারণ কোনদিনই ওকে বলা যাবে না। ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। মাত্র কদিনের পরিচয়। মনে হয় টগর যেন আমার অনেককালের চেনা। ওর কথা কখনোই আমি ভুলতে পারব না। মাঝে মাঝেই আমার মনে পড়বে।

এরমধ্যে বাড়ি থেকে মিলুর চিঠি পেয়েছি। তাড়াতাড়ি করে একবার কলকাতায় যেতে লিখেছে। কেন, কি ব্যাপার, কিছুই লেখে নি। এতে আমার উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে গেল। মার কি আরো বাড়াবাড়ি হয়েছে! বাবার শরীরও তো ভাল ছিল না! আরো কি খারাপ হল? নাকি বাবুলের জন্যে আরো বড় রকমের কোন ঝামেলা হয়েছে? কিছুই বুঝতে পারলাম না। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠেছে। ভেতরে নানারকমের চিন্তার কাটাকুটি। মিলুটার যদি কোন বুদ্ধি-টুদ্ধি থাকে! একটু তো আভাস-টাভাস দিবি।

চিঠিটা আমি হেড-মাস্টারমশায়কে দেখালাম। এখনই আবার যাব শুনে তিনি মুখ একটু ভার করলেন। কিন্তু ছুটি না দিয়েও পারলেন না। কার্তিকবাবুরা আমার জন্যে সমবেদনা, দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বললেন।

আমি এর পরের দিনেই যাওয়া ঠিক করলাম।

তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফিরে এলাম। আমাকে বিমর্ষ, চিন্তিত দেখাচ্ছিল। টগর অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

আমি বললাম, 'কাল ভোরে আমি কলকাতায় যাচ্ছি টগর।'

টগর আমার কথা শুনে চমকে উঠল। ওর বুকের ভেতরটা

যেন ধড়াস করে উঠেছে। ওর মুখ-চোখ মুহূর্তে মেঘলা দিনের মতন কেমন কালো হয়ে গেল। ও যেন এমনটা ভাবতেই পারে নি। ওর কষ্ট হচ্ছিল। মুখের ওপর তা ফুটে আছে। খানিকক্ষণ ও আর কোন কথা বলতে পারল না। চোখের কোলে গভীর এক বেদনা চিকচিক করছে। ভাঙা ভাঙা গলায় ধীরে ধীরে, ও বলল, 'কেন, ঘর ন্থু কি কোন খবর-টবর আইল ?'

'হ্যাঁ—? আজই আমার বোন মিলুর একটা চিঠি পেলাম। তাড়াতাড়ি করে যেতে লিখেছে। আর কিছু লেখে নি। কে জানে মার আবার কিছু হল কিনা।' আমার গলার স্বরে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও একধরনের অস্থিরতা ছিল।

'তাইলে ত যাইতেই হবে।' ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস ভঙ্গিতে চেয়ে থাকল।

আমি শুধোলাম, 'কাল কখন জেয়ার জান ?'

'কাল.তিথি কি ?'

'সে তো আমি জানি না টগর !'

'আমি কয়্যা দেইঠি !' টগর মনে মনে কি যেন হিসেব করল। ভাবল কিছুক্ষণ। পরে ক্লিষ্ট, নরম গলায় বলল, 'কাল ভোর জোয়ার। আপনাকেও অনেক সকাল ন্থু উ..ত হবে।' একটু চুপ করে থেকে কি একটা ভেবে ও জিজ্ঞেস করল, 'কবি আসব ?'

'এখান থেকে কি কিছু বলা যায় !'

টগর আবদার, অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'না, তাড়াতাড়ি চল্যা আসব। নেই আইলে আমার খুব চিন্তা হবে।'

'সে আমি জানি টগর। কিন্তু বাড়ি গিয়ে কি দেখব, তা তো জানি না।'

'আমার মন কয়ঠে খারাপ কোন হবে নি।'

'তাই যেন হয়।'

টগর আমার চোখে চোখে তাকাল। বলল, 'কলকাতায় গিয়্যা আমান্‌কের কথা আবার ভুলিয়াব না ত ?'

'না টগর, না।'

টগর দাঁড়াল না আর। ওর চোখ জলে ভরে উঠেছে। তাড়াতাড়ি করে চোখে আঁচল চেপে ও চলে গেল।

সে-রাত্তিরটা আমি কেন যেন ভাল করে ঘুমোতে পারি নি। খালি ছটফট করেছি। মানুষ মানুষকে কত সহজে আপন এবং প্রিয় করে নিতে পারে!, আমার কষ্ট এতে আরো বাড়ল। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এখানে আমার আর ফিরে আসা হবে না। অথচ টগর আমার জন্যে উন্মনা হয়ে অপেক্ষা করবে। ওর চোখ জলে ভরে উঠবে। আমি জানি, লুকিয়ে লুকিয়ে ও অনেক কাঁদবে। এ প্রতীক্ষার হয়ত কোনদিন শেষ হবে না। ওর জন্যে আমারও বুকে গভীর এক কষ্ট। এক অস্থির যন্ত্রণা। দীর্ঘশ্বাসে বুকটা ভারী হয়ে ওঠে।

এভাবেই রাতটা একসময় শেষ হল। দোয়েল শিস দিল। কাক ডাকল। শালিখ চড়ুইয়ের কিচির-মিচির শুরু হল। হট্টি-টি-টি পাখি চিৎকার করে করে উড়ে গেল। ধারে কাছেই ঘুঘু ডাকছে। এর ডাকটাই যেন একটু অন্যরকম। কি যেন একটা কথা বলে পাখিটা। ঠিক বুঝতে পারি না। টগর একদিন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। পাখিটার সুরেলা কণ্ঠে নাকি একটাই বুলি, কৃষ্ণ গোকুল, ওঠ ওঠ। আজ আমি ওর ডাকের আগেই উঠে পড়েছি। আস্তে আস্তে প্রত্যূষের মলিন আবছা ভাবটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমি মুখ-হাত ধুয়ে নিলাম। জামা কাপড় পরে নিলাম। আর কিছু পরেই এখানকার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি! বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। নারকেল গাছের পাতায় আলো চিকচিক করছে।

টগর রাত থাকতেই উঠেছে! ওর সঙ্গে আমার চোখা-চোখি হল। ওর চোখ-মুখ কেমন ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে। ও একপলক তাকিয়েই চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিয়েছে। তাকাতেও

পারছে না। চোখের পাতা জলে ভিজে উঠেছে। কি একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। বুকের ভেতরে যেন উথালপাথাল। অনেক কষ্টে তা গোপন করছে ও। এরই মধ্যে ও আমার জন্যে ভাত, মাছের ঝোল করেছে।

আমি ম্লান গলায় বললাম, 'এসব আবার করতে গেলে কেন টগর!'

টগর ভরাট চোখে একবার তাকাল। চোখ আবার ছল ছল করে উঠল। অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে ও বলল, 'অনেকটা রাস্তা যাব ত, না খায়্যা গেলে খুব কষ্ট হবে।' শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে গেল। গলার স্বরটা কেমন আর্তনাদের মতন শোনায়। ওর বুক যেন ভেঙে যাচ্ছে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলতে পারলাম না। আমার খেতে ইচ্ছে করছিল না। আমার যেন খিদে নেই, জিভে স্বাদ নেই। আমার বুকেও টনটনে এক ব্যথা। কোনরকমে দুটো মুখে দিয়েই উঠে পড়লাম।

টগর একটা পান এনে দিল। ওর হাত কাঁপছিল। ভাল করে তাকাতেও পারল না। মুখটা শুকনো। খুব দুঃখীর মতন দেখাচ্ছেও ওকে।

আর দেরি করা যায় না। এই জোয়ারে যেতে হবে। আশপাশ থেকে অনেকেই চেয়ে আছে। আমাকে আবার একবার স্কুলে যেতে হবে। পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি ব্যাগটা হাতে নিতে নিতে বললাম, 'তাহলে চলি টগর।'

টগর তাকাল। চোখে জল। কি একটা বলার চেষ্টা করল, পারল না। এগিয়ে এসে ঢুম করে আমার পায়ে হাত দিল। অস্ফুটে শুধু বলল, 'সাবধানে যাব। তাড়াতাড়ি চল্যা আসব।' ওর ঠোঁট কাঁপল। গলার সুর কেটে গেল। টস টস করে গাল বেয়ে জল পড়ছে।

আমি কিছু বলতে পারলাম না। বুকটা চড় চড় করে ওঠে। এ বড় কঠিন মায়া। পা যেন আর উঠতে চায় না। বেলা বাড়ছে। পথ অনেক। বেরিয়ে পড়লাম। গোপালও সঙ্গে এল। কেন যেন একবার পেছনে তাকাবার আমার লোভ হল। ফিরে তাকালাম, দেখি, তখনও টগর আমার পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ওর মনটা যে এত নরম, আর মায়ায় ভরা, আমি আবার একবার তা নতুন করে অনুভব করলাম। অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিলাম।

গোপাল আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পথ চলে এসেছে। আমার তা খেয়ালই ছিল না! আমি ওকে বললাম, 'আর তোমাকে আসতে হবে না।'

ও প্রণাম করল।

আমি সস্নেহে বললাম, 'তোমাকে একটা কথা বলি গোপাল, কথাটা আমার মনে রেখো। তোমার মার কথামতন তুমি চলো, তোমার মাকে একটু শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করো, কেমন?'

ও আমার কথা বুঝল কিনা জানি না। ওর চোখে তখন জল।

আমি হাঁটতে শুরু করলাম। ও তখনো দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনেও তখন অনেক কথার ভিড়।

খানিকটা এগিয়েছি। আমাদের স্কুলেরই এক ছাত্র। সুবোধ মুনিয়া ক্লাস সেভেনে-এ পড়ে। আজ কদিন ধরে ও স্কুলে যায় না। ছেলেটা পড়াশুনোয় খুব ভাল। কিন্তু ওদের ঘরে বড় অভাব। আমাকে দেখে ও লজ্জায় পড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে। একটা ডোবা থেকে সাপলা তুলছিল। পরনে গামছার একটা টুকরো। তাও দু এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রে সুবোধ, স্কুলে যাস নি কেন?'

ও উঠে এল। আমাকে প্রণাম করল! পরে আমতা অমতা করে বলল, 'জামা-প্যাণ্টুন নেই স্যার; বাবা কইচে, হাট মু আন্যা দিলে তখন পড়তে যাবু।'

হঠাৎ ওর এই কথাটা আমার বুকে গিয়ে ধাক্কা মারে। ওর মুখটা বড় করুণ দেখাচ্ছে। ওর জন্যে আমার খুব মায়া হল। এরপর তো আর কিছু বলা যায় না! পড়াশুনোটা ওদের কাছে বিলাসের মতন মনে হয়। বাপ খুড়োর সঙ্গে মাঠে মাঠে ওদের দিন কাটে। মাটির টানে ওরাও ঘরে থাকতে পারে না! এদের অভাব, কষ্ট যেন আরো বেশী। এ ভাবেই ওদের বেঁচে থাকতে হয়। এ কয়টা সাপলা দিয়ে ওদের কি হবে! পেট ভরবে না। তবু তো উপায় নেই! আমি ওকে কোন সান্ত্বনার কথা শোনাতে পারলামনা। বিষণ্ণ মনে চলে এলাম। বুকটা আমার ভারী হয়ে থাকল।

পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করলাম। তাড়াতাড়ি করে আমাকে ফিরে আসতে বললেন। তিনিও খানিকটা পথ আমাকে এগিয়ে দিলেন। সুরেন, অনিল আমার সঙ্গে কচুবেড়ে পর্যন্ত এল। আমি বারণ করেছিলাম। ওরা শুনল না। এর আগেরবার বলরাম এসেছিল। ওর মুখটা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল। মনটা খারাপ হয়ে গেল!

নদীতে এখন পুরো জোয়ার। হু হু করে বাতাস বইছে। খল খল শব্দে ঢেউ উঠছে, ভাঙছে। এবার নৌকো ছাড়বে। অনিলরা শেষবারের মত প্রণাম করল। ওদের চোখ ছল ছল করে। গলা ধরে আসে। ভাঙা ভাঙা খিন্ন গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি চলে আসবেন স্যার।'

আমি ওদের দিকে তাকালাম। ছোট করে শুধু বললাম, 'আসব।'

আর কোন কথা হল না। তাড়তাড়ি গিয়ে নৌকোয় উঠলাম। একটু পরেই নৌকো ছেড়ে দিল। কথাটা খট করে যেন আমার কানে গিয়ে লাগল। জানিনা, কলকাতায় গিয়ে কি অবস্থার মধ্যে পড়ব! কেন যেন মনে হল, আর যদি এখানে আমার না আসা হয়! টগরের বিষণ্ণ মুখটাও এক ফাঁকে মনে পড়ে গেল। আস্তে আস্তে ওরা অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। পালে হাওয়া ধরেছে। নৌকো

এখন দ্রুত ছুটছে। তখনো ওরা উদাস চোখে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। দেখতে দেখতে আরো অস্পষ্ট হয়ে এল ওরা। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আমার প্রথম দিনের কথাটা মনে পড়ে যায়। এই নদী, ঢেউ-টেউ দেখে আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল সেদিন। ভেবেছিলাম, পরের দিনেই পালিয়ে যাব। কিন্তু পারলাম না। মনে মনে যেন এদের সবাইকেই উদ্দেশ করে আজ বলতে ইচ্ছে হল: তোমরা আমার মনের অনেক কাছাকাছির মানুষ। এখানে এসেই বুঝেছি, তোমাদের সঙ্গে আমার বড় রকমের একটা মিল আছে। আমার ধারণাটা পাল্টে গেল। তোমাদের পূর্বপুরুষরাও তো এখানে একদিন বাঁচার তাগিদেই এসেছিল। আজো তোমাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম শেষ হল না। বোধহয় তা শেষ হওয়ার নয়। এসব ভেবেই সেদিন আমার ক্ষোভ, যন্ত্রণা অনেক কমে গিয়েছিল। তোমরা আমাকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই কখন আপন করে নিয়েছ। এ কি কখনো আমি ভুলতে পারব? আজ মনে হচ্ছে, এখানে না এলে জীবনের একটা বড় অর্থ, আমার কাছে অজানা থেকে যেত। এই প্রথম বুঝতে পারলাম, বাংলা দেশটা আরো আরো অনেক বড়। তোমাদের কথা আমার থেকে থেকে মনে পড়বে, মনে পড়বে।

আমার বুকটা আবার টন টন করে ওঠে। মাথার ওপর দিয়ে তখন এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। বাতাসে এখন কাদের কান্না ভেসে আসছে। আমি কান খাড়া করে রাখি। কি আশ্চর্য, একদিন কলকাতার জন্যেই আমার মন কেমন করেছে। আজ আবার এই নোনা, বাদা জায়গার জন্যেই আমার মন পুড়ছে। চোখ দুটো বারবার কেন যেন ঝাপসা হয়ে ওঠে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

॥ সবিনয় নিবেদন ॥

বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করে বিশিষ্ট লেখকদের লেখার উপর বিশেষ ব্যাখ্যা বা মন্তব্য করার লোভে অথবা প্রয়োজনে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইনি। কিংবা নেহাৎ কিছু বলতে হয় বলার জন্যে, সম্পাদনা বিষয়ে, সেই জন্যেও নয়।

আসলে কিছু কথা। বিশেষ কিছু কথা। যে কথাগুলো এরকম একটা গ্রন্থ প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা দরকার, সেই জন্যেই লিখছি।

বুদ্ধদেব বসুর জীবনটাই আসলে নানা প্রসঙ্গের। আরো সূক্ষ্ম অর্থে—দুই মেরুর। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেবই সম্ভবতঃ একমাত্র প্রাণ-পুরুষ—লেখাকে কেন্দ্র করে যাঁর ভাগ্যে প্রশংসা ও সমালোচনা দুই-ই সমানভাবে জুটেছে। বাংলা সাহিত্যে হয়তো তিনিই সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত পুরুষ। যার রেশ হিসাবে চূড়ান্ত সম্মান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আসামীর কাঠগড়াতেও দাঁড়াতে হয়েছে।

এই সব কিছু মিলিয়েই বুদ্ধদেব বসু আমার কাছে প্রচণ্ড গতিশীল একটি অস্তিত্ব। একটা গোটা মানুষ এবং সাহিত্যিক। তাঁর জীবদ্দশায় যাঁরা তাঁকে সমালোচনা করেছিলেন, সঠিক কি বেঠিক পথে সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর, তাঁরা কখনও বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের স্মরণীয় সৃষ্টি ও অবদানকে অস্বীকার করতে পারেন না।

এই সব কিছু নিয়েই "বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ"।

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে আমি চেয়েছিলাম, গ্রন্থটিকে যথাসম্ভব "নিরপেক্ষ" করতে। আমি বিশ্বাস করি, একজন যথার্থ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই হওয়া উচিত। শুধুমাত্র প্রশস্তি বা "ভালো ভালো" জাতীয় লেখা ছাপালেই চলবে না। তাতে যাঁকে কেন্দ্র করে এই সংকলন, সেই লোকটির যথার্থ বাস্তব মূল্যায়ন হয় না, বিচক্ষণ পাঠক কিংবা গবেষক কিংবা সমালোচকদের ফাঁকি দেন সম্পাদক। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমি তথাকথিত বামপন্থী শিবিরের অনেক লেখকের কাছেই, যাঁরা একদা এবং এখনও বুদ্ধদেবের সমালোচক, লেখা আহ্বান করেছিলাম। কেউ কেউ দিয়েছেন, কেউ কেউ যে কোনো কারণেই হোক দেননি। সবাইকেই আমার ধন্যবাদ।